বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা

(The role of the Holy Al-Qur'an to establish peace in the world)

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

আগস্ট-২০১৩

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ কামরুল হাসান

এম. ফিল. গবেষক

রেজি. নং- ১৯২/২০১০-২০১১

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা

(The role of the Holy Al-Qur'an to establish peace in the world)

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

আগস্ট-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা

(The role of the Holy Al-Qur'an to establish peace in the world)

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

আগস্ট-২০১৩

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ কামরুল হাসান

এম. ফিল. গবেষক

রেজি. নং- ১৯২/২০১০-২০১১

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ গবেষণাপত্র বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(মোঃ কামরুল হাসান)
শিক্ষাবর্ষ: ২০১০-২০১১
রেজি. নং : ১৯২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ কামরুল হাসান কর্তৃক উপস্থাপিত **"বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যের ডিগ্রী থেকে নেয়া হয়নি অথবা অন্য কোন প্রকাশনায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি। সুতরাং গবেষককে এম. ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড.মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন)

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ও

অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।
আগস্ট-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যার একান্ত মেহেরবানীতে মহাগ্রন্থ আল কুর'আন নিয়ে আমার গবেষণা "বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা" টি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। সালাত ও সালাম প্রিয় নবী মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলে আকরাম (স.) ও তাঁর মহান পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে আজমা'ঈন, তাবে'ঈন, তাবে-তাবে'ঈনসহ আল কুর'আনের খাদিম সকল মহামানবের প্রতি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে বিশ্ববাসী সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন এর তত্ত্বাবধানে এম. ফিল. গবেষণায় যোগদান করি এবং আল্লাহ তা'আলার খাস মেহেরবানীতে প্রথম পর্বের কোর্স সমাপ্ত করি। উক্ত কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় আন্তরিকতার সাথে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান, উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন। তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়ক পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পরিমার্জনা ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর জন্য মহান আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি। এরপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই একই বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুল আলম এর প্রতি, এম. ফিল. কোর্সের ভর্তির সময় যার সংস্পর্শে আসি। তখন থেকেই তিনি আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অনেক জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে আমার নিকট সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। তিনি সহ বিভাগীয় সকল শিক্ষকের প্রতি যারা কোন না কোনভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও লালমাটিয়া মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. তাওহীদুর রহমান, বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী ড. মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী, কাঁটাবন কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আ ন ম রফিকুর রহমান মাদানী, বি সি এস আই আর-এর সাবেক প্রিন্সিপাল অফিসার ড. আব্দুল আউয়াল ও ড. মুফতি মাওলানা আবু ইউসুফ এর প্রতি। তাঁরা আমার গবেষণাকর্ম এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই আন-নাবিল ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা রফিকুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. গবেষক মাহফুজ আল-হামিদকে যারা শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজ দায়িত্বে প্রুফ দেখা ও অভিসন্দর্ভটি মেকআপের কাজে আমাকে সহায়তা করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. গবেষণায়রত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুল্লাহ-এর প্রতি। তিনি সার্বক্ষণিক আমাকে পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি যে সকল দেশী বিদেশী লেখকগণের রচনার সাহায্য নিয়েছি তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তা ছাড়াও আমার শ্রদ্ধেও আব্বু মাওলানা আবু ইউসুফ, আম্মু মমতাজ বেগম, শশুর মাওলানা ছালেহ উদ্দীন, শাশুড়ি আমেনা বেগম, ছোট ভাই হাসনাঈন ও সুফিয়ান, ছোট বোন মাকসূদা ও হাফসা এবং স্ত্রী শারমিনসহ শুভাকাঙ্খী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি যারা আমার এম. ফিল. গবেষণায় বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

-গবেষক

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল কুর'আন ০০:০০	প্রথম সংখ্যা সূরা ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
('আ.)	'আলাইহিস্ সালাম
ইমাম বুখারী	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাঊদ	আবূ দাঊদ সুলাইমান ইব্ন আশআস্ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম ত্বাহাবী	আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আত-ত্বাহাবী
ইব্ন কাছীর	আবূল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
ই. ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন ফার্‌রাহ আল-কুরতুবী
তাবারাণী	আবুল কাশেম সুলায়মান ইব্ন আহম্‌দ আত-তাবারাণী
বায়হাকী	আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'উছমান আয-যাহাভী
রাযী	আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর ইবনুল হুসাইন আত-তামিমী ফখরুদ্দীন আর-রাযী
শাওকানী	মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
খ্রি. পূ.	খ্রিস্ট পূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
তা. বি.	তারিখ বিহীন
(র.)	রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
(রা.)	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু/ 'আনহুম/ 'আনহা/ 'আনহুমা/ 'আনহুন্না
(স.)	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম
ইমাম মালিক	ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.)
মুস্‌নাদু আহমাদ	মুস্‌নাদু ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.)
বুখারী	আল জামে'উল মুস্‌নাদুস সহীহ আল মুখ্‌তাসার মিন সুনানি রাসূলিল্লাহ (স.)
মুসলিম	সহীহ মুসলিম
তিরমিযী	সুনান আত-তিরমিযী
আবু দাঊদ	সুনান আবু দাঊদ
ইবনু মাযাহ	সুনান ইব্ন মাযাহ
ড.	ডক্টর

অনু.	অনুবাদ

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র		০৪
প্রত্যয়ণপত্র		০৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		০৬
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা		০৭
সূচিপত্র		০৮-১৪

ভূমিকা		**১৫-১৬**

প্রথম অধ্যায়	**শান্তি ও বিশ্বশান্তি**	**১৭-২২**
	শান্তির বিভিন্ন প্রকার	২১
	শান্তির ধরন	২১
	বিশ্বশান্তি	২২

দ্বিতীয় অধ্যায়	**আল কুর'আনুল কারিমের পরিচয়**	**২৩-৩৮**
	আল কুর'আনের নাম সমূহ	২৯
	আল কুর'আনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৯
	আল কুর'আনের বিষয় ভিত্তিক আয়াতের পরিসংখ্যান	২৯
	পবিত্র কুর'আন সম্পর্কে যা জেনে রাখা আবশ্যক	২৯
	আল কুর'আন সংরক্ষণের দায়িত্ব	২৯
	লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত	৩০
	নবুওয়াতের দলিল	৩১
	অন্য সকল গ্রন্থ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন	৩১
	কোন কবি বা গণকের উক্তি নয়	৩২
	কারো পক্ষে রচনা সম্ভব নয়	৩২
	জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক নাযিলকৃত	৩৩
	এতে কোন বৈসাদৃশ্য নেই	৩৩
	পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সমর্থক	৩৪
	এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করতে পারে না	৩৫
	সন্দেহকারীদের প্রতি এরূপ গ্রন্থ বা সূরা রচনা করার আহ্বান	৩৫
	আল কুর'আন মানব রচিত নয়	৩৬
	হযরত মুহাম্মাদ (স.) কর্তৃক রচিত হয়নি	৩৭
	আল কুর'আন পরিবর্তনের ক্ষমতা রাসূলেরও নেই	৩৭

তৃতীয় অধ্যায়	**আল কুর'আন আগমন পূর্ব বিশ্ব**	**৩৯-৬১**

	কুর'আনের পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব	৩৯
	ইঞ্জিল কিতাবের উপর আমলের সময়কাল	৩৯
	আল কুর'আন নাযিলের পূর্বে আরবের অবস্থা	৪০
	শোচনীয় সামাজিক অবস্থা	৪০
	অভিজাত শ্রেণী	৪০
	অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থা	৪০
	যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসেবে নারী	৪১
	একাধিক স্ত্রী রাখা	৪১
	যুদ্ধ বিগ্রহ	৪১
	লুটতরাজ	৪২
	চুরি	৪৩
	ব্যভিচার	৪৪
	নির্লজ্জতা	৪৪
	পোষাকে বিধি-নিষেধ	৪৫
	মদ্যপান	৪৫
	অভিশপ্ত সুদ প্রথা	৪৫
	দাস-দাসীদের জীবনাচার	৪৬
	কুসংস্কার	৪৭
	নিষ্ঠুরতা	৪৮
	জুয়া খেলা	৪৮
	কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় অবস্থা	৪৮
	মূর্তিপূজা	৪৯
	ভাগ্য গণনা	৪৯
	মূর্তির উদ্দেশ্যে বলিদান	৪৯
	মূর্তির জন্য পশু ছেড়ে দেয়া	৪৯
	গণকতীরে বিশ্বাস	৫১
	তীরগুলোর ব্যবহার ছিল নিম্নরূপ	৫১
	যাদুতে বিশ্বাস	৫১
	জ্যোতিষীদের উপর বিশ্বাস	৫২
	বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা	৫২
	জীবিকা সংগ্রহ	৫২
	মক্কা, ইয়াসরেব ও অন্যান্য শহরের জীবন যাত্রা	৫২
	রাজনৈতিক অবস্থা	৫৩
	কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপস্থিতি	৫৩
	রাজনৈতিক অনৈক্য	৫৩
	সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব	৫৩
	সংবিধানের অভাব	৫৩
	গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা	৫৩
	সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন	৫৪
	যুদ্ধাংদেহী মনোভাব	৫৫

	সাংস্কৃতিক অবস্থা	৫৫
	কাব্য প্রীতি	৫৫
	কবিতার ভাবধারা	৫৫
	সাব'ঈ মু'য়াল্লাকাহ	৫৫
	খ্যাতনামা কবিগণ	৫৬
	আরব জাতির নীতি-নৈতিকতা	৫৬
	সাহসিকতা	৫৬
	স্বাধীনতা	৫৬
	আতিথেয়তা ও বদান্যতা	৫৭
	অঙ্গীকার পালন	৫৭
	স্মৃতিশক্তি ও বংশ গৌরব	৫৮
	বেদুঈনসুলভ সরলতা	৫৮
	কেমন ছিল বড় বড় ধর্মগুলোর অবস্থা	৫৯
	আরবে ইয়াহুদীবাদ	৫৯
	ইয়াহুদী ধর্ম	৬০
	আরবে খ্রিষ্টবাদ	৬০
	খ্রিষ্টবাদ ধর্ম	৬০
	মাজূসী মতবাদ ও অগ্নি পূজারী	৬১
	সাবিঈ বা তারকা পূজারী	৬১
	ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্মের বিকৃতি	৬১

চতুর্থ অধ্যায়	**কুর'আন নাযিল পূর্ববর্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অবস্থা**	**৬২-৬৭**
	পাশ্চাত্য জগত	৬২
	রোমক সভ্যতার বিলোপ সাধন	৬২
	পাশ্চাত্য জগতের অন্ধকার যুগ	৬২
	প্রাচ্য জগত	৬৩
	পারস্য সাম্রাজ্য	৬৩
	জরাথুষ্ট্রবাদ	৬৪
	ভারত ও হিন্দুধর্ম	৬৪
	ভারতের জাতিভেদ প্রথা	৬৫
	তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা	৬৬
	চীন ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং দূর প্রাচ্য	৬৬
	বিশ্বের হতাশাজনক পরিস্থিতি	৬৭

পঞ্চম অধ্যায়	**কুর'আন নাযিল শুরু**	**৬৮-৮০**
	বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা	৬৮
	মক্কাবাসী সহ পৃথিবীবাসীকে সত্যের প্রতি আহবান	৬৮
	হিকমত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে রবের পথের দিকে আহবান	৬৮
	মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান	৭২

	আদল (সু-বিচার)	৭৩
	ইহসান (সৎকর্ম)	৭৩
	ইতাউ-জুল-কুরবা (নিকটাত্মীয়কে দান করা)	৭৩
	মুনকার (অন্যায়কর্ম)	৭৪
	মানব জাতিকে অন্ধকার হতে আলোর পথে আনয়ন	৭৫
	সকল সমস্যার সমাধান	৭৬
	ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা	৭৭
	ইনসাফ বা ন্যায়বিচার ভিত্তিক ব্যবস্থা	৭৭
	আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করা	৭৮
	অমুসলিমদের অধিকার দান	৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায়	**সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা**	**৮১-১৪১**
	শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স.)-র গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৮৪
	যুদ্ধের জন্য উস্কানীদায়ক উপাদানের মূলোৎপাটন	৮৫
	অর্থের মোহ	৮৫
	বীরত্ব প্রদর্শন	৮৬
	প্রতিশোধ স্পৃহা	৮৭
	শান্তি বিঘ্নকারী উপাদানের অপসারণ	৮৭
	আর্থ-সমাজিক বৈষম্য দূরীকরণ	৮৭
	ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যথাযথ অধিকার দান	৮৮
	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা	৮৮
	হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করা	৮৮
	গীবত ও চোঘলখুরী পরিহার করা	৮৯
	কু-ধারনা ও অপবাদ থেকে বিরত থাকা	৮৯
	শান্তি স্থাপনকারী উপাদান প্রতিষ্ঠা	৯০
	মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দান	৯০
	ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা	৯০
	ধর্ম পালনের স্বাধীনতা	৯১
	মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা	৯২
	ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা	৯৩
	ধৈর্য্য ধারণের শিক্ষা	৯৪
	বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান	৯৫
	ব্যক্তি জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আন	৯৫
	দাম্পত্য জীবনে শান্তি	৯৬
	জীবনের নিরাপত্তা	৯৬
	সন্তান হত্যা বন্ধ	৯৮
	জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ও উত্তর	৯৯
	মান ইজ্জতের নিরাপত্তা	৯৯
	ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা	১০২
	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার	১০৪

	একজনের অপরাধের জন্য অন্যজন দায়ী হবে না	১০৫
	পারিবারিক সমস্যার সমাধান	১০৫
	সামাজিক সমস্যার সমাধান	১০৬
	অজ্ঞতা ও মূর্খতার মূলোৎপাটন	১০৭
	অপরাধ দমন	১০৭
	দূর্ণীতি প্রতিরোধ	১০৮
	দূর্ণীতি প্রতিরোধে আল কুর'আন	১০৯
	মাদক নিয়ন্ত্রণ	১১০
	মদের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১১০
	মদ সভ্যতা ও মানবতার দুশমন	১১১
	সামাজিক ব্যাধি যৌতুকের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১১৪
	যৌতুকের প্রতিক্রিয়া	১১৪
	রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান	১১৭
	রাজনীতির লক্ষ্য	১১৯
	অর্থনৈতিক সমাধান	১২০
	দারিদ্র দূরীকরণ	১২১
	দারিদ্রের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১২১
	দারিদ্র বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থা	১২১
	সুদ দূরীকরণ	১২২
	সুদ- এর বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১২২
	সুদ ও মুনাফার পার্থক্যের একটা নমুনা	১২৫
	সুদের দরুন ইয়াহুদীদের উপর হালাল বস্তুও নিষিদ্ধ ছিল	১২৫
	সুদখোর কবর থেকে মতিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে	১২৫
	সুদখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী	১২৬
	সুদে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না	১২৬
	শ্রম সমস্যার সমাধান	১২৬
	ইসলামী বিচার ব্যবস্থা	১২৭
	ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কী?	১২৭
	বিচার ব্যবস্থার আবশ্যকতা	১২৭
	বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আল কুর'আনের ভাষ্য	১২৭
	বিচারের ক্ষেত্রে কারো খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা যাবে না	১২৮
	শিক্ষা ব্যবস্থা	১২৯
	মহান প্রভূর নামে শিক্ষা	১৩০-
	শিক্ষার জন্য উপদেশ	১৩১
	শিক্ষার জন্য উপমা প্রদান	১৩১
	আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে আল কুর'আন	১৩২
	মহাগ্রন্থ আল কুর'আনই সুষ্ঠু বৈদিশিক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে	১৩২
	আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ওয়াদার প্রতি মর্যাদা দান	১৩২
	আল কুর'আন নির্দেশিত কুটনৈতিক সতর্কতা ও সংরক্ষণতা	১৩৩

	বিশ্ব শান্তির জন্য আল কুর'আনের ঐতিহাসিক ১৪ দফা	১৩৪
	আল কুর'আন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঁধার	১৩৫
	আল কুর'আনে ব্ল্যাকহোল	১৩৭
	সাত আসমান	১৩৯
	আল কুর'আন ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান	১৩৯

সপ্তম অধ্যায়	**শান্তির পথে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে আল কুর'আন**	**১৪২-২১১**
	পিতা-মাতার হক আদায় না করার বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৪২
	নিকট আত্মীয়দের হক আদায় না করার বিরুদ্ধে	১৪৬
	ইয়াতীমের মাল-সম্পদ আত্মসাতের বিরুদ্ধে	১৪৮
	প্রতিবেশীর হক আদায় না করার বিরুদ্ধে	১৫০
	অবৈধভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৫৩
	মুনাফাখুরীর বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৫৫
	জুয়া খেলার বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৫৭
	দ্বীন গ্রহণে জোর খাটানোর বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৫৮
	ইয়াহুদীবাদের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৫৯
	রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৬০
	ইবলিসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৬৩
	মানব রচিত মতবাদের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৬৫
	গীবতের বিরূদ্ধে আল কুর'আন	১৬৮
	আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৬৯
	অলৌকিকত্বের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৭০
	মিথ্যার বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৭২
	ভ্রান্ত ও মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৭৪
	ভাষা ও বর্ণের পার্থক্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৭৫
	আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৭৭
	অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৭৮
	অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৮০
	অনৈক্যের কুফল ও 'রি-হুন' শব্দের ব্যাখ্যা	১৮২
	অনিষ্টকারী নাফসের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৮৩
	মুনাফিকের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৮৬
	জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আল কুর'আন	১৮৮
	জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিভ্রান্তি	১৯২
	সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল কুর'আন	১৯৩
	পবিত্র কুর'আনে 'ফিতনা' শব্দের ব্যবহার	১৯৪
	পবিত্র কুর'আনে 'ফাসাদ' শব্দের ব্যবহার	১৯৫
	আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়	১৯৬
	যুল্‌ম, অবিচার ও লুটতরাজের কাজে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার	১৯৬
	শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা	১৯৬

	সন্ত্রাস জঘণ্য অপরাধ	১৯৭
	সৌদী আরবের উচ্চতর উলামা পরিষদের ফতোয়া	১৯৮
	জিহাদ ও কিতাল	২০০
	জিহাদ ও সন্ত্রাসের আদর্শগত পার্থক্য	২০১
	জিহাদ ও সন্ত্রাসের প্রক্রিয়াগত পার্থক্য	২০২
	সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য চরম লাঞ্ছনাকর	২০২
	ইসলামী জিহাদ ন্যায়নীতিতে পরিপূর্ণ	২০৩
	সন্ত্রাস প্রতিরোধ	২০৪
	প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা	২০৪
	সন্ত্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের মূলোৎপাটন	২০৬
	হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর যুদ্ধ বিগ্রহ	২০৯
	একটি গুরুতর অভিযোগ খন্ডন	২০৯
	জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি	২০৯
	বর্তমান সমস্যা সঙ্কুল বিশ্ব	২১০
	পরাশক্তির স্বেচ্ছাচারিতা তথা জোর যার মুল্লুক তার	২১০
	প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতি ও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি	২১১

অষ্টম অধ্যায়	**বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল কুর'আনের কতিপয় দিক নির্দেশনা**	**২১২-২১৯**
	তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা	২১২
	রিসালাতে বিশ্বাস	২১২
	আখিরাতে বিশ্বাস করা	২১২
	প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা করে দেয়া	২১৩
	সর্বোপরি আল কুর'আন মেনে চলা	২১৯

উপসংহার		**২২০**

গ্রন্থপঞ্জি		**২২১-২২৮**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী তখন অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছিল। অন্যায়, অসত্য আর কদর্যের কালিমায় ছেয়ে গিয়েছিল গোটা পৃথিবী। অজ্ঞতার নিকষ কালো আঁধারের কঠিন পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল মানবতার বাণী। সত্যের আলো বিবর্জিত সে চরম অন্ধকার যুগে আগমন করলেন সাইয়্যিদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ (স.)। আর তাঁকে পৃথিবীতে পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠার যাবতীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুজ থেকে নাযিল করলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কুর'আন, যা সত্য, সুন্দর এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে পরিপূর্ণ। আর এ মহাগ্রন্থের পূর্ণ অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমেই রাসূলে আকরাম (স.) গঠন করলেন একটি আধুনিক সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র, যা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রশংসা লাভ করেছিল। অদ্যাবধি অন্য কোন মতবাদ, শক্তি বা কর্তৃপক্ষ এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, কুর'আনের পূর্ণচর্চা ব্যতিত কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্ভবও হবে না।

মানবমণ্ডলীসহ সমগ্র বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকারী, লালন-পালনকারী ও মালিক যেহেতু আল্লাহ তা'আলা; সেহেতু তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ কোন পথে তা একমাত্র তিনিই জানেন। তাই তিনি মানবমণ্ডলীর স্থায়ী সুখ, সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য যুগে যুগে নাযিল করেছেন ১০৪ খানা আসমানি কিতাব। যেহেতু রাসূলে আকরাম (স.)-র পর আর কোন নবী কিংবা রাসূল এ পৃথিবীতে আসবেন না এবং আল কুর'আনুল কারিমও আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সর্বশেষ আসমানি কিতাব, এরপর আর কোন আসমানী কিতাব মানবজাতির মুক্তি, কল্যাণ ও বিশ্বশান্তির জন্য অবতীর্ণ হবে না; সেহেতু মহাজ্ঞানী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা সুপরিকল্পিতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় মানবমণ্ডলীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের পূর্ণ দিক-নির্দেশনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে, যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধানে যা অতুলনীয়। আর আল কুর'আনই যেহেতু সর্বশেষ আসমানী কিতাব, সেহেতু বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনুল কারিমে বলেছেন : "আলিফ, লা-ম, রা। এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, তাঁর পথে, যিনি মহাপরাক্রমশালী, যাবতীয় প্রশংসার যোগ্য।"(১৪:০১-০২)

পবিত্র কুর'আনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে: "তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি (ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান) তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার প্রতিপালকের বাণী (আল কুর'আন) সততা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তাঁর আইন-বিধান পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর তিনিই সব কিছু শ্রবনকারী ও মহাজ্ঞানী।"(০৬:১৫-১৬)

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন বিশ্ববাসীকে সার্বিক শান্তি দানের লক্ষ্যেই নাযিলকৃত। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ

(স.) এ কুর'আন দিয়েই পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ একটি ইসলামী সভ্যতার নতুন দিগন্তের শুভ সূচনা করেছিলেন। তিনিই পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি সর্বদিক বিবেচনায় সমানভাবে সফল হয়েছিলেন। 'বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা' এ শিরোনামটি নির্ধারণ করার কারণ হচ্ছে আজকের পৃথিবীতে একটা বিষয়ের বড়ই অভাব আর তা হচ্ছে "শান্তি"। এ অভাব দূরীকরণের জন্যই বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছিলেন মহাগ্রন্থ আল কুর'আনুল কারিম। আজকের পৃথিবীবাসী শান্তির অন্বেষায় প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে ছুটাছুটি করছে কিন্তু শান্তি কোথাও মিলছে না- এটি প্রমাণিত। এমনকি মহাপ্রলয় পর্যন্তও যদি মানুষ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এতে তারা ব্যর্থই হবে; কারণ মানুষের স্রষ্টা যিনি তিনিই ভাল জানেন কোন পথে মানুষের কল্যাণ আর কোন পথে মানুষের অকল্যাণ। কোন পথে চললে মানুষ শান্তি ও মুক্তি পাবে? আর কোন পথে চললে মানুষ অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে? এজন্যই তিনি মানুষের মুক্তি ও বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নাযিল করেছেন আল কুর'আন। বিশ্ববাসী যেন এ মহাসত্যটি উপলব্ধি করতে ও তদানুযায়ী জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিচালনা করতে সক্ষম হন- এ মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আলোচ্য শিরোনাম নির্বাচন করেছি। এক্ষেত্রে নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তোবা যথাযথ বিষয়গুলো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তাই মহান আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে ফরিয়াদ করছি তিনি যেন আমার যাবতীয় দূর্বলতা ও অযোগ্যতাকে ক্ষমা করে দেন এবং এ গবেষণাটি কবূল করেন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শান্তি ও বিশ্বশান্তি

শান্তি

বাংলা অভিধানে এর সরল এবং সহজ অর্থ করা হয়েছে : প্রশান্তি[১], উৎকণ্ঠা শূন্যতা, চিত্তস্থৈর্য (মানসিক শান্তি), উদ্বেগহীনতা, মিলমিশ, মৈত্রী, উৎপাত শূন্যতা (শান্তি রক্ষা), সন্ধি; যুদ্ধাবসান; বিবাদের মীমাংসা (শান্তি স্থাপন), কল্যাণ, অশান্তি দূরীকরণ, গোলযোগ নিবারণ, হিংসা-মারামারি ও শত্রুতা না থাকা ইত্যাদি।[২] সুতরাং এক বাক্যে বলা যায়, যাবতীয় অনাচার, অবিচার ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার নামই শান্তি।

ইংরেজী ভাষায়- peace, calm, tranquility, harmony, allience. যার আরবী হল سلام (সালাম), أمن (আম্‌ন) ও سكون (সাকূন)।[৩] শব্দগুলো কুর'আন এবং হাদিসে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

o سلام (সালাম)

سلام শব্দটি পবিত্র কুর'আনের কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে,

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

"অবশ্যই আমার পাঠানো ফিরিশতারা (বিশেষ একটি) সংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের কাছে এসেছিল, তাঁরা (তাঁর কাছে এসে) বলল: তোমার উপর শান্তি (বর্ষিত হোক)। তিনিও বললেন: তোমাদের উপরও শান্তি (বর্ষিত হোক)।"[৪]

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

"তাঁরা (ফিরিশতারা) বলবেন : 'আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কতো উত্তম আবাসস্থল আপনাদের!"[৫]

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

"যাঁরা তাঁদের রবকে ভয় করত তাঁদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তাঁরা মুক্তদ্বার জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে তখন উহার রক্ষীরা বলবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে।"[৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

---

১. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী ২০১০), পৃ. ১০৭৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৫

৩. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *বাংলা-ইংরেজী-আরবী ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৯), পৃ. ৪৭৯

৪. *আল কুর'আন*, ১১:৬৯

৫. *আল কুর'আন*, ১৩:২৪

৬. *আল কুর'আন*, ৩৯:৭৩

"হে বিশ্বাসীগণ! যখন আল্লাহর পথে বের হবে তখন তদন্ত করে নেবে এবং কেউ শান্তি কামনা করলে বা শ্রদ্ধা জানালে ইহজীবনের সম্পদের লোভে তাকে বলো না, 'তুমি বিশ্বাসী নও।' কারণ আল্লাহর কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা পূর্বে এরূপই থাকার পর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।"[৭]

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় (এ কুর'আন) দ্বারা, তিনি তাদের শান্তির পথ দেখান এবং নিজ ক্ষমতাবলে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং সরল পথে চালিত করেন।"[৮]

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। যারা মঙ্গল কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ ও আরো অনেক কিছু। মলিনতা বা অপমান ওদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। ওরাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে ওরা স্থায়ী হবে।"[৯]

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আর তারা যখন তোমার নিকট আসে, যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তখন তাদেরকে বলো, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের রব দয়া করাকে আপন কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।' তোমাদের কেউ অজ্ঞতাবশতঃ যদি খারাপ কাজ করে পরে তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১০] এমনিভাবে سلام শব্দটি পবিত্র কুর'আনের ৪২-এরও অধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদিসে سلام শব্দের ব্যবহার: হাদিসের কিতাবসমূহে শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।[১১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে কোন কাজটি উত্তম? রাসূল (স.) বললেন: মানুষকে খানা খাওয়াবে, পরিচিত আর অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।"[১২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স.) বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি) ঈমান না আনবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) ভাল না

---

৭. *আল কুর'আন*, ৩৯:৭৩

৮. *আল কুর'আন*, ০৫:১৬

৯. *আল কুর'আন*, ১০:২৫-২৬

১০. *আল কুর'আন*, ০৬:৫৪

১১. কুতুবুল *মুতূন*, আল মাকতাবাতুস শামেলাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা. বি.

১২. *সহীহ বুখারী*, বাবু ইত'আমুত্ ত'আমি মিনাল ইসলাম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১১, ২৭ ও ৫৭৬৭

বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলে দিব না যদি তোমরা তা কর তবে পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসবে! তা হচ্ছে তোমরা তোমাদের মাঝে সালামকে ছড়িয়ে দাও।"[১৩]

o أمن (আম্ন)

أمن শব্দটিও পবিত্র কুর'আন এবং হাদিসে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ-

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم

"যদি তোমরা প্রবাসে থাক আর কোন লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখা বৈধ। যদি তোমরা পরস্পরকে বিশ্বাস কর, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে, এবং তার রবকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না । নিশ্চয় যে তা গোপন করে, তার অন্তর পাপী। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা পরিজ্ঞাত।"[১৪]

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

"নিরাপত্তা অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের নিকট আসলে তখন তারা তা প্রচার করে, যদি তারা রাসূল বা যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের গোচরে আনত, তাহলে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।"[১৫]

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে (অংশী স্থাপন দ্বারা) কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।"[১৬]

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ.

"এ লোকগুলো কি এতই নিরাপত্তা লাভ করেছে যে, (তারা মনে করে নিয়েছে) আমার আযাব নিঝুম রাতে তাদের কাছে আসবে আর তারা গভীর ঘুমে বিভোর থাকবে ?"[১৭]

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই এবং যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাদের কলুষলিপ্ত করেন।"[১৮]

হাদিসে এর ব্যবহার

---

১৩. *সহীহ মুসলিম*, বাবু বায়ানু আন্নাহু লা ইয়াদ খুলুল জান্নাতা ইলণ্ডাল মু'মিনূন, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৮১

১৪. *আল কুর'আন*, ০২:২৮৩

১৫. *আল কুর'আন*, ০৪:৮৩

১৬. *আল কুর'আন*, ০৬:৮২

১৭. *আল কুর'আন*, ০৭:৯৭

১৮. *আল কুর'আন*, ১০:৯৯

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الْأَمْنِ

হযরত ‘আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন আবূ বকর (রা.) তাঁর নিকট এলেন। এ সময় মিনার দিবসগুলোর এক দিবসে তাঁর নিকট দু’টি মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল, নবী কারিম (স.) তাঁর চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন। তখন আবূ বকর (রা.) মেয়ে দু’টিকে ধমক দিলেন। সাথে সাথে নবী কারীম (স.) মুখমন্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবূ বকর! ওদের বাঁধা দিও না কারণ এ দিনগুলো আনন্দের দিন। আর সে দিনগুলো ছিল মিনার দিন। আয়িশা (রা.) আরো বলেন হাবশিরা যখন মসজিদে (এর প্রাঙ্গণে) খেলা-ধূলা করছিল তখন আমি তাদের খেলা দেখছিলাম এবং আমি দেখেছি নবী কারিম (স.) আমাকে আড়াল করে রেখেছেন। ‘উমর (রা.) হাবশীদের ধমক দিলেন। তখন নবী কারিম (স.) বললেন, হে ‘উমর ওদের ধমক দিও না। হে বনূ আরফিদা! তোমরা যা করতে ছিলে তা নিশ্চিন্তে কর। (অর্থাৎ খেলতে থাক।)[১৯]

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةَ حِينَ فَرَغَ..... أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ..الخ

“হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী কারিম (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি যখন রাতে ঘুমাতে যেতেন তখন বলতেন.... “হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছি কিয়ামতের ভয়াবহ দিনের, সেই চিরস্থায়ী দিনের জান্নাত চাই আপনার নৈকট্যশীল, রুকু-সিজদাহকারী ও ওয়াদাপূর্ণকারী বান্দাহদের সাথে। নিশ্চয় আপনি দয়াময় ও প্রেমময়। আপনি যা ইচ্ছা তাই করেন।”[২০]

o السكون (সাকূন)

السكون শব্দটিও পবিত্র কুর’আন এবং হাদিসে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি سكينة থেকে উৎগত। পবিত্র কুর’আনে কয়েক জায়গায় سكينة শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

“বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট শপথ গ্রহণ করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জ্ঞাত ছিলেন; তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের দান করলেন আসন্ন বিজয়।”[২১]

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

---

১৯. *সহীহ বুখারী*, বাবু ইজা ফা-তাহুল ‘ঈদ ইউসালিণ্ড রাক‘আতাঈনি (মাকতাবাতুস্ শামেলাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা. বি.), হাদিস নং. ৯৩৪

২০. *সহীহ আত তিরমিযী* (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৩৩৪১

২১. *আল কুর’আন*, ৪৮:১৮

"অতঃপর আল্লাহ নিজ হতে তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের উপর দয়া বর্ষণ করলেন যাতে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করলেন যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের শাস্তি দিলেন। আর এটিই অবিশ্বাসীদের কর্মফল।"[২২]

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم

"যদি তোমরা রাসূলকে সাহায্য না কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেরগণ তাঁকে বহিস্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, গুহায় তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গেই আছেন।' পরে আল্লাহ তাঁর উপর দয়া বর্ষণ করেন যাতে তাঁর চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং তোমাদের অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী দ্বারা শক্তিশালী করেন এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন, আল্লাহর কথাই সর্বোপরি। আর আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৩]

হাদিসে এর ব্যবহার

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"আর যখন কতগুলো লোক আল্লাহর ঘর সমূহের মধ্য থেকে কোন একটি ঘরে একত্রিত হয়ে পরস্পর আল্লাহর কিতাব (আল কুর'আন) তিলাওয়াত করে এবং তা নিয়ে গবেষণা করে (এর ফলে) তাঁদের উপর প্রশান্তি বর্ষিত হতে থাকে, রহমত তাঁদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখে, ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে। আর আল্লাহ (স্বীয় আরশে আজীমে) তাদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন।"[২৪]

শান্তির বিভিন্ন প্রকার

শান্তির বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। মনের উদ্বেগ দুশ্চিন্তা বিদূরিত হলে সৃষ্টি হয় মানসিক শান্তি। দৈহিক রোগ ব্যাধির উপশম হলে অনুভব হয় দৈহিক শান্তির। পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহ মনোমালিন্যের অবসান ঘটলে প্রতিষ্ঠিত হয় পারিবারিক শান্তি। সমাজে চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, হত্যা, সন্ত্রাস, মারামারি-হানাহানি, ধর্ষণ, অশ্লীলতা-নোংরামী, নানারকম হয়রানী ইত্যাদি নির্মূল হলে লাভ করা যায় সামাজিক শান্তি। দেশে দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদী নানা প্রকার সন্ত্রাস, আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী কার্যক্রম, অন্যায় যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটলে, বিশ্বের সকল দেশ পারস্পরিক সাহায্য সহযোগীতা, অকৃতিম বন্ধুত্ব ও মৈত্রির বন্ধনে আবদ্ধ হলে প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্ব শান্তি।[২৫]

শান্তির ধরন

মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট পৃথিবী যেমনি বিচিত্র তেমনি বৈচিত্রময় তাঁর যাবতীয় সৃষ্টজীব। বৈচিত্রে সেরা সৃষ্টজীবের শ্রেষ্ঠ মানবজাতি। মানুষের শারীরিক গঠন উপাদান আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি এ বস্তু চতুষ্টয় দ্বারা, কিন্তু তার মন-মনন, স্বাদ-আস্বাদ, ভোগ-বিলাস, রুচি-অভিরুচী, চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপাদান অনেক বৈচিত্রময়। এ উপাদানগত বৈচিত্রের কারণেই মানুষের

---

২২. *আল কুর'আন*, ০৯:২৬

২৩. *আল কুর'আন*, ০৯:৪০

২৪. ইমাম নববী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল 'ইলম (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৪৮৬৭

২৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, *বিশ্ব শান্তির সন্ধানে* (ঢাকা: কাঁটাবন বুক কর্ণার, প্রকাশকাল, আগস্ট-২০০৯), পৃ. ১৩

চাওয়া-পাওয়া, মন-মানসিকতা ও ভোগ বিলাসে আভা বিকশিত হয়।[২৬] একজন দাঙ্গাবাজ লোক দাঙ্গাবাজি করে শান্তিপায়। বিপরীতে আরেকটি লোক স্বীয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঙ্গাবাজ লোকটিকে পরাভূত করে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে শান্তি পায়। একজন ধনবান লোক ধন সম্পদ, বিত্ত বৈভব সংগ্রহ করে শান্তি পায়। সে গরীব মিসকিন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী তথা জাতীয় পর্যায়ে তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এমনকি নিজেও ভোগ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সমাজে সে কৃপণ অভিধায় আখ্যায়িত হলেও তাতে তার বিন্দু মাত্র আক্ষেপ নাই। কাড়ি কাড়ি অর্থ সংগ্রহ করাতেই তার শান্তি। বিপরীতে আরেকজন ধনবান লোক ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব সংগ্রহ করার সাথে সাথে গরীব-দুঃখীকে অকাতরে দান-খয়রাত, সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। বিপদে-আপদে, বালা-মুসিবতে ব্যক্তি সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্জিত ধন সম্পদ নিঃস্বার্থে বিলিয়ে দেন। পরার্থে পরোপকার, পরের তরে বিলিয়ে দেয়ার সমুদ্রে অবগাহন করে তিনি পরম স্বস্তি ও শান্তি অনুভব করেন।[২৭] একজন রক্ত পিপাসু ব্যক্তি রক্তের হোলি খেলায় আনন্দ পায়, উল্লাস করে। পক্ষান্তরে আরেকজন ব্যক্তি রক্ত দেখলে শিউরে উঠে। রক্তের হোলি খেলায় মত্ত ব্যক্তিদেরকে নিরস্ত্র করতে গিয়ে জীবন দিয়ে শান্তি পায়। এভাবে শান্তির বিপরীতমুখী ব্যক্তি ও ঘটনার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে এ বিশ্বে। এখন কোনটি সত্যিকারার্থে শান্তির পথ এ সম্পর্কে সকলের স্রষ্টা যিনি তিনিই ভাল জানেন। তাই তিনি শান্তির সুস্পষ্ট বিবরণসহ নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ আল কুর'আন। সুতরাং কুর'আন নির্দেশিত পথে শান্তি অন্বেষণ করাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।[২৮]

বিশ্বশান্তি

বাংলা অভিধানে বিশ্ব শব্দটির অর্থ করা হয়েছে- ধরিত্রি, ধরা, ভুবন, জগৎ, দুনিয়া, জাহান, প্রভৃতি। আরবীতে العالم[২৯] এবং ইংরেজিতে World। মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির বসবাসের জন্য তাদের জীবন চলার যাবতীয় উপকরণ দিয়ে যে বিশাল ভূ-ভাগ সৃষ্টি করেছেন এখানে "বিশ্ব" বলতে তা-ই উদ্দেশ্য।

সুতরাং, বিশ্বশান্তি বলতে সহজ ভাষায় যা বুঝায় তা হল, বিশ্বের বুকে যত অনাচার, অবিচার ও বিশৃঙ্খলা তথা অশান্তি তার অবসান ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. العالم শব্দটি একবচন। বহুবচন العالمون (হালতে রফয়ী), হালতে নসবীতে العالمين যেমন সূরা ফাতিহার মধ্যে এর ব্যবহার الحمد لله رب العالمين অর্থাৎ সমস্ড়প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আলণ্ডাহর জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

আল কুর'আনুল কারিমের পরিচয়

পবিত্র কুর'আন সমগ্র মানব সমাজের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ মহা গ্রন্থ অবতীর্ণ হয় শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর উপর। মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে পবিত্র কুর'আনে। একটি অনুন্নত কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ও দিশেহারা জাতিকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাপে ধাপে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় পবিত্র কুর'আনে রয়েছে তার পরিষ্কার পথ নির্দেশ। মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে কিভাবে সুখ ও শান্তিতে ভরে তোলা যায় তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে পবিত্র কুর'আনে। সাথে সাথে মানুষ কিভাবে চললে পরকালে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে এবং চির শান্তি লাভ করবে তাও পবিত্র কুর'আনে বলে দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে যারা পবিত্র কুর'আনের জীবন ব্যবস্থা মেনে চলবে তাদেরকে মহান আল্লাহ ইহ-পরকালের শান্তি প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। পবিত্র কুর'আন আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণী। এতে কাল্পনিক কোন উক্তি নেই। কোন মানুষের উক্তি এতে অনুপ্রবেশ করেনি। এতে এমন কোন বাক্য নেই যা অনুমান ভিত্তিক বা অর্থহীন। মানুষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাদের সৃষ্টিকর্তার এ বাণীর প্রত্যেকটি শব্দ এবং বাক্য সত্য ও সুন্দরের প্রতীক। আধুনিক যুগের মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে পবিত্র কুর'আনে। সৃষ্টি রহস্য, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যও এতে রয়েছে। পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত ঐ সমস্ত বিষয়কে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্ভেজাল সত্য বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। মানুষের জ্ঞান যতই বাড়ছে ততই পবিত্র কুর'আন বুঝা সহজ হচ্ছে।[৩০]

সে আদিকাল থেকেই ক্ষণস্থায়ী ধন, জন ও শক্তির গর্বে গর্বিত বিভিন্ন দেশের কিছু সংখ্যক অপরিণামদর্শী ও অকৃতজ্ঞ মানুষ বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন সময়ে কিভাবে তিলে তিলে সীমালঙ্ঘন তথা অধঃপতনের শেষ স্তরে নেমে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন ও তাদের নির্যাতন থেকে তাঁর নিরপরাধ অনুগত বান্দাদের কিভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে রক্ষা করেছিলেন তার বিস্ময়কর বর্ণনা রয়েছে পবিত্র কুর'আনে। পবিত্র কুর'আন এক অলৌকিক গ্রন্থ। লক্ষ লক্ষ লোক সমগ্র কুর'আনকে হুবহু কণ্ঠস্থ করে রেখেছে। একজন লোকও দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থ এরকম হুবহু মুখস্ত করে রাখতে পারে না। যে কুর'আনকে আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস করে না তাদেরকে আল্লাহ পবিত্র কুর'আনের যে কোন একটি সূরার অনুরূপ একটি সূরা বা অধ্যায় রচনা করতে চ্যালেঞ্জ করেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস করেনি বা একটি ছোট্ট অধ্যায় রচনা করতেও সক্ষম হয়নি। দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ হচ্ছে পবিত্র কুর'আন। এত লোক আর কোন গ্রন্থ পাঠ করে না। এটা বিশ্বে সর্বাধিক সম্মানিত গ্রন্থ। কোন গ্রন্থকে মানুষ এত সম্মান দেখায় না, যেমনটি দেখায় পবিত্র কুর'আনকে। পবিত্র কুর'আনের গুণ বৈশিষ্ট্য বলে শেষ করার মত নয়। পবিত্র কুর'আন যে এক অতুলনীয় গ্রন্থ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই তা মানতে বাধ্য হচ্ছে। বহু অমুসলিমও এ সত্য প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের মন্তব্যের কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন: "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুনিয়ার উপর পাপাচারের যেসব আচ্ছাদন পড়েছিল পবিত্র কুর'আন সেসব নির্মূল করল। পবিত্র কুর'আন দুনিয়াকে উন্নত মানবিক চরিত্র, নাগরিক আইন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করল অত্যাচারিদের হৃদয়বান এবং অত্যাচারিকে ধার্মিক বানিয়ে দিল। এ পবিত্র গ্রন্থ দুনিয়ায় না এলে মানবিক চরিত্র সমূলে ধবংস হয়ে যেত, আর দুনিয়ার মানুষ হত নাম কা ওয়াস্তে মানুষ।"[৩১] পাদ্রী ওয়ালরসন ডি. ডি. বলেন, "কুর'আন শান্তি এবং নিরাপত্তার

---

৩০. ড. এসরার আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩১. উদ্ধৃত, ডা. খন্দকার আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বাহক।"[৩২] ঐতিহাসিক বাসওয়ার্থ বলেনঃ মুহাম্মাদ (স.) ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি না লিখতে পারতেন না পড়তে জানতেন। অথচ তিনি এমন একটি গ্রন্থ উপহার দিলেন যা একাধারে ছিল ছান্দিক গদ্য গ্রন্থ, আইন গ্রন্থ ও উপাসনা গ্রন্থ। আজ বিশ্বের এক চতুর্থাংশ লোক কুর'আনের বর্ণনা ভঙ্গি, সত্যতা ও জনপ্রিয়তাকে একটি জীবন্ত মু'জেজা বলেই মনে করে। মুহাম্মাদ (স.) এ একটি মাত্র মু'জিজারই দাবী করেছিলেন এবং একে একটি জীবন্ত মু'জিজারূপে প্রতিষ্ঠিতও করে গেছেন। প্রকৃত পক্ষে এটি মু'জিজাও বটে।[৩৩]

ফরাসী ভাষায় কুর'আনের অনুবাদক ড. মরিস বুকাইলি বলেনঃ "বিষয় বস্তুর পরিপাট্য এবং ভাবের গাম্ভীর্যে পবিত্র কুর'আন সকল আসমানী গ্রন্থকে ছাড়িয়ে গেছে। অনন্ত প্রভু তাঁর আসমানী অনুগ্রহে মানুষের জন্য যেসব আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন পবিত্র কুর'আন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের মঙ্গল সাধনার ক্ষেত্রে পবিত্র কুর'আনের সুর গ্রীক দর্শনের সুর হতে অনেক উর্ধ্বে। হযরত দাউদ ('আ.) এর যুগ থেকে যে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে তার কোনটিই পবিত্র কুর'আনের একটি ছোট্ট সূরার সাথেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে উঠতে পারেনি। এর সত্য সনাতন অনবদ্য ভাব-ব্যঞ্জনা দিনের পর দিন মানুষের মনোজগতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। এর অপরূপ তথ্য রহস্য কোন দিনই সেকেলে হবার নয়। প্রত্যেক মুসলিম মাত্রই একে একটি গর্বের বস্তু বলে মনে করে।[৩৪]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক টলষ্টয় বলেনঃ "পবিত্র কুর'আন মানব জাতির একটি শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সাহিত্য, সাংস্কৃতি, জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিক দর্শন। দুনিয়ার সামনে যদি এ একটি মাত্র গ্রন্থ থাকতো এবং কোন সংস্কারকই না আসতেন তবু মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এটাই ছিল যথেষ্ট।"[৩৫] ইমাম শাফে'য়ী (র.) মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের 'সূরা 'আসর'-এর ভাবগাম্ভীর্য, এর রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর প্রতি নিঁখুত দৃষ্টি দিয়ে ঐতিহাসিক এক মন্তব্য করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য যদি শুধু সূরা আসরই নাযিল করতেন তাহলে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য এ সূরাটিই যথেষ্ট ছিল।"[৩৬] উল্লেখ্য যে, আল কুর'আনে মোট **১১৪** টি সূরা রয়েছে।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেনঃ "আল কুর'আন মানব জগতের সংস্করণ। আধ্যাত্মিক নির্দেশনা এবং জ্ঞান-গর্ভ তথ্যে সমৃদ্ধ। এ মহাগ্রন্থ মানব সভ্যতার এক বিস্ময়কর সংস্কার সাধন করেছে। যে সকল মনীষী এর মর্ম এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সন্ধান পেয়েছেন তারাই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কুর'আন একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। মানব জীবনের যে কোন সমস্যাই এর কাছে নিয়ে যাওয়া হোক না কেন কুর'আন তার সমাধান বের করবেই।"[৩৭]

সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রফেসর টমাস কারলাইল বলেনঃ "পবিত্র কুর'আনকে এমন এক সময়ে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা হয় যখন পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ তথা দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে ছিল ধর্মহীনতার অবাধ রাজত্ব। মিটে গিয়েছিল মানবতা সৌজন্যতা এবং সভ্যতা সংস্কৃতির নাম নিশানা। দিকে দিকে ছিল অশান্তি ও অরাজকতার আধিপত্য এবং ব্যক্তি পূজার সমারোহ। পবিত্র কুর'আন মানুষকে বাতলে দিল শান্তির পথ, তাদের অন্তর ভরে দিল প্রেম ও ভালবাসায়। ফলে কেটে গেল ফেতনা ফাসাদের কালো

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. ড. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কুর'আন ও বিজ্ঞান*, অনু: আখতার-উল-আলম (ঢাকা: জ্ঞাণকোষ প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৩৩৮

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

৩৬. ড. আলী আস্‌সাবূনী, *সফওয়াতুত্ তাফাসীর* (কায়রো: দারুস সাবূনী, ১৪১৭ হি.), ৩য় খন্ড, পৃ. ৫৭৩

৩৭. উদ্ধৃত, ডা. খন্দকার আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

মেঘ, প্রতিহত হলো যুল্‌ম ফাসাদের অবাধ গতি। পথ ভ্রষ্টরা পথে এলো আর বর্বরেরা সভ্য হলো। এ গ্রন্থ পাল্টে দিল গোটা দুনিয়ার অবয়ব। পবিত্র কুর'আন মূর্খকে জ্ঞানী, অত্যাচারীকে হৃদয়বান এবং আল্লাহ দ্রোহীকে আল্লাহ ভীরুতে পরিণত করলো। এ গ্রন্থ আজ দুই শত কোটি মানুষের মনোরাজ্যের অধিপতি এবং তাদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু।"[৩৮] ঐতিহাসিক গীবন বলেছেন: "সকল রকম সন্দেহ ও ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুহাম্মাদ (স.) এর ধর্মমত পূর্ণভাবে মুক্ত এবং মহাগ্রন্থ আল কুর'আন আল্লাহর একত্বের এক অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত।"[৩৯] মহা কবি গ্যেটে বলেছেন: "যত বেশি বিরক্তি নিয়েই আমরা এ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থ সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটায়। তা পাঠককে সন্তুষ্ট করে, আকর্ষণ করে এবং পরিশেষে এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে পাঠককে বাধ্য করে। উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এর স্টাইল, এর ভাষা এত বেশি জোড়ালো, প্রত্যয়দীপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ যে, যে কোন যুগে ও কালের যে কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এ গ্রন্থ সঠিক অর্থেই শাশ্বত ও জীবন্ত গ্রন্থ হিসাবে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।[৪০]

এ কুর'আন হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ এবং সকল জ্ঞানের উৎস।[৪১] এটা মানব জাতির জন্য একটি স্থায়ী কল্যাণকর সংবিধান। মানব জীবনের সকল দিক ও বিষয়ের সম্মানজনক স্থায়ী ও নির্ভুল সমাধান রয়েছে আল কুর'আনে।[৪২] বস্তুত পবিত্র কুর'আনের কোন তুলনা নাই। তার দৃষ্টান্ত সে নিজে। যে যত গভীরভাবে খোলা ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে পবিত্র কুর'আনের অধ্যয়ন করবে তার চোখে তত বেশি ধরা পড়বে পবিত্র কুর'আনের সৌন্দর্য, মাহাত্ব ও সত্যতা। এর পূর্বে এত সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ আসমানী গ্রন্থ আর নাযিল হয়নি। তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

"আমার গ্রন্থে (আল কুর'আনে) বর্ণনা বিশ্লেষণে কোন কিছুই বাদ রাখিনি।"[৪৩]

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

"সেদিন আমি প্রত্যেক কওমের মধ্য হতে তাদের বিষয়ে একজন সাক্ষী উত্থিত করব এবং এদের বিষয়ে তোমাকে আমি সাক্ষীরূপে আনব। আমি আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করলাম।"[৪৪]

الْقُرْآن এর আভিধানিক অর্থ

الْقُرْآن শব্দের ক্রিয়ামূল কয়েকভাবে হতে পারে। এ কারণে এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায়। الْقُرْآن শব্দটি যদি قرء ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত হয় তবে এর অর্থ দাঁড়াবে, পাঠ করা, উচ্চারণ করা ইত্যাদি। আর যদি মাফ'উলুন ওজনে مقروء হয়, তখন পঠিত (Recited) অর্থ প্রদান করবে। আল

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৪০. প্রাগুক্ত

৪১. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা* (ঢাকা: ই.ফা.বা. এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ৪০৭

৪২. আহমেদ দিদাত, অনু. এ কে মোহাম্মদ আলী, *অলৌকিক কিতাব আল কুর'আন* (ঢাকা: র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০০৮), পৃ. ২৪

৪৩. *আল কুর'আন*, ০৬:৩৮

৪৪. *আল কুর'আন*, ১৬:৮৯

কুর'আনের পরিচয় সম্পর্কে ড. এসরার আহমদ বলেন: "কুর'আন মাজিদের পরিচয় প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যে কথাটি আসে তা হল, 'কুর'আন মাজিদ' সম্পর্কে আমাদের ধারণা এবং সাধারণ বিশ্বাস কি? বিষয়টিকে মোটামুটিভাবে বুঝে নেয়ার জন্যে আপাতত তিনটি শিরোনামে ভাগ করে নেয়া যেতে পারে। যথা-

১. আল কুর'আন আল্লাহ তা'আলার কথা (কালামুল্লাহ)।

২. আল কুর'আন মুহাম্মাদ (স.) এর উপর নাযিল হয়েছিল ও

৩. আল কুর'আন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষণে নিখুঁত-নির্ভুল এবং পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে না কোন সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে আর না এর কোন আয়াত বিলুপ্ত হয়েছে।"[৪৫]

আল ফাররা বলেন: اَلْقُرْآن (আল-কুর'আন) শব্দটি القرائن থেকে উদ্ভূত। এটি قرينة এর বহুবচন, যার অর্থ অনুরূপ। যেহেতু কুর'আনের একটি আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ, সেহেতু কুর'আনকে কুর'আন বলা হয়।[৪৬] আয্ যুযাযের মতে قُرْآن শব্দটি فعلان ওজনে গঠিত এবং قرء ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ সন্নিবেশ করা। পানি হাউজে জমা করা হলে বলা হয়:

قرأ الماء في الحوض

"পানি হাউজে জমা হয়েছে।" কুর'আন মাজিদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারবস্তু জমা করা হয়েছে বলে তাকে কুর'আন বলা হয়।[৪৭]

পারিভাষিক অর্থ

মু'জিজাতুল কুর'আন গ্রন্থ প্রণেতা বলেন:

اَلْقُرْآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف

"কুর'আন হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার কালাম যা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।"[৪৮] "সুনান আদ্ দারেমী" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে: হযরত 'আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتين، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب

"আল কুর'আন আল্লাহর ভান্ডার, সুতরাং তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহর ভান্ডার থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহর শক্তিশালী রশি, সুস্পষ্ট আলো, উপকারী প্রতিষেধক, যে এটাকে আঁকড়ে ধরে সে মুক্তি পায়, যে অনুসরণ করে সে রক্ষা পায়, এতে কোন বক্রতা নেই এবং এতে কোন ভ্রষ্টতাও নেই।"[৪৯] বিশিষ্ট আল কুর'আন গবেষক ড. সুবহি সালিহ বলেন:

هو كلام المنزل علي النبي صلي ا عليه وسلم المكتوب فى المصاحف المنقول عنه بالتواتر

---

৪৫. ড. এসরার আহমদ, *কুর'আনের পরিচয়*, অনু. মোস্তফা ওয়াহিদুজ্জামান (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০৭), পৃ. ০৯

৪৬. জালাল উদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*, ১ম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫১

৪৭. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুর'আন* (বৈরুত: দারুল ইহ্ইয়াত তুরাছিল আরাবী, ১৯৪৫), ১ম খন্ড, পৃ. ০৮

৪৮. শায়খ মুতাওয়ালিল্ল আশশি'রাভী, *মু'জিজাতুল কুর'আন* (মাকতাবাতুস্ শামেলাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা. বি.), ১ম খন্ড, পৃ. ২৫

৪৯. *সুনান আদ্ দারেমী*, বাবু ফাদ্লু মান ক্বরা'য়াল কুর'আন (মাকতাবাতুস্ শামেলাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা. বি.), হাদিস নং. ৩৩৭৮

المتعبد بتلاوته

"তা মুহাম্মাদ (স.) এর উপর নাযিলকৃত এমনই এক মু'জিজাপূর্ণ বাণী যা মাসাহিফে লিপিবদ্ধ, তাঁর থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত এবং যার তিলাওয়াত ইবাদাত হিসেবে পরিগণিত।"[৫০] আল কুর'আনের পরিচয় সম্পর্কে ফিক্হ ও উসুলবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে:

انه اللفظ المنزل على محمد صلعم من تول الفاتحة الى اخر سورة الناس

"নিশ্চয় তা নবী কারিম (স.) এর উপর অবতীর্ণ, প্রথম সূরা থেকে শেষ সূরা নাস পর্যন্ত সকল বাণীই হল আল কুর'আন।"[৫১] আল্লামা যারকানী বলেন:

ان القرآن علم اى كلام ممتاز عن كل ما عداه من الكلام الإلهى

"আল কুর'আন আল্লাহর অন্যান্য কালাম বা বাণী হতে পৃথক অনন্য উৎকৃষ্টবাণী যা তার পূর্ববর্তী সকল অহী হতে মর্যাদাবান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।"[৫২]

পবিত্র কুর'আনে কুর'আনের পরিচয়

আল কুর'আনের পরিচয় আল কুর'আনেই আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন:

الم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"আলিফ্ লা-ম্ মীম। এ সে কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, এ সাবধানীদের জন্য পথ-নির্দেশক।"[৫৩]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আমি কুর'আন অবতীর্ণ করি যা বিশ্বাসীদের জন্য উপশমকারী ও দয়া, কিন্তু যা বৃদ্ধি করে তা জালিমদের ক্ষতিই।"[৫৪]

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

"এটা (কুর'আন) মানব জাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সাবধানীদের জন্য দিশারী ও উপদেশ।"[৫৫]

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

"এবং এটা তো তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। আর (অচিরেই) তোমরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫৬]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"রমাদান মাস উহাতে মানুষের হেদায়েত ও সৎপথের নিদর্শন ও ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যকারী রূপে কুর'আন নাযিল হয়েছে।"[৫৭]

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

"বস্তুতঃ এ সম্মানিত কুর'আন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।"[৫৮]

---

৫০. ড. সুবহি সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৫২. আযযারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান ফি 'উলূমিল কুর'আন*, পৃ. ১৮

৫৩. *আল কুর'আন*, ০২:০১-০২

৫৪. *আল কুর'আন*, ১৭:৮২

৫৫. *আল কুর'আন*, ০৩:১৩৮

৫৬. *আল কুর'আন*, ৪৩:৪৪

৫৭. *আল কুর'আন*, ১৭:৮২

৫৮. *আল কুর'আন*, ৮৫:২১-২২

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"নিশ্চয় এ সম্মানিত কুর'আন, যা আছে সুরক্ষিত গ্রন্থে, পূত-পবিত্রগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করবে না।"[৫৯]

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ.

"সাবধান! এটা উপদেশবাণী; অতএব যে ইচ্ছা করবে সে একে স্মরণে রাখবে। এটা সম্মানিত লিপিকায় আছে, যা উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন পুত-পবিত্র। তা এরূপ লিপিকারের হাতে আছে যারা পূত-চরিত্র ফেরেশতা।"[৬০]

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"নিশ্চয় আমি কুর'আনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।"[৬১]

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"এ কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি যা কল্যাণময়। তাই এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও হয়তো তোমরা অনুগ্রহ পাবে।"[৬২]

আল হাদীসে কুর'আনের পরিচয়

আল কুর'আনের পরিচয় সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন,

كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا { إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ } مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ

"এটা আল্লাহর কিতাব যাতে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের সব সংবাদ এবং তোমাদের যাবতীয় বিষয়ের বিধান। এ কুর'আন সুস্পষ্ট সত্য; ঠাট্টা-বিদ্রুপ নয়। যে তা অহংকার বশত ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। যে ব্যক্তি তা ব্যতীত অন্য কোথাও হিদায়াত অনুসন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দেন। আর এটা আল্লাহর মজবুত রজ্জু এবং বিজ্ঞানময় উপদেশগ্রন্থ। আর তা সরল সঠিক পথ, যা দ্বারা প্রবৃত্তি বক্র পথে চলতে পারে না। এর মাধ্যমে জিহবা সংশয়ে পড়ে না এবং জ্ঞানীগণ এর থেকে (জ্ঞান অর্জন করে) তৃপ্ত হয়ে যায় না। অধিক পুনরাবৃত্তি একে পুরাতন করে দেয় না। তার বিস্ময়কর বিষয়াবলী শেষ হবে না। তা এমন গ্রন্থ জিন জাতি যখন তা প্রথম শুনল আশ্চর্য না হয়ে পারলো না, এমনকি তারা একযোগে বলে উঠল,

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ

'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুর'আন শুনেছি, যা সঠিক পথনির্দেশ করে। ফলে, আমরা এতে বিশ্বাস করেছি।' এ কুর'আন দিয়ে যে কথা বলে সে সত্য কথা বলে, যে এর প্রতি আমল করে তাকে প্রতিদান দেয়া হয়। যে এর দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে সে ন্যায় বিচার করে, যে এর দিকে মানুষকে ডাকে সে সঠিক পথের দিকেই ডাকে। হে এক চোখা! সময় থাকতে উক্ত হিদায়াতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর।"[৬৩]

---

৫৯. *আল কুর'আন*, ৫৬:৭৭-৭৯

৬০. *আল কুর'আন*, ৮০:১১-১৬

৬১. *আল কুর'আন*, ১২:০২

৬২. *আল কুর'আন*, ০৬:১৫৫

৬৩. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত্ তিরমিযী, *আস্সুনান* (বৈরূত: দারু ইহইয়াত তুরাছিল আরাবী), ৫ম খন্ড, পৃ. ১৭২, হাদিস নং. ২৮৩১

আল কুর'আনের নাম সমূহ

কুর'আন মাজীদে উল্লিখিত আল কুর'আনের নাম সিফাতের দিক থেকে কত এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। ইমাম যারাকসি (র.) বলেন, আল কুর'আনের গুণবাচক নামের সংখ্যা প্রায় ৯৯ টি।[৬৪] আল্লামা জালালুদ্দীন আস্ সুয়ূতি (র.) আল কুর'আনের ৫৫ টি নাম উল্লেখ করেছেন।[৬৫]

আল কুর'আনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলার বিশাল ও অন্তহীন ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষদেরকে সঠিক ধারণা ও চূড়ান্ত জ্ঞান প্রদান, সরল সঠিক পথে মানব জীবন পরিচালনা পদ্ধতি অবহিত করণ, আল্লাহর পরম নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জন, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস-অবস্থা, তাদের ভয়ংকর পরিনতি পর্যবেক্ষণ পূর্বক শিক্ষাদান এবং পৃথিবীতে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই আল কুর'আনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থের আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানুষ। সুতরাং কার্যত ও বাস্তবে সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি, সুদৃঢ় কর্মনীতির মাধ্যমে আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ অবলম্বন এবং তা প্রতিপালন ও বাস্তবায়নের উদাত্ত আহবান জানানোই আল কুর'আনের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আল কুর'আনের বিষয় ভিত্তিক আয়াতের পরিসংখ্যান

আল কুর'আনের বিষয় ভিত্তিক আয়াতমালার একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হল: জান্নাতের ওয়াদা ১০০০, জাহান্নামের ভয় ১০০০, আদেশ ১০০০, নিষেধ ১০০০, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ১০০০, হালাল ২৫০, হারাম ২৫০, আল্লাহর পবিত্রতা ১০০ ও বিবিধ বিষয়ে ৬৬ খানা আয়াত রয়েছে।[৬৬]

পবিত্র কুর'আন সম্পর্কে যা জেনে রাখা আবশ্যক

আল কুর'আন সংরক্ষণের দায়িত্ব

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য উপদেশ স্বরূপ মহাগ্রন্থ আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি এর সংরক্ষকও বটে। এর প্রত্যেক বাণী অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং জগতে কেউ এর ব্যতিক্রম বা প্রতিরোধ করতে পারবে না। এর স্পষ্টতর মমার্থ এ যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ মহিমা বলে চিরকাল কুর'আনুল কারিমের বিশুদ্ধতা রক্ষা করবেন, কেউ একে বিকৃত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত অথবা রূপান্তরিত করতে পারবে না। বিশ্বজগতে যত ধর্মগ্রন্থ আছে তম্মধ্যে স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ আল কুর'আন ছাড়া এ অতুলনীয় গৌরব আর কোন ধর্মগ্রন্থের নেই। জগতের সমস্ত ধর্ম গ্রন্থই পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, বিকৃত অথবা রূপান্তরিত হয়ে গেছে; কেবলমাত্র আল কুর'আনুল কারিমই সম্পূর্ণ অবিকৃত থেকে এ জ্বলন্ত ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা ঘোষণা করছে। আজ পর্যন্ত এর একটি শব্দ, একটি বর্ণ এমনকি এর জের জবরেও ব্যতিক্রম হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। আল্লাহর বাণী হওয়ার এর চেয়ে আর কি অলৌকিকত্ব থাকতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

---

৬৪. বদরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুলণ্ঢাহ যারাকশি, *আল বুরহান ফি 'উলুমিল কুর'আন* (বৈরুত: দারুয যাইল, ১৪০৮ হিজরী), প্রথম খন্ড, পৃ. ২৭৩

৬৫. জালালুদ্দীন আসসুয়ূতি, *আল ইতকান ফি 'উলূমিল কুর'আন*, সপ্তদশ অধ্যায় (মাকতাবাতুল মা'আরিফিল ইসলামি, ১ম সংস্করণ, তা. বি.), পৃ. ০৭-৩০

৬৬. হাফেজ মুনিরউদ্দীন আহমদ, *কোর'আন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, (লন্ডন: আল কোর'আন একাডেমী), পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

"নিশ্চয় আমিই কুর'আন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।"[৬৭]

লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত

কুর'আন আল্লাহর বাণী। এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর কালাম কুর'আনকে অবিশ্বাস করা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আল কুর'আন অবিশ্বাস ও অমান্য করার বস্তু নয় বরং এটা এক মর্যাদাবান কুর'আন যা লাওহে মাহফুযে নির্দিষ্ট ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কুর'আনের পূর্বেও যে সব আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছে তা সবই লাওহে মাহফুযে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। সেখানে কুর'আন এমন হেফাযতে আছে যে, তাতে কোনো রকম রদবদল হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। শয়তানের ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছার কোন ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা তাকে দেননি। আর তা হতে অত্যন্ত সর্তকতা ও হেফাযতের সাথে হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতিত (যাঁকে তিনি এ কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন)। সে ক্ষেত্রে তখন আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী ফেরেশতা নিযুক্ত করেন।"[৬৮]

অহী প্রেরণের সময় তাদের অগ্র-পশ্চাতে রক্ষী ফেরেশতা প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ নিজের কোন মনোনীত পয়গম্বরকে যদি কোন জ্ঞান দান করতে ইচ্ছা করেন- যা নবুওয়াত সংক্রান্ত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তা নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণকারী হোক- যেমন ভবিস্যদ্বাণীসমূহ কিংবা নবুওয়াতের শাখাসমূহ হোক- যেমন শরীয়াতের বিধানসমূহ জানা। তখন এরূপে জানিয়ে দিয়ে থাকেন যে, উক্ত পয়গম্বরের সম্মুখে ও পশ্চাতে অর্থাৎ চতুর্দিকে ওহী রক্ষী ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করে থাকেন- যাতে শয়তান এতটুকুও বিভ্রান্ত করতে না পারে। কেননা শয়তান ফেরেশতাগণ হতে শ্রবণ করে অপরাপরের নিকট বলতে পারে অথবা কোন কুমন্ত্রণা বা অন্য কিছু অন্তরে জাগাতে পারে। তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর জন্য চারজন রক্ষী ফেরেশতা নিযুক্ত ছিলেন। রুহুল মা'আনী কিতাবে ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে। এ ব্যবস্থা এ কারণে করা হয় যেন বাহ্যত আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, উক্ত ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর বার্তা রাসূল (স.) পর্যন্ত হেফাযতের সাথে পৌঁছে দিয়েছেন এবং এতে কারোও হস্তক্ষেপ হয়নি। আর কেবলমাত্র অহীর বাহক ফেরেশতাই তো ওহী পৌঁছে থাকেন। সঙ্গে থাকার কারণে রক্ষী ফেরেশতাগণকেও অহীর বাহক বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের অর্থাৎ সে রক্ষী ফেরেশতাদের যাবতীয় অবস্থা আয়ত্বে রেখেছেন। কাজেই এমন প্রহরী নিযুক্ত করেছেন যারা এ কাজের জন্য পূর্ণ উপযোগী। বরং তিনি প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা অবগত আছেন। অতএব অহীর সমস্ত অংশ একটি একটি করে তাঁর জানা আছে। তিনি ফেরেশতা ও নবীদের অন্তরে সমস্ত অংশের হেফাযত করে থাকেন। কেননা রক্ষী ও প্রহরী ফেরেশতাগণের কড়া প্রহরার ফলে রাসূলের নিকট পৌঁছার পূর্বে কোন জ্বিন অজ্ঞাতসারে শ্রবণও করতে পারে না এবং অহীর কোন অংশ এলোমেলোও হতে পারে না। যেহেতু তিনি প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা অবগত রয়েছেন। কাজেই ওহীর কোন অংশ পৌঁছতে ভুল হলে আল্লাহ জানতে পারেন এবং ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভবনাও নেই। সুতরাং প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সর্ব প্রকারের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তা লাওহে মাহফুযে যে অবস্থায় আছে কিয়ামত পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাকবে। এটি আল্লাহর বাণী ছাড়া আর কারও বাণী হতে পারে না।

---

৬৭. প্রাগুক্ত

৬৮. *আল কুর'আন*, ৭২:২৭

এমতাবস্থায় কুর'আনকে অবিশ্বাস করা এবং এটা মিথ্যা বলে প্রকাশ করা নিশ্চয় নিতান্ত মুর্খতার পরিচয় এবং আল্লাহর শাস্তিভোগের উপযোগী। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ.

"বস্তুত তা সম্মানিত কুর'আন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।"[৬৯]

নবুওয়াতের দলিল

হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর নবুওয়াত সম্বন্ধে বিধর্মীদের মধ্যে যে মতানৈক্য ও বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট মিমাংসা করে দিয়েছেন। কুর'আনের স্বীয় অলৌকিকত্বের কারণে রাসূলে আকরাম (স.) এর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে তা যথেষ্ট। কুর'আনের দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে- যার জন্য একে একটি পূর্ণ গ্রন্থ বলা হয়। প্রথমটি হলো, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অলৌকিক বস্তু হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত হওয়া। কুর'আনের আরও কয়েকটি বিশেষ গুণ হল- (১) আল কুর'আনের উদ্দেশ্যে ছিল হেদায়াত ও শিক্ষাদান। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটি পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট। (২) এর ধর্ম বিষয়ক আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ অতিশয় পরিস্কাররূপে বিবৃত হয়েছে। (৩) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। (৪) আল্লাহর এ বাণী বাস্তবতা ও মধ্যপন্থা হিসেবে পরিপূর্ণ। এতে ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কীয় যে সমস্ত বিষয় বস্তু আছে তাতে পূর্ণ বাস্তবতা আছে। আর আত্মার পালনীয় যে সমস্ত আদেশ নিষেধ রয়েছে তাতেও মধ্য পন্থা বিরাজ করছে। (৫) তাঁর এ বাণী পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আল্লাহ স্বয়ং একে পরিবর্তন হতে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং এটি আল্লাহর বাণী আল্লাহর বাণী ছাড়া আর কিছু নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন:

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

"তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সালিস মানব? যদিও তিনি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"[৭০]

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

"সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৭১]

অন্য সকল গ্রন্থ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন

কুর'আন এমন একটি গ্রন্থ যা আল্লাহর বাণী হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভুলত্রুটি এমনকি এর সম্ভাবনা হতেও আল কুর'আন সম্পূর্ণ মুক্ত। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অন্যান্য গ্রন্থের যেমন পবির্তন, পরিবর্ধন যা পরিমার্জন হওয়া সম্ভবপর এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সেরূপ কোন আশঙ্কা নেই।[৭২] এ গ্রন্থের রচয়িতা মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, "এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই।"[৭৩] অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতাগণ প্রায়ই বলে থাকেন, পুস্তকের ভুলত্রুটি মার্জনীয় এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। কিন্তু পবিত্র কুর'আন অবতারণার প্রারম্ভ হতে অধ্যাবধি লক্ষ লক্ষ

---

৬৯. *আল কুর'আন*, ৮৫:২১-২২

৭০. *আল কুর'আন*, ০৬:১১৪

৭১. ডা. খন্দকার আব্দুল মান্নান, *কম্পিউটার ও আল কুর'আন* (ঢাকা: ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ০৮

৭২. *আল কুর'আন*, ০৬:১১৫

৭৩. *আল কুর'আন*, ০২:০২

হাফেযের স্মৃতিতে অবিকৃতভাবে হুবহু সুরক্ষিত হয়ে আসছে। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এ গ্রন্থের কোন সংশোধিত সংস্করণের প্রয়োজন হবে না। জগতের অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর ধর্মগ্রন্থের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার এরূপ কোনই ব্যবস্থা নেই। এর ভাষার অনুপম সৌন্দর্য্য, ভাষার অনাবিল গাম্ভীর্য্য এবং উপদেশাবলীর অলৌকিক সামঞ্জস্যই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কুর'আনের ভাব ও ভাষা জগদ্বাসীর অনুকরণীয়। সর্বোপরি কুর'আনের ভাষা প্রাঞ্জলতা, বর্ণনা চাতুর্য, বিষয়ের ধারাবাহিকতা এবং অকাট্য যুক্তির সমাবেশ কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকবে। কেউ এরূপ গ্রন্থের সদৃশ কোন গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না। ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র সেচ করা যেমন অসম্ভব, কোন বইয়ের ক্ষুদ্র পরিসরে আল কুর'আন সম্পর্কে আলোচনা করা ততোধিক দুঃসাধ্য। আল কুর'আনে বিন্দুমাত্র ভুল-ভ্রান্তি নেই। পৃথিবীর এমন কোন গ্রন্থ নেই যা সম্পর্কে এ নিশ্চয় তা দেয়া যাবে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুর'আনই এর ব্যতিক্রম। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.

"এটা এমন কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ নির্দেশ।"[৭৪]

কোন কবি বা গণকের উক্তি নয়

সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিশ্বজগতের শপথ করে বলেছেন যে, এ পবিত্র কুর'আন কোন কবির রচনা কিংবা গণকের উক্তি নয়। হযরত মুহাম্মাদ (স.) কোনদিন কবি বা গণক ছিলেন না। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠে কোন কবিতার ছন্দ প্রকাশিত হয়নি। অবিশ্বাসী কাফিররা হযরত মুহাম্মাদ (স.)-কে কবি, গণক ও প্রবঞ্চক বলে যে অপবাদ দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ অসংযত ও অসত্য। বরং এ কুর'আনের বাণী সর্বশক্তিমান বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কবির বাক্য কখনই বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ হতে পারে না। গণক বা ভুত প্রেত, জ্বিন, শয়তান ও পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তিদের উক্তি প্রায়ই মিথ্যা ও ভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং তা কখনই কোন কবি বা গণকের উক্তি হতে পারে না। হযরত মুহাম্মাদ (স.) কখনই কবি বা গণক ছিলেন না। তা কেবলমাত্র আল্লাহরই বাণী। এতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

"তা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর, তা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। তা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।"[৭৫]

কারো পক্ষে রচনা সম্ভব নয়

কতক কাফির হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে জ্যোতিষ বলে উক্তি করত অর্থাৎ জ্যোতিষকে যেমন শয়তান আসমানী সংবাদ বলে যায় তদ্রুপ হযরত মুহাম্মাদ (স.) কেও শয়তান এসে এরূপ বলে যাচ্ছে। দূররে মানসুর গ্রন্থে ইব্ন যায়দ (র.) কর্তৃক এরূপ বর্ণিত আছে। আর সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, এক রমনী হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে বলেছিল "আপনার শয়তান আপনাকে ত্যাগ করায় ওহী আগমনে বিলম্ব হচ্ছে।" উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর অসর্তকতার কারণে কয়েকদিন ওহী নাযিল বন্ধ ছিল এরূপ মন্তব্য সম্পূর্ণ অবান্তর। আল কুর'আন বিশ্বপালক আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতারিত। কোন শয়তান তা নিয়ে আসেনি। অন্তত: দুই কারণে শয়তান তা করতে পারে না।

প্রথমত: তা শয়তানের স্বভাবগত কাজ নহে। শয়তানের স্বভাব কু-মন্ত্রণা প্রদান ও বিপদগামী করা। সুতরাং কুর'আন আনয়ন করা তার অনুকূলেই না। কেননা কুর'আনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত

---

৭৪. *আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

৭৫. *আল কুর'আন*, ৬৯:৪১-৪৩

হেদায়াতের কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের আপাদ মস্তক মানুষকে পথভ্রষ্ট করার খেয়ালে পরিপূর্ণ। সুতরাং এ বিষয়গুলো তার নিকট আসতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: অহী নাযিল হওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে শ্রবণ শক্তিহীন করে দিতেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) কে এমন ক্ষমতা প্রদান করতেন যাতে শয়তান তো দূরের কথা কোন শক্তিই তাঁর নিকট পৌছাতে পারেনি। সুতরাং ওহী আনয়ন করা শয়তানের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। অতএব আল কুর'আন নি:সন্দেহে আল্লাহর বাণী। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.

"শয়তান তাসহ অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।[৭৬]

জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক নাযিলকৃত

পবিত্র কুর'আন আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তা'আলা তা সুদীর্ঘ ২৩ বছরে ফেরেশতাদের শিরোমনি হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর নিকট নাযিল করেন। নক্ষত্র পুঞ্জ, রাত ও ঊষার শপথ করে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা শিরোমনি হযরত জিবরাঈল (আ.) এর গুণাগুণ সম্পর্কে বলেন, (১) এ ফেরেশতা অত্যন্ত শক্তিশালী। (২) এ ফেরেশতা আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান। (৩) আসমানসমূহে তাঁর বাক্য প্রতিপালিত হয়। (৪) আল্লাহর নিকট তিনি বিশ্বাসভাজন। (৫) বিশ্বাসভাজন ও আমানতদার বলে তিনি আল্লাহর কালামের গুরুত্বপূর্ণ মহাবাণী যথাযথভাবে হুবহু নবী-রাসূলের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এমন কোন শক্তি ছিল না তাঁর নিকট ঘেঁষে। আর হযরত মুহাম্মাদ (স.)ও তাঁকে চিনতেন। কাজেই কুর'আন আল্লাহর বাণী এবং ফেরেশতা শিরোমনি হযরত জিবরাঈল (আ.) তা পৌঁছে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ.

"আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়, শপথ নিশার যখন তার অবসান হয় আর উষায় যখন তার আবির্ভাব হয়, নিশ্চয় এ কুর'আন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী। যিনি সামর্থ্যশীল, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাঁকে সেথায় মান্য করা হয়, যিনি বিশ্বাসভাজন।"[৭৭]

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.

"নিশ্চয় এ কুর'আন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা।"[৭৮]

এতে কোন বৈসাদৃশ্য নেই

যারা কাফির ও হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসী নয় তারা কুর'আনের পরিমার্জিত ভাষার অবস্থা ও স্থানোচিত বর্ণনার গায়েবি বিষয়ের সংবাদ প্রদানের অলৌকিকতা দেখেও কুর'আনে মনঃসংযোগ করে না যাতে তা আল্লাহর কালাম হওয়া তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর যদি তা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট থেকে আসত তবে তার বিষয়বস্তু সমূহের মধ্যে বাস্তব বিষয়গুলোর সাথে অলৌকিক রচনা ভঙ্গির সাথে তারা বহু বৈসাদৃশ্য পেত। কেননা তাতে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে, সুতরাং প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুতে এক একটি করে বিভিন্নতা ও বৈসাদৃশ্য হয়ে অনেকগুলো বৈসাদৃশ্য হত।

---

৭৬. *আল কুর'আন*, ২৬:২১০-২১২

৭৭. *আল কুর'আন*, ৮১:১১৫-১২১

৭৮. *আল কুর'আন*, ৬৯:৪০

অথচ কুর'আনের কোন একটি বিষয় বস্তুতেও কোন অনৈক্য ও বৈসাদৃশ্য নেই। কাজেই তা অবশ্যই কোন গায়রুল্লাহর কালাম নহে বরং আল্লাহর কালাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

"তবে কি তারা কুর'আন অনুধাবন করে না? তা যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট হতে আসত তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেত।"[৭৯]

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সমর্থক

কুর'আন আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি ব্যতিত অপর কারো পক্ষে এমন গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর কুর'আন আল্লাহর বাণী হওয়ার আরও একটি অলৌকিকত্ব হল এ যে, এ মহাগ্রন্থ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিলের সত্যতা প্রতিপালনকারী এবং সে সকল গ্রন্থে এর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের বিশ্লেষণকারী। এছাড়া প্রমাণিত হচ্ছে যে, পবিত্র কুর'আনে পূর্ববর্তী স্বর্গীয় গ্রন্থের বহু অস্পষ্ট নীতি এবং সংক্ষিপ্ত বিধি নিষেধ সুস্পষ্টভাবে ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের শেষ গ্রন্থ ইঞ্জিলের কথাই আলোচনা করা যাক। তাতে মানবের সংসার যাত্রা, সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্মনীতি এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ও পরলোক সম্বন্ধে কোন কথাই যেমন স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি। হাওয়ারীগণের দ্বারা পুন: পুন: জিজ্ঞাসিত হয়েও হযরত 'ঈসা (আ.) অস্পষ্ট আভাস ব্যতিত উহার কোনই সুস্পষ্ট জবাব দেননি। কিন্তু পবিত্র কুর'আনে তার প্রত্যেক বিষয় অতি সুন্দর ও সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর এ পবিত্র বাণী কুর'আন মানব জাতির জন্য কোন অপূর্ব মতবাদ বা অভিনব ধর্ম প্রচার করতেছে না। বরং এ কুর'আন এর পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশ তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল প্রভৃতি ঐশী গ্রন্থসমূহেরও সাক্ষী প্রদান করছে। আল্লাহ বলেন: "আমি যা অবতীর্ণ করেছি" অর্থাৎ কুর'আন এবং তোমাদের সঙ্গে যা আছে অর্থাৎ তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল প্রভৃতি। আল্লাহর উক্তির মর্ম হল এ যে, আমার অবতারিত কুর'আনের সত্যতার প্রমাণ তোমাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থেও আছে। তোমরা জেনে শুনে তুচ্ছ লোভে অথবা হিংসার বসে সে কথা গোপন কিংবা পরিবর্তন করো না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

"এ কুর'আন আল্লাহ ব্যতিত অপর কারও রচনা নয়। পক্ষান্তরে এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তার সমর্থক এবং তা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।"[৮০]

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

"আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য, তা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।"[৮১]

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

"আর তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারীস্বরূপ আমি যা নাযিল করেছি তার প্রতি তোমরা ঈমান আন এবং তোমরা তা প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর তোমরা আমার আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি করো না এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।"[৮২]

---

৭৯. *আল কুর'আন*, ০৪:৮২

৮০. *আল কুর'আন*, ১০:৩৭

৮১. *আল কুর'আন*, ৩৫:৩১

৮২. *আল কুর'আন*, ০২:৪১

এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করতে পারে না

মহা প্রশংসিত ও মহাজ্ঞানী প্রভু হতে এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। তা এরূপ শক্তিশালি স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ যে, এর সম্মুখ হতে অথবা এর পশ্চাৎ হতে কোন ভুলভ্রান্তি এর মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারবে না। উপরোক্ত উক্তির মর্ম এ যে, তা এরূপ অনুপম অতুলনীয় মহাগ্রন্থ যে, এর মধ্যে কোন ভুলভ্রান্তি নেই। যুগযুগান্তর ধরে চেষ্টা করলেও কেউ এতে কোন ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করতে পারবে না। অধিকন্তু তা কোন কালে পরিবর্তিত অথবা পরিবর্ধিত হবে না, তা যেরূপভাবে অবতীর্ণ হয়েছে চিরকাল ঠিক সেভাবে বিদ্যমান থাকবে। বলা বাহুল্য পবিত্র কুর'আন ব্যতিত জগতের আর কোন ধর্মগ্রন্থেরই এরূপ অলৌকিক বিশেষত্ব নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

"নিশ্চয় যারা উপদেশ [কুর'আন] আসার পরও তা অস্বীকার করে [তাদেরকে অবশ্যই এর পরিণাম ভোগ করতে হবে]। আর এটি নিশ্চয় এক সম্মানিত গ্রন্থ। বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।"[৮৩]

সন্দেহকারীদের প্রতি এরূপ গ্রন্থ বা সূরা রচনা করার আহ্বান

পবিত্র কুর'আন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বর্গীয় গ্রন্থ এবং তা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর উপর নাযিলকৃত। এটা নবুওয়াতের এক অলৌকিক নিদর্শন ও উজ্জলতম প্রমাণ। অবিশ্বাসী কাফির, বিভ্রান্ত ও বিপথগামী ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায় অনেক সময় আস্ফালন করে বলত তারাও কুর'আনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করবে। তাদের ঐরূপ আস্ফালনের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের ব্যর্থ দাবীর উত্তরে তাদেরকে এবং তাদের সাহায্যকারী দেব-দেবী ও পরামর্শদাতা ইয়াহুদী খৃষ্টানদিগকে কুর'আনের সদৃশ ধর্মগ্রন্থ কিংবা ১০টি সূরা কিংবা অন্ততপক্ষে একটি সূরা রচনা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু মুর্খ অবিশ্বাসীরা তো দূরের কথা তাদের দেশের বিখ্যাত বিদ্বান, কবি, সাহিত্যিক, পন্ডিতগণও উক্ত স্বর্গীয় ভাষার অনুসরণ ও অনুকরণ করে গ্রন্থ তো দুরের কথা একটি আয়াতও রচনা করতে সমর্থ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: "শুধু তারা কেন সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতি একত্রে সম্মিলিত হয়েও যদি কুর'আনের সদৃশ রচনা করতে চেষ্ঠিত হয় এবং তারা যদি পরস্পরে পরস্পরের সহযোগিতা করতে থাকে তা হলে কিয়ামত অবধি তারা একটি আয়াতও রচনা করতে সমর্থ্য হবে না। কাজেই তা আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য কারো বাণী হতে পারে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ নিম্নের আয়াত সমূহে বলেন:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

"বল, 'যদি মানুষ ও জ্বিন এ কুর'আনের অনুরূপ হাযির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।"[৮৪]

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

"নাকি তারা বলে, 'সে এটা মনগড়াভাবে করেছে'? বল, 'তাহলে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। অতঃপর

৮৩. *আল কুর'আন*, ৪১:৪১-৪২

৮৪. *আল কুর'আন*, ১৭:৮৮

তারা যদি তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, এটা আল্লাহর জ্ঞান অনুসারেই নাযিল করা হয়েছে এবং তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই। তাহলে তোমরা কি অনুগত হবে? "[৮৫]

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.

"আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও। অতএব, যদি তোমরা তা না কর– আর কখনো তোমরা তা করতে পারবে না– তাহলে ঐ আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।"[৮৬]

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

"নাকি তারা বলে, 'সে তা বানিয়েছে'? বল, 'তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।"[৮৭]

আল কুর'আন মানব রচিত নয়

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন আল্লাহর বাণী। তা সে সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত প্রত্যাদেশ যিনি আমাদের এ পৃথিবীসহ সমস্ত জাহানের সৃষ্টিকারী। মানবের কল্যাণের জন্য এর আয়াতসমূহ অকাট্য প্রমাণাদিসহ মজবুত করা হয়েছে এবং এর আয়াতসমূহ পূর্বাপর সংগতি রেখে সরল-সহজ, সুস্পষ্ট, সহজবোধগম্য ও সুবিন্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। কোন মানবের পক্ষে এরূপ রচনা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

"সে যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, আমি তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম এবং তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম।"[৮৮]

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

"আলিফ-লাম–রা। এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ সুস্থিত করা হয়েছে, অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্ত্বার পক্ষ থেকে। (এ মর্মে) যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।"[৮৯]

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

"এবং তিনি নিজ ইচ্ছামতে কোন কথা বলেন না, ওহী, যা তার কাছে প্রত্যাদেশ হয় তা ব্যতিত।"[৯০]

হযরত মুহাম্মাদ (স.) কর্তৃক রচিত হয়নি

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত 'ঈসা (আ.), হযরত মূসা (আ.) প্রমুখ অনেক নবীই যথারীতি লেখাপড়া শিক্ষা করে প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করার পর নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়ে ধর্ম প্রচার শুরু

---

৮৫. *আল কুর'আন*, ১১:১৩-১৪

৮৬. *আল কুর'আন*, ০২:২৩-২৪

৮৭. *আল কুর'আন*, ১০:৩৮

৮৮. *আল কুর'আন*, ৬৯:৪৪-৪৬

৮৯. *আল কুর'আন*, ১১:০১-০২

৯০. *আল কুর'আন*, ৫৩:০৩-০৪

করেছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স.) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে বা পরে কখনও কোন মক্তব, মাদরাসা, স্কুল ইত্যাদিতে লেখা পড়া শিক্ষার কোন প্রয়োজনই অনুভব করেননি। অথচ তার প্রচারিত মহাগ্রন্থ আল কুর'আন এরূপ অনুপম গ্রন্থ যে, তাতে বহু প্রাচীন জাতির প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক বিবরণ এবং সমস্ত সত্য ধর্মের সার শিক্ষা ও সদুপদেশ সংগৃহীত হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (স.) কোন গ্রন্থ পাঠ করতে কিংবা স্বহস্তে কোন গ্রন্থ লিখতে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। দুনিয়ার কোন মানুষ তাঁর শিক্ষক হবার যোগ্য ছিল না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষক। কেবল মাত্র আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে এরূপ অনুপম ধর্মনীতি ও সদুপদেশপূর্ণ বিরাট মহাগ্রন্থ আবৃত্তি করতে তিনি সমর্থ্য হয়েছেন। আর কুর'আন বার বার আবৃত্তি করে আত্মস্থ করার পদ্ধতিও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন। সভ্যজগতের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক শূন্য আরব জাতির একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে নিজ হতে এরূপ পূর্ণাঙ্গ মহান ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব কাজ এবং এটা যে, তাঁর প্রতি ঐশী করুণা কুর'আনের অলৌকিকতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

"আর তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব তিলাওয়াত করনি এবং তোমার নিজের হাতে তা লিখনি যে, বাতিলপন্থীরা এতে সন্দেহ পোষণ করবে। বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর যালিমরা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না।"[৯১]

আল কুর'আন পরিবর্তনের ক্ষমতা রাসূলেরও নেই

মহাগ্রন্থ কুর'আন পরিবর্তনের ক্ষমতা কারও ক্ষমতার আওতাধীন না হওয়াও কুর'আনের স্বর্গীয় সত্যতার অন্যতম নিদর্শন। আল কুর'আনে অংশীবাদীতা ও পৌত্তলিকতার অসত্যতা ও অসারতা জ্বলন্ত ভাষায় বিঘোষিত হওয়ায় একজন অংশীবাদী পৌত্তলিক অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর নিকট নিবেদন করেছিল যে, যদি এ কুর'আন পরিবর্তন করে তা হতে অংশীবাদীতা ও পৌত্তলিকতার নিন্দামূলক অংশসমূহ বর্জন করে তাদের প্রচলিত ধর্ম ও আচার ব্যবহার সমর্থন পূর্বক অন্য একখানি গ্রন্থ তথা নতুন কুর'আন রচনা করেন তবে আমরা আপনাকে ধর্ম প্রবর্তকরূপে স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করবো। তাদের ঐ অজ্ঞতামূলক ভ্রান্ত ধারণার মূলচ্ছেদ করার জন্য আল্লাহর নিকট হতে আদিষ্ট হয়ে ঘোষণা করলেন যে, কুর'আন আমার নিজ হাতে রচনা কিংবা তার কোন অংশ পরিবর্তন করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করে থাকি। এ স্বর্গীয় গ্রন্থের আদেশ নিষেধ অথবা নীতি পরিবর্তন করতে আমার কোন অধিকার নেই। যদি আমি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও প্রত্যাদেশ প্রতিকুলে স্বীয় প্রভুর অবাধ্যাচরণ করে এর কোন অংশ অথবা কোন আদেশ নিষেধের পরিবর্তন করি, তবে আমার জন্যও মহাদিবসের ভয়াবহ শাস্তির আশংকা রয়েছে, তবে এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয়ে তিনি তা পরিবর্তন করতে অক্ষম বরং পবিত্র কুর'আনের সত্যতা ও অপরিবর্তণীয় সুদৃঢ় সাক্ষী স্বরূপই উক্ত বাক্যের অবতারণা করা হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুর'আন পরিবর্তন যে কোন মানুষের এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিজেরও ক্ষমতার বাইরে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, তা রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক রচিত নয়। বরং তা মহান আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদিষ্ট অপরিবর্তনীয় স্বর্গীয় গ্রন্থ। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

---

৯১. *আল কুর'আন*, ২৯:৪৮-৪৯

"আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন, যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, তারা বলে, 'এটি ছাড়া অন্য কুর'আন নিয়ে এসো। অথবা একে বদলাও'। বল, 'আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তনের অধিকার আমার নেই। আমিতো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিনের আযাবের'। বল, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, আমি তোমাদের উপর তা পাঠ করতাম না। আর তিনি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন না। কেননা ইতঃপূর্বে আমি তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছি। তবে কি তোমরা বুঝ না'?"[৯২]

তৃতীয় অধ্যায়

আল কুর'আন আগমন পূর্ব বিশ্ব

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাতের পূর্বে এর আগমন পূর্ব বিশ্বের পরিবেশ পরিস্থিতি কিরূপ ছিল তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করছি। কারণ একটি বিষয়কে ভাল বা উত্তম বলা যায় তখন যখন এর বিপরীতে মন্দ বর্তমান থাকে। যেমন আমরা "আলোকে" সহজে "আলো" বলে নিশ্চিত হতে পারি এজন্য যে, এর বিপরীতে "অন্ধকার" রয়েছে। অনরূপভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা কত জোড়ালো ও কতটা প্রশংসনীয় তা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা যাবে তখন যখন কুর'আন আগমন পূর্ব জাহিলী যুগের ভয়ংকর ও ঘৃণীত কিছু নমুনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হবে, অবশেষে আল কুর'আন কিভাবে সব অন্যায় অবিচার, যুল্‌ম নির্যাতন, দাঙ্গা হাঙ্গামাসহ যাবতীয় অসৎ কর্ম বন্ধ করার পাশাপাশি কিভাবে গোটা পৃথিবীতে শান্তি আনয়ণ করেছিল এ বিষয়টি যদি সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা যায় তাহলে বিশ্ববাসী অবাক হবে কুর'আনের

৯২. *আল কুর'আন*, ১০:১৫-১৬

বিস্ময়কারীতা নিয়ে এবং তারা কুর'আনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে বিশ্ব শান্তির জন্য।

কুর'আনের পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব

আল কুর'আন নাযিলের পূর্বে যে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল তা হচ্ছে ইঞ্জিল। হযরত 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা এ কিতাব নাযিল করেন। এর অনুসারীগণ ছিল হাওয়ারী নামে পরিচিত। পবিত্র কুর'আনের সূরা আস্‌সফে বর্ণিত হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّه

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমনিভাবে 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ.) হাওয়ারীগণকে (তাঁর সাথীদেরকে) বলেছিলেন: আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে সাহায্য করার কে আছ?"[৯৩]

ইঞ্জিল কিতাবের উপর আমলের সময়কাল

একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, হযরত 'ঈসা (আ.) এর উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল কিতাবের উপর আমল করা হয়েছে অল্প কিছু দিন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে উঠিয়ে নিলেন এরপর তাঁর উম্মতগণ তা বিকৃত করে দেয়। এ কিতাবেই আমাদের প্রিয় নবী (স.) এর আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী ছিল। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন হযরত 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ.) বলেছিলেন 'হে বানী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত বার্তা বাহক এবং আমার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাত কিতাবের সত্যায়ণকারী ও এমন একজন রাসূলের আগমনের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আগমন করবেন তাঁর নাম হবে আহমাদ (মুহাম্মাদ)।"[৯৪]

আল কুর'আন নাযিলের পূর্বে আরবের অবস্থা

একথা মানবমন্ডলীর কাছে সুস্পষ্ট যে, মহাগ্রন্থ আল কুর'আন নাযিল হয়েছিল পবিত্র মক্কা এবং মদীনায়। তা সর্ব প্রথম যাবতীয় পরিবর্তন এনেছিল এ জনপদেই। সুতরাং মহাগ্রন্থ আল কুর'আন নাযিলের পুর্বে সেখানকার সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা নিচে তুলে ধরা হলো:

শোচনীয় সামাজিক অবস্থা

অভিজাত শ্রেণী

আরবের জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। প্রতিটি শ্রেণীর অবস্থা ছিল অন্য শ্রেণীর চেয়ে আলাদা। অভিজাত শ্রেণীতে নারী-পুরুষের মর্যাদা ছিল উন্নত। এ শ্রেণীর মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল অনেক। তাদের কথার মূল্য দেয়া হত। তাদের এত সম্মান ও নিরাপত্তা বিধান করা হত যে, তাদের রক্ষার জন্য তরবারী কোষমুক্ত করা হত এবং রক্তপাত ঘটতো, মহিলারা ইচ্ছা করলে কয়েকটি

৯৩. *আল কুর'আন*, ৬১:১৪

৯৪. *আল কুর'আন*, ৬১:০৬

গোত্রকে সন্ধি সমঝোতার জন্য একত্রিত করতো। আবার তাদের মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্তপাতের আগুনও জ্বালিয়ে দিত। এ শ্রেণীর মধ্যে নারী পুরুষের সম্পর্ক বিয়ের মাধ্যমে হত। মহিলাদের অভিভাবকদের মাধ্যমে এ বিবাহ সম্পন্ন হত। অভিভাবক ছাড়া নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করার কোন অধিকার নারীদের ছিল না।

অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থা

অভিজাত শ্রেণীর অবস্থা এরকম হলেও অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। সেসব শ্রেণীর মধ্যে নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক ছিল সেটাকে পাপাচার, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা এবং ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। উম্মুল মু'মিনিন হযরত 'আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতে (কুর'আন নাযিল পূর্ব আরবে) বিয়ে ছিল চার প্রকার:

প্রথম প্রকারের বিবাহ:
প্রথম প্রকারের বিবাহ ছিল বর্তমান কালের অনুরূপ। যেমন একজন অন্যজনের অভিভাবকত্বের অধীন মেয়ের বিয়ের জন্য পয়গাম পাঠাতো। এ পয়গাম গৃহীত হলে মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হত।

দ্বিতীয় প্রকারের বিবাহ:
দ্বিতীয় প্রকারের বিবাহ ছিল বিবাহিত মহিলা ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার স্বামী তাকে বলত, "অমুক লোকের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে তার লজ্জাস্থান অধিকার করো" (অর্থাৎ তার সাথে ব্যভিচার করো) এ সময় স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকত। যে লোকটাকে দিয়ে ব্যভিচার করানো হচ্ছিল, তার দ্বারা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীর কাছে যেত না, গর্ভ লক্ষণ নিশ্চিত হওয়ার পর স্বামী চাইলে স্ত্রীর কাছে যেত। এরূপ করার কারণ ছিল সন্তান যেন জ্ঞানী-গুণী, শক্তিধর, অভিজাত এবং কৃতিত্ব সম্পন্ন হতে পারে। একে "এসতেবজা" বিবাহ বলা হত। ভারতে এ প্রকারের বিবাহকে "নিয়োগ" বলা হয়। যা এখনো প্রচলিত রয়েছে।

তৃতীয় প্রকারের বিবাহ :
তথাকথিত বিবাহ নামক নারী পুরুষের মিলনের তৃতীয় প্রথাটি ছিল একটি জঘণ্য অশ্লীলতা। এতে দশ থেকে কম সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হত। সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সাথে সংগমক্রিয়ায় লিপ্ত হত। এর ফলে উক্ত মহিলা গর্ভধারণের পর যথাসময়ে সন্তান প্রসব করত। সন্তান প্রসবের কয়েকদিন পর উক্ত মহিলা তার সাথে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া সকল পুরুষকে একত্রিত করত। সমাজের রীতি অনুযায়ী সবারই আসতে হত। কারোরই অনুপস্থিত থাকার উপায় ছিল না। সকলে উপস্থিত হলে মহিলা সকল পুরুষকে লক্ষ্য করে বলত "তোমরা যা আমার সাথে করেছো তা তো তোমাদের জানা। এখন আমার গর্ভ এক সন্তান প্রসব করেছে। হে অমুক! এ সন্তান তোমার বীর্য থেকে।" মহিলা ইচ্ছামত যে কারো নাম বলতে পারত এবং যার নাম বলত সে নবজাতকের বাবা হিসেবে বিবেচিত হত। সংশ্লিষ্ট সকলে এর স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকত।

চতুর্থ প্রকারের বিবাহ :
চতুর্থ প্রকারের বিবাহ ছিল, বহু পুরুষ একত্রিত হয়ে একজন মহিলার কাছে যেত। সে মহিলা কোন আগন্তুককেই বিমুখ করতো না। এরা ছিল পতিতা। তারা এর নিদর্শন স্বরূপ তাদের বাড়ীর সামনে পতাকা টানিয়ে রাখতো। ফলে ইচ্ছেমত যে কোন পুরুষ বিনা বাধায় তাদের কাছে গমন করতে পারতো। এ ধরনের মহিলা গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করলে যারা তার সাথে মিলিত হয়েছিল তারা

সবাই তার ডাকে হাজির হত। এরপর একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হত যিনি বাচ্চার চেহারার সাথে মিল থাকার পুরুষকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা রাখত। সে তার অভিমত অনুযায়ী সন্তানটিকে কারো সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিত। ফলে এ শিশু সে লোকটির সাথে যুক্ত হয়ে যেত এবং তখন থেকেই এ শিশুটিকে তার সন্তান বলা হত। সে লোকটি সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করতে পারতো না।[৯৫] রাসূলুল্লাহ (স.)-র আবির্ভাব এবং আল কুর'আন নাযিলের পর আল্লাহ তা'আলা জাহিলী সমাজের সকল প্রকার বিবাহ প্রথা বাতিল করে পবিত্র বিবাহ প্রথার প্রচলন করেছেন যা আজো চলমান।

যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসেবে নারী

আরবের নারীদের আরেকটি শ্রেণী যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসেবে বিজয়ী বাহিনীর কাছে সমর্পিত হত। গোত্রীয় যুদ্ধে বিজয়ীরা পরাজিত গোত্রের মহিলাদের নিজেদের হেরেমে রেখে দাসী হিসেবে ব্যবহার করত। এদের গর্ভে যে সন্তান আসত প্রসবের পর থেকে আমৃত্যু তারা কলংক বয়ে বেড়াত। সমাজের লোকেরা তাদেরকে ঘৃণার চোখেই দেখতো।

একাধিক স্ত্রী রাখা

জাহিলী যুগে একাধিক স্ত্রী রাখা কোন দোষণীয় ব্যাপার ছিল না। অনেকে সহোদর দুই বোনকেও একত্রে বিবাহ করতো এবং স্ত্রী হিসেবে রাখত। পিতার তালাক দেয়া স্ত্রী অথবা তার মৃত্যুর পর সন্তান তার সৎমায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত। তালাকের অধিকার ছিল শুধুমাত্র পুরুষের। তালাকের কোন সীমা সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না।[৯৬]

যুদ্ধ বিগ্রহ

প্রত্যেক গোত্রই অন্য গোত্রের প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ করত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করত। ছোট খাট বিষয়কে উপলক্ষ্য করে যুদ্ধের সুত্রপাত হত। মারামারি কাটাকাটি, রক্তপাত ছিল তাদের জীবনের সাধারণ ব্যাপার। ছোটকাল থেকেই নিহত আত্মীয়-স্বজনের প্রতিশোধ গ্রহণস্পৃহা তারা অন্তরে পোষণ করত। যৌবনে পদার্পণ করা মাত্রই হন্তার প্রতি প্রত্যাঘাত করার উদ্দেশ্যে ঢাল, তরবারি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এভাবে সংঘঠিত কোন যুদ্ধ শতাব্দিকাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দির প্রারম্ভ থেকে ইসলামের আবির্ভাব তথা কুর'আন নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত এ ধরনের শতশত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ এ ধরনের যুদ্ধকে "আইয়ামুল আরব' নামে অভিহিত করে থাকেন। এর মধ্যে 'আবস ও যুবইয়ান' এবং 'হরবুল বসূস' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আবস ও যুবইয়ান গোত্রদ্বয়ের মাঝে ঘোড় দৌঁড় প্রতিযোগিতা হত। এখানে এক পক্ষ প্রতিযোগিতার নিয়ম লঙ্ঘন করলে অপরপক্ষ তাদেরকে আক্রমণ করত। এভাবেই এ যুদ্ধের সুত্রপাত হয় এবং চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকে।[৯৭] দ্বিতীয় যুদ্ধটির উৎপত্তির কারণ হল: একজন বিদেশী পথিক ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক বুসূস বৃদ্ধার অতিথি হয়। অতিথি নিজের উটটি চারণ ভূমিতে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধার গৃহে খেতে বসে। এমন সময় উটটি কুলায়ব নামক এক ব্যক্তির বাগানে

---

৯৫. আলণ্ঢামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আররাহীকুল মাখতুম* (অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেজায়ী, আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, আগষ্ট ২০১২), পৃ. ৬০-৬১ ; *সহীহ বুখারী*, বাবু মান ক্বালা লা নিকাহা ইলণ্ঢা বি অলি (আল মাকতাবাতুস্ শামেলাহ, ২য় সংস্করণ, তা. বি.), হাদিস নং. ৪৭৩২

৯৬. *আবু দাউদ*, বাবু আত্তালাকু মাররাতাঈন (আল মাকতাবাতুস শামেলাহ, ২য় সংস্করণ, তা. বি.), খ. ৬, পৃ. ৮৯, হাদিস নং. ১৮৬২,

৯৭. মাওলানা ফজলুর রহমান ও আবুল কালাম আযাদ, *বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনী* (ঢাকা: মীনা বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০০৫), পৃ: ১৬

প্রবেশ করে গাছের সাথে ঘর্ষণ করে গা চুলকাতে থাকে। ঘর্ষণের ফলে উক্ত বৃক্ষের পাখির চিৎকার শুনে কুলায়ব রাগান্বিত হয়ে উটটিকে শর নিক্ষেপ করে আহত করে দিয়ে বলতে থাকে, কার এত স্পর্ধা যে, তার আশ্রিত পাখিকে কষ্ট দিতে পারে? এ ঘটনা দেখে বসূস বৃদ্ধা কাঁতর কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার অতিথির উটকে আহত করে আমাকে অপমানিত করা হয়েছে। আমি বৃদ্ধা অবলা নারী। আপন বলতে আমার কেউ নাই। এ অসহনীয় অপমানের প্রতিশোধ কে গ্রহণ করবে।' বৃদ্ধার করুণ আর্তনাদে ব্যথিত হয়ে তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কুলায়বকে হত্যা করে। এভাবে বনূ তাগলীব ও বনূ বকরের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ বেঁধে যায়। এ যুদ্ধ বংশানুক্রমে আশি বছর পর্যন্ত চলতে থাকে।[৯৮]

সামান্য একটি বিষয়ে একবার উকাযের মেলায় সুলায়ম বংশীয় সর্দারের সাথে গাতফান বংশীয় সর্দারদের তর্ক বিতর্ক হয়। এর কিছুদিন পরে সুযোগ পেয়ে মরু প্রান্তর রঞ্জিত হয় একটি চারণ ভূমিকে উপলক্ষ্য করে। এতে বনূ বকর ও বনূ তামীমের মধ্যে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। মদিনার আওস এবং খাযরাত গোত্রের মাঝে বহু যুদ্ধ সংগঠিত হয়। তার মধ্যে 'ইয়াওমে বুয়াস' নামক যুদ্ধে উভয় পক্ষের অধিকাংশ সর্দারগণ নিহত হয়। পরবর্তীতে উভয় গোত্রের লোকজন রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলে এ যুদ্ধের চিরতরে অবসান ঘটে। কুরাইশদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধগুলো 'আইয়ামুল ফিযার' নামে অভিহিত ছিল।[৯৯] এসবের মধ্যে 'যু-কার যুদ্ধ' ছিল খুবই মারাত্মক। আল্লাহ এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরতরে বন্ধ করে গোটা মানব মন্ডলীকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে আদেশ দিয়ে বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।"[১০০]

লুটতরাজ

সেকালে আরবের অধিকাংশ গোত্রই যুদ্ধ বিগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এ কাজ দোষণীয় বলে পরিগণিত হত না। প্রত্যেক গোত্রই অপর গোত্রের ধন সম্পদ, গৃহ পালিত পশু এমনকি স্ত্রী-কন্যাকেও লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। এদেরকে বাদী দাসী রূপে বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করত। জঙ্গলে, পর্বত গহবরে এসব দস্যুরা দলে দলে লুকিয়ে থাকত। সুযোগ পেলেই নিরীহ পথিক অথবা ব্যবসায়ী কাফেলাকে আক্রমণ করে সর্বস্বান্ত করত। সাধারণত ভোরের দিকেই এদের আক্রমণ বেশী হত এবং প্রতিদিনই পথিকদের আর্তনাদে আকাশ বাতাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠত। কোন ব্যবসায়ী দলকে নিরাপদে কোন পথ অতিক্রম করতে হলে সেখানকার তস্করদেরকে উপযুক্ত পরিমাণে কর দিতে হত। ডাকাতিতে সিদ্ধহস্ত হওয়া কৃতিত্ব ও বীরত্বের পরিচায়ক ছিল। খ্যাতনামা ডাকাতরা বিভিন্ন জনসভায় স্বীয় লুটপাটের

---

৯৮. প্রাগুক্ত

৯৯. প্রাগুক্ত

১০০. *আল কুর'আন*, ০৩:১০৩

কাহিনী বর্ণনা করে গৌরব অনুভব করত। নিরীহ পথিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করার বীরত্ব উল্লেখ করে তারা কবিতা আবৃত্তি করত।[১০১]

আরবের তাঈ বংশীয় লোকেরা এসব বিদ্যায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। হাতীম তাঈর পুত্র আদ্দি (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, '(ইসলামের কল্যাণে) এমন একদিন আসবে, যখন একজন পর্দানশীন রমণী নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত মনে হেরা হতে হাযরামাওত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে পারবে একাকী। কোন পুরুষ তাদের দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস পর্যন্ত করবে না।' এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে হযরত আদ্দি (রা.) অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ তিনি তাঈ বংশীয় সর্দার ছিলেন। তায়ীদের ডাকাতির কথা তার জানা ছিল। এতসব ডাকাতের আড্ডাখানার মধ্য দিয়ে একাকিনী একটি রমণী যুবতি নিরাপদে ভ্রমণ করবে কিভাবে? এসব ডাকাত কোথায় যাবে? কি হবে? এসব কথা চিন্তা করেই তিনি অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কয়েক বছর পরেই রাসূলে আকরাম (স.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন।[১০২]

চুরি

আর্থিক অনটনের দরুন চুরির প্রথাও কম ছিল না। ইতর সম্ভ্রান্ত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মধ্যেই চোরের আধিক্য ছিল। অতি সঙ্কটাপন্ন স্থান হতে চুরি করতে পারলে লোক সমাজে স্বীয় চৌর্য কৌশল বর্ণনা করে তারা আত্ম গৌরব করতো। তৎকালীন প্রসিদ্ধ চোর তাআব্বাতা শাররা স্বীয় চুরির কৃতিত্ব প্রকাশ করে আত্মম্ভরিতাপূর্ণ একটি কবিতা রচনা করেছিল। 'হামাছা' নামক সাহিত্য গ্রন্থে এ কবিতাটি উল্লেখ করা হয়েছে। মান্নতের বহু অর্থকড়ি, ধনরত্ন পবিত্র কা'বা গৃহের ধনাগারে রক্ষিত থাকতো। এ ধনাগার থেকে একটি স্বর্ণের হরিণ চুরি করা হয়। এ চুরির জন্য মক্কার প্রভাবশালী মুশরিক নেতা আবু লাহাবকে বিশেষভাবে দায়ী করা হয়। বনি আসলাম, বনি গিফার, মুযায়না এবং যুহাইনা এ চারটি গোত্র বিশেষভাবে হাজীদের আসবাবপত্র চুরি করত। চুরি করার ক্ষেত্রে আপন পরের কোন পার্থক্য করা হত না। দরিদ্র লোকে চুরি করলে তার কিছু শাসন হত। কিন্তু ধনী লোকদের কোন শাস্তির বিধান ছিল না।

একদা মাখযুম বংশীয় এক নারী চুরিতে ধরা পড়ে। এ নালিশ রাসূল (স.) এর দরবারে পেশ করা হল। এ সম্ভ্রান্ত নারীর শাস্তি বিধান হবে মনে করে কুরাইশরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে এবং সুপারিশের জন্য হযরত উসমানকে প্রেরণ করে। সুপারিশ শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহর নির্ধারিত বিধানেও সুপারিশ করবে?' তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সমবেত জনমন্ডলীকে লক্ষ্য করে বললেন: "প্রাচীন জাতি সমূহ শুধু এ জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, গরীব লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দেয়া হত, কিন্তু ধনী শ্রেণী চুরি করলে তাকে শাস্তি দেয়া হত না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যদি মুহাম্মাদ কন্য ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে ফেলতাম।"[১০৩] চৌর্যবিদ্যায় প্রায় লোকই পারদর্শী ছিল। এজন্যই ইসলাম গ্রহণ করতে এলে রাসূল (স.) নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে চুরি না করার অঙ্গীকার নিতেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতি নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যথাযথ স্থানে এ বিষয়ে কুর'আনের আয়াত উল্লেখসহ আলোচনা করা হবে।

ব্যভিচার

তৎকালিন আরবে ব্যভিচার অনাচার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, প্রকাশ্যে জেনা করা যদিও অবৈধ ছিল। কিন্তু গুপ্তভাবে যেনা করাকে তারা অন্যায় মনে করতো

---

১০১. *বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

না। তারা বলতো প্রকাশ্যভাবে যিনা করা ইতরামি। কিন্তু গুপ্তভাবে যিনা করতে কোন দোষ নেই। যদিও অপ্রকাশ্যে ব্যভিচার করা হত কিন্তু ধর্ষণের পর প্রকাশ্য সভায় স্বীয় ধর্ষণের কাহিনী বর্ণনা করাকে তারা গৌরব মনে করত।

ইমরুল কায়েস আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং রাজ্যের যুবরাজ ছিল। সে তার ফুফাতো বোন 'উনাইজার' সাথে এবং অন্যান্য আরো যুবতীদের সাথে যে সমস্ত অপকর্ম করত তা তার রচিত "কাসিদায়ে লামিয়ায়" বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। গভীর রাতে প্রহরীর চোখ এড়িয়ে কিভাবে যুবতীদের ঘরে প্রবেশ করত, কিভাবে রমণীদের ধর্ষণ করত, জলাশয়ে গোসল ও খেলাধুলায়রত যুবতীদের কাপড় নিয়ে কিভাবে গাছে উঠে বসত এবং উলঙ্গাবস্থায় যুবতীরা কিভাবে তার কাছ থেকে বস্ত্র সমূহ উদ্ধার করত, স্তন্যপায়ী শিশুকে পরিত্যাগ করে শিশুর মাতা এবং গর্ভবতী মহিলাকে পর্যন্ত ইঙ্গিত করা মাত্র কিভাবে তার মনোস্কামনা পূর্ণ করত ইত্যাদি যাবতীয় যৌন কাহিনী তার এ কবিতায় সে সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। আরবের খ্যাতনামা কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ কবিতাটি প্রথম স্থান লাভ করেছিল। সম্মানার্থে এ কবিতাটি পবিত্র কা'বার প্রাচীরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের মুখেই এ কবিতার উচ্চারণ শুনতে পাওয়া যেত।[১০৪]

নির্লজ্জতা

তদানীন্তন আরবে লজ্জা বলতে কিছুই ছিল না। সেকালে অসভ্য আরবগণও পবিত্র কা'বা ঘরের হজ্জ করাকে মহাপুণ্য বলে মনে করত। হজ্জের মৌসুমে লক্ষ লক্ষ লোক মক্কায় সমবেত হত। তারা হারামের বাইরের বাসিন্দাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, হারামের মধ্যে প্রবেশ করার পর 'হুমস' হতে সংগৃহীত বস্ত্র পরিধান করে তাদের প্রথম তাওয়াফ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে হোমসের বস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে পুরুষেরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়ই কা'বা ঘর তাওয়াফ করত। মহিলারা পরিধানের কাপড় চোপড় খুলে ফেলে দিয়ে একটি ছোট রকমের খোলা জামা পরিধান করতেন। ঐ অবস্থাতেই তাওয়াফ করতেন। তাওয়াফ কালে কবিতার এ চরণ আবৃত্তি করতেন:

اليوم يبدو بعفه او كله- ومابدأ منه فلا احيتها

"আজ লজ্জাস্থানের কিছুটা অথবা সবটুকু খুলে যাবে। যেটুকু দেখা যাবে ভেব না তা অবৈধ কাজ।"এসব নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"হে বণী আদম! প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিতকালে নিজেদের সুন্দর পোষাক পরিধান করে নাও।"[১০৫]

পোষাকে বিধি-নিষেধ

তাছাড়া যদি কোন মহিলা কিংবা পুরুষ নিজেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে হারামের বাইরে থেকে আনা পোষাকে তাওয়াফ করে নিত, তাহলে তাওয়াফ শেষ করার পরে উক্ত পোষাক তাকে ফেলে দিতে হত। এর ফলে তারা না নিজে উপকৃত হতেন না অন্য কেউ এর দ্বারা ফায়দা পেত।[১০৬]

মদ্যপান

আরবে মদের প্রচলন ছিল সবচাইতে বেশী। ঘরে ঘরে মদের কারখানা ছিল। প্রায় সকলের ঘরেই মদের আড্ডা বসত। মদ্যপান না করা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সরাবখানায় আড্ডা গেড়ে

---

১০৪. প্রাগুক্ত

১০৫. *আল কুর'আন*, ০৭:৩১

১০৬. *ইবনে হিশাম*, ১ম খন্ড, পৃ. ২০২-২০৩ ; *আর রাহীকুল মাখতূম*, শায়খ শফিউর রহমান মুবারকপুরী, পৃ. ৪৪

বসত। গায়িকাগণ নৃত্যাভিনয় ও গানবাদ্য করতে থাকত আর অন্যরা মদপান করত আর তা উপভোগ করত। মদ্যপানের প্রতি সারাদেশ অতিশয় আকৃষ্ট ছিল। এজন্যই মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে অকস্মাৎ কঠোর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ না হয়ে ক্রমান্বয়ে তিনবারে মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়। প্রথমবারে এর উপকারিতা ও অপকারিতার তারতম্য বর্ণিত হয়। দ্বিতীয়বার মদ-মত্ত অবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয় এবং তৃতীয়বারে একে চুড়ান্তভাবে কঠোর হারাম বলে ঘোষণা করা হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَالْأَنْصَابُ

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মুর্তি ও পাশাখেলা শয়তানের কাজ। সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাক। তবেই তোমরা সফল হবে।[১০৭]

অভিশপ্ত সুদ প্রথা

ততকালীন আরবে অভিশপ্ত সুদ প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল। সব অর্থশালী আরবই সুদী কারবার করত। রাসূল (স.)-এর চাচা আব্বাস ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও সুদের ব্যবসা করতেন। বিদায় হজ্জের দিন যখন রাসূল (স.) সুদকে হারাম ঘোষণা করলেন তখন তিনি সর্ব প্রথম আব্বাস (রা.) এর সব সুদের অর্থ মওকুফ ঘোষণা করেন। হযরত উসমান (রা.) এবং খালিদ ইব্ন অলিদ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সুদ খেতেন। তায়িফের প্রসিদ্ধ সর্দার মাসউদ উকফি এবং তার ভাই আবদে ইয়ালিও সুদের ব্যবসা করতেন। তায়েফ বিজয়ের পর যখন তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মুগিরা বংশীয় লোকদেরকে সুদের টাকার জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন। সাথে সাথে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তবে সুদের অবশিষ্টাংশ বর্জন কর।"[১০৮]

সুদ গ্রহণের সাধারণ নিয়ম ছিল নির্দিষ্ট হারে সুদের পরিমাণ উল্লেখ করে সময় বেঁধে দেয়া হত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে না পারলে সুদের পরিমাণ পুনরায় বাড়িয়ে সময় ও বাড়িয়ে দেয়া হত। ধীরে ধীরে সুদের অবস্থা এমন হত যে, মূলধনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অর্থ দিতে হত। এভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মহাজনেরা একেকজন আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হতেন আর সুদ গ্রহীতাগণ স্বর্বস্ব হারিয়ে ভিখারীতে পরিণত হতেন। সুদের প্রচলন শুরু করেছিল মূলত ইয়াহুদীরা।

সুদ প্রথা ছিল অর্থনৈতিক শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, "সুদের চক্রবৃদ্ধির অজুহাতে সুদ গ্রহীতার সমস্ত সম্পত্তি এমনকি তাদের স্ত্রী-সন্তানাদি পর্যন্ত সুদ দাতা দখল করত।" আল্লাহ তা নিষেধ করে পবিত্র কুর'আনে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বি-গুণ, চতুর্গুণ হারে সুদ খেও না। আর আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা কৃতকার্য হবে।"[১০৯]

দাস-দাসীদের জীবনাচার

---

১০৭. *আল কুর'আন*, ০৫:৯০

১০৮. *আল কুর'আন*, ০২:২৭৮

১০৯. *আল কুর'আন*, ০৩:১৩০

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে দাস দাসীদেরকে খুবই দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে হত। তৎকালীন সমাজে এমন মনিবের সংখ্যা খুব কমই ছিল যিনি দাসীদের নিয়ে অনাচার, অত্যাচার যথেচ্ছাচার, যৌনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হতেন না। এসব অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ কিংবা সংকোচবোধ তারা করত না। পবিত্র কুর'আনের সূরা আন নূরের ৩৩ নং আয়াত নাযিলের পিছনে এমনই একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আর তোমাদের দাসীরা যখন নিজেরাই সতী-সাধ্বী থাকতে চায়, তখন দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করো না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে এ জোর জবর দস্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

উক্ত আয়াতের তাফসীরে 'তাফহীমুল কুর'আনে' উল্লেখ করা হয়েছে, "এর অর্থ এ নয় যে, বাদীরা নিজেরা যদি সতী-সাধ্বী না থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। বরং এর অর্থ হচ্ছে বাদী যদি স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে নিজের অপরাধের জন্য সে নিজেই দায়ী। তার অপরাধের জন্য আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোর করে তাকে এ কাজে বাধ্য করে তাহলে এজন্য মালিকই দায়ী থাকবে এবং সে পাকড়াও হবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, জোর করার প্রশ্ন তখনই দেখা দেয় যখন কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আর "দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে" বাক্যাংশটি দ্বারা একথা বোঝানো হয়নি যে, যদি মালিক তার উপার্জন না গ্রহণ করে তাহলে বাদীকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করার কারণে সে অপরাধী হবে না। বরং বুঝানো হয়েছে যে, এ অবৈধ বল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত উপার্জনও মারাত্মক হারাম। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞাটির পূর্ণ উদ্দেশ্য নিছক এর শব্দাবলী ও পূর্বাপর আলোচনা থেকে বুঝা যায় না। একে ভালভাবে বুঝতে হলে যে পরিস্থিতিতে এ হুকুমটি নাযিল হয়েছিল সেগুলোও সামনে রাখা জরুরী। সেকালে আরব দেশে দু'ধরনের পতিতাবৃত্তির প্রচলন ছিল। এক. ঘরোয়া পরিবেশে গোপন বেশ্যাবৃত্তি এবং দুই. যথারীতি বেশ্যাপাড়ায় বসে বেশ্যাবৃত্তি।

এক. ঘরোয়া বেশ্যাবৃত্তি

ঘরোয়া বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত থাকতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাদীরা যাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না। অথবা এমন ধরনের স্বাধীন মেয়েরা যাদের কোন পরিবার কিংবা গোত্র পৃষ্ঠপোষকতা করত না। তারা কোন গৃহে অবস্থান করত এবং একই সঙ্গে কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে তাদের এ মর্মে চুক্তি থাকতো যে, তারা তাকে যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকবে আর সে তাদের জৈবিক প্রয়োজন পুরণ করতে থাকবে। এতে সন্তান জন্ম নিলে মেয়েরা যেই পুরুষটির ব্যাপারে বলে দিত যে, এ সন্তান অমুকের। সে-ই সন্তানের পিতা হিসেবে স্বীকৃত হত। এটি যেন ছিল জাহেলী সমাজের বৈধ স্বীকৃত প্রথা। জাহিলিয়াতের যুগে একে এক প্রকারের বিবাহই মনে করা হত।[১১০]

দুই. বেশ্যা পাড়ায় বেশ্যাবৃত্তি

প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হত বাদীদেরকেই। এরও দু'টি পদ্ধতি ছিল। প্রথমত লোকেরা নিজেরা নিজেদের যুবতী বাদীদের ওপর একটি নির্দিষ্ট অংক চাপিয়ে দিত। অর্থাৎ প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাদের দিতে হবে। ফলে তারা দেহ ব্যবসা করে তাদের এ অনৈতিক দাবি পূর্ণ করত। এছাড়া অন্যকোন পথে তারা এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেও পারত না। আর তারা

১১০. সাইয়্যেদ আবুল 'আলা মাওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, ৯ম খন্ড (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, এপ্রিল-২০০৫), পৃ. ১৭৭

কোন পবিত্র উপায়ে এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে এনেছে বলে তাদের মালিকরাও মনে করত না। যুবতী বাদীদের উপর সাধারণ দিনমজুরদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী রোজগার করার কঠিন বোঝা চাপিয়ে দেবার এছাড়া আর কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল, লোকেরা নিজেদের সুন্দরী যুবতী বাদীদেরকে আলাদা গৃহে রাখত এবং তাদের দরজায় পতাকা টানিয়ে দিত। এ পতাকা দেখে দূর থেকে যৌন পিপাসুরা বুঝতে পারত কোথায় পিপাসা মিটাতে পারবে। এ মেয়েদেরকে বলা হত "কালীকীয়াত" এবং এদের গৃহগুলো "মাওয়াখীর" নামে পরিচিত ছিল। তৎকালীন বড় বড় সমাজপতিরা এ ধরনের বেশ্যালয়গুলো পরিচালনা করত। স্বয়ং মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন 'উবাই (যাকে নবী কারিম (স.) এর আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল) এ ধরনের একটি বেশ্যালয়ের মালিক ছিল। সেখানে ছিল ছয়জন সুন্দরী বাদী। তাদের মাধ্যমে সে কেবলমাত্র অর্থই উপার্জন করত না বরং আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নামী-দামী মেহমানদের আদর আপ্যায়ন, মনোরঞ্জন তাদের দ্বারাই করাত। তাদের অবৈধ সন্তানদের দিয়ে সে নিজের পাইক পেয়াদার সংখ্যা বৃদ্ধি করত। এ বাদীদেরই একজনের নাম ছিল মু'য়াজাহ। সে মুসলিম হয়েছিল। সে এ পেশা থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে চাচ্ছিল। ইব্ন 'উবাই তাকে দিয়ে জোর জবরদস্তিমূলক বেশ্যার কাজ করাতে চাইল। তাই সে এ বিষয়ে আবূ বকর (রা.) এর কাছে গিয়ে নালিশ করলেন। আবূ বকর (রা.) রাসূল (স.) কে বিষয়টি অবহিত করলেন, রাসূল (স.) বাদীটিকে যালিমের কবল থেকে বের করে আনার হুক্ম দিলেন। এ সময়েই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপরোল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়। [১১১]

কুসংস্কার

সেকালে কেউ মারা গেলে তারা তার কবরের সাথে জীবিত উট বেঁধে দানাপানি না দিয়ে সেটাকে মর্মান্তিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিত। আর বলত যে, এ উটের পিঠে চড়ে মৃত ব্যক্তি স্বর্গে চলে গেছে।[১১২]

নিষ্ঠুরতা

সেকালে নারীর সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে নারীদেরকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে দিয়ে দ্রুত গতিতে ঘোড়া হাকানো হত। সে নারী যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করত তখন তারা অতিশয় আনন্দে হৈ-হুল্লোড় করত।[১১৩] সর্বদা মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকার দরুন তাদের অন্তরে মায়া মমতা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তারা ছিল মানবাকৃতির দানব। তারা উটের পিঠের ঝুঁটি বা গোস্ত পিন্ড এবং দুম্বার লেজের উভয় পার্শ্বস্থ গোলাকার চর্বি যুক্ত মাংস কেটে নিয়ে কাবাব তৈরী করে খেত। আর এদিকে বাক শক্তিহীন নিরীহ প্রাণীটি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যন্ত্রণায় ছটপট করতে থাকত। কোন কোন জীবিত প্রাণীকে গাছের গোড়ার সাথে বেঁধে রেখে তীরের লক্ষ্য বস্তু বা নিশানা বানিয়ে অনুশীলন করা হত। যুদ্ধে বন্দিনী গর্ভবতী মহিলার পেট ফেঁড়ে সন্তান বের করে তাকে হত্যা করা হত। যুদ্ধে নিহত শত্রুর নাক, কান এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তা দিয়ে হার বানিয়ে মেয়েরা গলায় পড়ত এবং বুক ফেঁড়ে কলিজা বের করে দাঁত দিয়ে টুকরা টুকরা করে মনের ঝাল

---

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

১১২. মাওলানা আকবর আলী খান শাহ নজিরাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: ই,ফা,বা, দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০০৫), প্রথম খন্ড, পৃ. ৬৬

১১৩. প্রাগুক্ত

মিটাত। তারা এমন মান্নত করত যে, যদি শত্রুকে হত্যা করতে পারি তবে তার মাথার খুলিকে পেয়ালা বানিয়ে তা দিয়ে মদ পান করব। কোন শত্রুকে শাস্তি দিতে হলে কোন গাছের বিপরীত দিকের দু'টি ডালাকে কাছাকাছি টেনে এনে দু'টি শাখার সাথে তার দু'টি পা শক্ত করে বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দেয়া হত, সাথে সাথে লোকটি দুই টুকরা হয়ে গাছের সাথে ঝুলতে থাকত। তাদের কোন কোন শত্রুকে খাবার পানি না দিয়ে নির্জন কক্ষে বেঁধে রাখা হত। অবশেষে সে না খেয়ে খেয়ে ক্ষুৎ-পিপাসার জ্বালায় ছটপট করতে করতে মর্মান্তিক মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ত। কবরবাসীর নাজাতের জন্য কবরের সাথে জীবন্ত উট বেঁধে রাখা হত। তাকে কোন খাবার পানি না দিয়ে রাখতে রাখতে অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় ছটপট করতে করতে তাও কবরের উপরেই মরে পড়ে থাকত। আর তারা মনে করত যে এ উটটি মৃত ব্যক্তির বাহন হিসাবে পরকালে ব্যবহারিত হবে।[১১৪]

জুয়া খেলা

জুয়া খেলা ছিল তাদের অর্থ উপার্জনের প্রধান মাধ্যম। কেউ জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ না করলে তাকে কৃপণ ও ছোটলোক বলে ধিক্কার দেয়া হত।[১১৫] ঐতিহাসিক মুর বলেছেন : In that time the social life was very degreded and there was no social laws.[১১৬]

কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় অবস্থা

তৎকালিন আরবের ধর্মীয় অবস্থা ছিল সবচেয়ে শোচনীয়। পৌত্তলিকতা, অশ্লীলতা, শিরক, বিদয়াত ও বহুত্ববাদে গোটা সমাজ ছেয়ে গিয়েছিল। ধর্মের নামে অধর্ম চর্চাই ছিল তাদের দৃষ্টিতে সওয়াবের কাজ। নিজেদের হাতে তৈরি করা মূর্তি পূজার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ব্যর্থ চেষ্টা ছিল উল্লেখ করার মত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

"(কাফিরেরা বলে) সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।"[১১৭]

মূর্তিপূজা

তারা আল্লাহর একত্ববাদকে ভুলে গিয়ে বহুত্ববাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়েছিল। তাদের বদ্ধমূল ধারণা জন্ম লাভ করে যে, দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করার মাধ্যমে সফলতা লাভ করা যায়। ফলে তারা নিজ হাতে তৈরী মূর্তির সম্মুখে মাথানত করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। তাদের মূর্তিপূজার মানসিকতা এত চরম আকার ধারণ করেছিল যে, পবিত্র কা'বা গৃহের মধ্যেও তারা ৩৬০টি মূর্তি সংরক্ষিত রেখে তাওয়াফের নামে এগুলোর পূজা-অর্চনা করত। তৎকালীন মূর্তি পূজারীরা শুধু মূর্তিপূজাই করত না সাথে সাথে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বড় বড় পাথর, বৃক্ষ, উট, বালুর স্তুপ প্রভৃতিরও পূজা করত। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়:

---

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১১৫. প্রাগুক্ত

১১৬. *Life of the Mohamet sm.* ; উদ্ধৃত, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: ই.ফা.বা. দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০০৫), প্রথম খন্ড, পৃ. ৬৭

১১৭. *আল কুর'আন*, ৩৮:০৫

"পূর্বে তোমার বিশ্বে ছিল দৃশ্য অতি চমৎকার
কেউ পূজিত গরু, বানর, কেউ পূজিত গাছ পাথর।"

ভাগ্য গণনা

তাদের জঘন্যতম অপরাধ সমূহের মধ্যে ভাগ্য গণনাও ছিল অন্যতম। তারা গণকদের হাতে ভাগ্যগণনা করে বিভিন্ন আজগুবি খবর সারা আরবময় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের মন-মগজ ও চিন্তা- চেতনাকে কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন করে রাখত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন:
وان تقسموا بالأزلام "আর (লটারী কিংবা) জুয়ার তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করা (হারাম)।"[১১৮]

মূর্তির উদ্দেশ্যে বলিদান

মূর্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের মানত, কুরবানী ও উৎসর্গ করা হত। উৎসর্গকৃত জীব জানোয়ারগুলোকে মূর্তির বেদীমূলে তার নাম নিয়ে জবেহ বা বলি দেয়া হত। কোন কারণে অন্য কোথাও যবেহ করা হলে নির্ধারিত মূর্তির নাম নিয়েই যবেহ করা হত। তাদের এ উৎসর্গিত পশু যবেহ করা প্রসঙ্গে দু'টো রীতির কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: وما ذبح على النصب "সে সব পশুও হারাম যেগুলো মূর্তির বেদীমূলে যবেহ করা হয়েছে।"[১১৯] আল কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে:
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "আর সেসব পশুর গোস্ত খেয়ো না। যাকে আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ করা হয়েছে।"[১২০]

মূর্তির জন্য পশু ছেড়ে দেয়া

এ চতুস্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে "বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসিলা এবং হাম" উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক বলেন, বাহীরা, সায়েবারই মেয়ে শাবককে বলা হত। সে উটকে সায়েবা বলা হত যার গর্ভ থেকে ১০ বার মেয়ে শাবক ভূমিষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে কোন পুরুষ শাবক জন্ম নেয়নি। এমন প্রকৃতির উটনীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত। এর পিঠে কেউ আরোহন করত না এবং এর পশম কাটত না। মেহমান ব্যতীত অন্য কেউ এর দুধ পান করত না। এরপর সে উষ্ট্রী যখন মেয়ে শাবক প্রসব করত তখন এর কান চিরে দেয়া হত। তাকেও তার মায়ের সঙ্গে মুক্তভাবে চলাফেরা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হত। এর পিঠে কেউ সওয়ার হত না। তার পশম কাটা হতনা। মেহমান ব্যতিত অন্য কেউ এর দুধও পান করত না। একেই বলা হত "বাহীরা" এর মাকে বলা হত "সায়েবাহ"। "ওয়াসিলা" বলা হত এমন মাদিনী (ছাগল) কে যে একাধিক্রমে দু'টো দু'টো করে পাঁচ দফায় দশটি বকরা ছানা প্রসব করত। এর মধ্যে কোন মাদি ছানা প্রসব করতনা। এ মাদিনীকে এ কারণে ওয়াসিলা বলা হত যে, সে তার সবগুলো বকরি বাচ্চাকে অন্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। এরপর এ মাদিনী যে বাচ্চা প্রসব করত তাকে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেতে পারত। মহিলারা নয়। তবে যদি কোন মৃত বাচ্চা প্রসব করত তবে পুরুষ মহিলা সকলেই খেতে পারত।[১২১] এমন উটনীকে "হামী" বলা হত যে পর্যায়ক্রমে ১০টি কন্যা বাচ্চা প্রসব করেছে। এসবের মধ্যে কোন পুরুষ বাচ্চা প্রসব করেনি। এ জাতীয় উটনীর পিঠ সংরক্ষিত থাকত। এর পিঠে চড়া ছিল নিষিদ্ধ। এর পশম কাটা হত না। কেবল মাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যে একে

---

১১৮. *আল কুর'আন*, ০৫:০৩

১১৯. *আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

১২০. *আল কুর'আন*, ০৬:১২১

১২১. *আর রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

উটের পালের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হত। অন্য কোন কাজে এটাকে ব্যবহার করা হত না। জাহেলিয়া যুগের এসব মনগড়া রীতি-নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

"আল্লাহ না বাহিরার প্রচলন করেছেন না সায়েবার না ওয়াসীলা আর না হামীর। কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে। আর অধিকাংশ কাফিরই জ্ঞান রাখে না।"[১২২]

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ

"আর তারা বলত এ পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য বৈধ; আমাদের নারীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত হয় তাহলে সকলে সমানভাবে এতে শরীক হতে পারবে।[১২৩] পশুগুলোর যে বর্ণনা দেয়া হল, যেমন বাহীরা, সায়েবা ইত্যাদি হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এ পশুগুলো মুশরিকদের তাগুত মূর্তি সমূহের জন্য ছিল।[১২৪] আমর ইব্ন লোহাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মূর্তির নামে চতুস্পদ জন্তু উৎসর্গ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।[১২৫] আরববাসীগণ মূর্তিকে কেন্দ্র করে এত কিছু করত এ বিশ্বাসে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে।[১২৬] আল কুর'আনুল কারীমে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুশরিকগণ বলত:

ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى

"আমরা তো তাদের উপাসনা শুধু এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর ঘনিষ্ট করে দিবে।"[১২৭] আল কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

"আর এরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত এমন কিছুরও ইবাদাত করে যারা তাদের অপকার কিংবা উপকার কিছুই করতে পারে না। আর তারা বলে যে, এরা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।"[১২৮]

গণকতীরে বিশ্বাস

আরবের মুশরিকগণ গণকতীরে বিশ্বাসী ছিল। ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত ফলাফল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহৃত তীরগুলো ছিল তিন প্রকারের।

প্রথমত: ঐ তীরগুলোর গায়ে হ্যাঁ কিংবা না লিখা থাকত। এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলো সাধারণত ভ্রমণ, বিয়ে-সাদী বা অনুরূপ অন্য কোন কাজের জন্য ব্যবহৃত হত। বিশেষ একটি পদ্ধতিতে তীর বাছাই সম্পন্ন হত। কর্মপন্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাছাইকৃত তীরের গায়ে হ্যাঁ লিখা থাকলে সে কাজ করা হত। কিন্তু বাছাইয়ে না লিখা উঠলে কাজটি এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হত। আগামীতে তারা একই পদ্ধতিতে সে কাজের জন্য ভাগ্য নির্ধারক তীর বাছাই করত।

দ্বিতীয়ত: এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলোর কোনটির গায়ে লিখা থাকত পানি; কোনটির গায়ে লিখা থাকত দিয়াত আর অণ্যগুলোর গায়ে লিখা থাকত অন্য কিছু।

---

১২২. *আল কুর'আন*, ০৫:১০৩

১২৩. *আল কুর'আন*, ০৬:১৩৯

১২৪. *সহীহ আল বুখারী*, বাবু মা জা'আলাল্লাহু মিন বাহিরাতিন (আল মাকতাবাতুস শামেলাহ, ২য় সংস্করণ, তা. বি.), হাদিস নং. ৪২৫৭

১২৫. প্রাগুক্ত

১২৬. *আর রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১২৭. *আল কুর'আন*, ৩৯:০৩

১২৮. *আল কুর'আন*, ১০:১৮

তৃতীয়ত: এ শ্রেণীভুক্ত তীর গুলোর কোনটির গায়ে লিখা থাকত "তোমাদের অন্তর্ভুক্ত" কোনটির গায়ে লিখা থাকত "তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"। আবার কোনটিতে লিখা থাকত মুলহাক অর্থাৎ 'মিলিত'।

তীরগুলোর ব্যবহার ছিল নিম্নরূপ

কারো বংশ পরিচয়ের মধ্যে যখন সন্দেহের সৃষ্টি হত; তখন তাকে একশত উটসহ হোবল নামক মূর্তির কাছে নিয়ে যাওয়া হত। উটগুলো তীরধারী সেবায়েতের নিকট সমর্পণ করা হত। তিনি সবগুলো তীর একত্রিত করে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ঘুরাতে থাকতেন। অতঃপর তার মধ্য থেকে একটি তীর বের করে আনা হত। যদি "তোমাদের অন্তর্ভুক্ত" লেখা তীর বের হয়ে আসত তবে তাকে তাদের গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে স্থান দেয়া হত। অপর পক্ষে যদি "তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" লিখিত তীরটি বের হত; তখন তাকে হালিফ হিসেবে স্থান দেয়া হত। সে গোত্রীয় ব্যক্তি কিংবা সম্মানিত হিসাবে স্থান দেয়া হতো না।[১২৯]

যাদুতে বিশ্বাস

আরবের মুশরিকরা তথাকথিত যাদুকর ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদগণের ভবিষ্যদ্বাণী, কলা কৌশল ও কথাবার্তার উপর বিশ্বাস করতেন। যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতেন তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জানেন বলে দাবি করতেন। তাকে বলা হত কাহিন। কোন কোন কাহিন এরূপও দাবি করত যে, একটি জ্বিন তার অনুগত রয়েছে। সে যাবতীয় সংবাদাদি সংগ্রহ করে তার কাছে পৌঁছে দেয়। কোন কোন কাহিন এমনও প্রচার করত যে, অদৃশ্যের খবর নেয়ার মত যথেষ্ট জ্ঞান তার রয়েছে। এমনকি সেই খবরাখবর তিনি নিয়েও থাকেন।[১৩০]

জ্যোতিষীদের উপর বিশ্বাস

অকাশমন্ডলে তারকারাজির গতিবিধি, উদয়-অস্ত, আগমন-প্রত্যাগমন ইত্যাদি লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের আবহাওয়া, পরিস্থিতি কিংবা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন কোন ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা সম্পর্কে আভাস ইঙ্গিত প্রদান করা ছিল জ্যোতিষীগণের কাজ।[১৩১]

জ্যোতিষীগণের চিন্তা চেতনা এবং গণনার প্রভাব আজও যেমন জন সমাজে দেখা যায়; সেকালে তা আরো ব্যাপক ছিল। কিন্তু বিশেষ তফাৎ ছিল এ যে, তারকারাজির অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বৃষ্টি বাদলের পূর্বাভাষ দেয়া হলে তারা বিশ্বাস করতেন যে, তারকাই তাদের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। তাদের ভাল মন্দের মূলে রয়েছে এ তারকারা। এভাবে তারা জঘণ্য শিরক করত অবলিলাক্রমে।[১৩২]

বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা

ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই করুণ ছিল। আরব হল মরুভূমির দেশ। এখানে তেমন কোন শস্য উৎপন্ন হত না। ফলে তারা সর্বদাই বহির্বিশ্বে ধরনা দিতে বাধ্য হত। তারা

---

১২৯. *আর রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১

১৩০. প্রাগুক্ত

১৩১. *মির আতুল মাফাতিহ, শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ*, লাখনৌ, ২য় খন্ড, পৃ. ০২

১৩২. প্রাগুক্ত

ছিল চরমভাবে আর্থিক দূর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত।[১৩৩]

জীবিকা সংগ্রহ

মরুচারী বেদুঈনগণ ব্যবসা-বাণিজ্য, হাল-চাষ ইত্যাদিকে তাদের জন্য মানহানিকর মনে করত। ফলে তারা পশু চারণ, পশু শিকার বিশেষ করে দস্যুবৃত্তির মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করত।[১৩৪]
তারা মক্কার পথ ধরে বিভিন্ন দেশে যাতায়াতকারী কাফেলার উপর উপর্যপুরী আক্রমণ চালিয়ে তাদের সমূদয় মালামাল লুট করত এবং এ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। কোন কোন বেদুঈনগোত্র সওদাবাহী উটের মালিকের নিকট থেকে 'রক্ষাকর' আদায় করে তবে তার যাতায়াতের পথ ছেড়ে দিত। এছাড়া সমৃদ্ধশালী জনপদ ও শহরের উপর বেদুঈনদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন আরবের নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

মক্কা, ইয়াসরেব ও অন্যান্য শহরের জীবন যাত্রা

আরবের মক্কা ইয়াসরেব (পরবর্তী মদীনা) ও অন্যান্য শহরের জীবন যাত্রা বেদুঈনদের জীবন যাত্রা হতে পৃথক ছিল। বিশেষ করে মক্কায় একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গড়ে উঠে। মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত হলেও মক্কার আলাদা দু'টি সুবিধা ছিল। দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্য পথ চলে গিয়েছিল, মক্কা এর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তাছাড়া প্রাচীন কাল থেকেই মক্কা নগরীতে কা'বা নামক ইবাদাত গৃহ বিরাজিত ছিল।
তাই মক্কা ও এর আশেপাশে যুদ্ধ বিগ্রহ ও মারামারি নিষিদ্ধ ছিল। লোকেরা নির্ভয়ে এখানে যাতায়াত করত, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চাচা আবু তালিব, তাঁর প্রথমা স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রা.), আবু সুফিয়ান ও মক্কার আরো অনেকে সিরিয়ায় পণ্য-দ্রব্য পাঠিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। এতে অনেকে বহু অর্থ-সম্পদের মালিক হন। এ ব্যবসায়ী মহলের হাতে বহু অর্থ জমা হয়। এ নতুন সম্পদশালী সম্প্রদায় পুরনো গোত্রীয় সহযোগীতা ও সহায়তার কথা বিস্মৃত হয়। তারা সমাজের নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের এড়িয়ে চলতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কঠোরভাবে তাদেরকে তিরস্কার করেন। আল্লাহর বানী:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

"আর যারা কিছু চায় (অসহায় হওয়ার কারণে) তাদেরকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিও না এবং ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হয়ো না।"[১৩৫]

রাজনৈতিক অবস্থা

জাহেলিয়া যুগে আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ:

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপস্থিতি

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব ছিল না। ফলে দক্ষিণ ও মধ্য আরবে রাজনৈতিক বিশৃংখলা প্রকট আকার ধারণ করে।[১৩৬]

---

১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩

১৩৪. ড. মফিজুলণ্ঢাহ কবির, *ইসলাম ও খিলাফত*, পৃ: ৪৪

১৩৫. *আল কুর'আন*, ৯৩:১০

১৩৬. *মির আতুল মাফাতিহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০২

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অনৈক্য

জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য বলতে কিছুই ছিল না। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অরাজকতা, বিশৃংখলা তাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, "Their Political life was on a throughly primitive level"[১৩৭]

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব

আরব ভূখন্ডের উপর সে যুগের দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রোম ও পারস্যের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। উত্তর আরব রোমানদের এবং দক্ষিণ আরব ছিল পারসিক প্রভাব বলয়ে। ফলে উভয়ের মধ্যেই দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ লেগেই থাকত।

সংবিধানের অভাব

"Constitution is the best power of a state of Organization" কিন্তু এ সাংবিধানিক শাসন আরবদের মাঝে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। কারণ তাদের কেন্দ্রীয় কোন নেতৃত্ব ছিল না।

গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা

তৎকালীন আরবে কোন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল না। আরববাসী ছিল বহু সংখ্যক গোত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক গোত্রের একজন শায়খ বা গোত্র প্রধান থাকত। গোত্রীয় কু-সংস্কার খুবই মামুলি একটি বিষয় ছিল। তারা তুচ্ছ কোন ঘটনা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে গোত্রে গোত্রে ভয়াবহ সংঘর্ষ বাধিয়ে দিত। যার রেশ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত চলতে থাকত। তাদের মধ্যে একটি প্রবচন প্রচলিত ছিল যে, "তোমার ভাইয়ের পাশে দাঁড়াও চাই সে অত্যাচারী কিংবা অত্যাচারিত যাই হোকনা কেন।" তারা এ নীতি পুরো পুরি মেনে চলত। গোত্রীয় অহংবোধ খুবই প্রবল ছিল। তাদের প্রত্যেকেই এমন ধারণা পোষণ করত যে, একমাত্র তারাই অভিজাত পরিবারের সদস্য।[১৩৮]

সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন

এতদাঞ্চলে কেন্দ্রীয় কোন শাসন ব্যবস্থা না থাকার কারণে তৎকালীন দুই পরাশক্তি এখানে তাদের অনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তার করত। এর মধ্যে উত্তর আরব নিয়ন্ত্রণ করত রোমানরা আর দক্ষিণ আরব নিয়ন্ত্রণ করত পারসিকরা। আর উভয় পরাশক্তির লালসার সহজ শিকার হত উভয় আরববাসী। সমকালীন আরবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 'আররাহিকুল মাখতূম' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আরব উপদ্বীপের তিন দিকে সীমান্তবর্তী দেশগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা ছিল দারুন অস্থিতিশীল, বিশৃংখল ও পতনমুখ। সমাজের মানুষরা ছিল কেউ প্রভু, নয়তো দাস, হয়ত রাজা নয়তো প্রজা। শাসিত শোষিত এ দু'টো শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল মানব সমাজ। মনিব, রাজা, দলপতি, নরপতি যে উপাধিতেই ভূষিত থাকুন না কেন, সমাজ জীবনের যাবতীয় কল্যাণ বা সুযোগ সুবিধার একচ্ছত্র অধিকার নির্ধারিত থাকত নেতাদের জন্য এবং ভোগ করত কেবল তারাই আর এর চেয়ে বেশী নির্ধারিত বিশেষ করে

---

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ০৩

১৩৮. ড. মজিদ খান, *শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)* (অনুবাদ, আবু মহাম্মদ, ই, ফা, বা, প্রকাশকাল এপ্রিল ২০০৫), পৃ. ৫৩-৫৪

বহিরাগত নেতাদের জন্য। অপর পক্ষে দলপতি বা নরপতিগণের যাবতীয় আরাম আয়েশ সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির আয়োজন ও উপকরণাদির জন্য প্রানান্তকর পরিশ্রম করতে হতে জনসাধারণ এবং দাস দাসীদেরকেই।[১৩৯] আরো সহজ কথায় বললে বলা যেতে পারে যে, প্রজারা ছিল যেন শস্য ক্ষেত্র স্বরূপ যেখান থেকে সংস্থান হত রাষ্ট্রের যাবতীয় আয় উপার্জনের। রাষ্ট্রনায়কগণ এসব উপার্জন তাদের ভোগ বিলাস, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং নানাবিধ দুস্কর্মে ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই ছিল না। অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত মানুষগুলো তাদের অভাব অভিযোগগুলো মুখে আনলেই নির্যাতনের মাত্রা শতগুণে বেড়ে যেত।[১৪০] এককথায় স্বৈরাচারী শাসন বলতে যা বুঝায় তা চরমে পৌঁছেছিল সে সব অঞ্চলে। কাজেই সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করা ব্যতিত এবং নিরবে চোখের পানি ঝড়ানো ব্যতিত তাদের আর কোন উপায় ছিল না। শোষণ নির্যাতন, বঞ্চনার আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা ছিল মানবতা। সে সব অঞ্চলের আশে পাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোকেও মাঝে মাঝে এসব জুলুম নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হত। উল্লিখিত স্বৈরাচারী ও শাসকগোষ্ঠি দলপতিগণের ভোগবিলাস, স্বার্থান্ধতা এবং অর্থহীন অহংবোধের বিষবাষ্পে বিপর্যস্ত হয়ে তারা ছুটে বেড়াত দ্বিগ্বিদিক। এ দলপতিগণ তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কখনো হাত মিলাত ইরাকীদের সঙ্গে কখনো বা শামবাসীদের সঙ্গে উদ্দেশ্য একটাই তাদের সহযোগিতায় নিজেদের মাতব্বরী ঠিক রাখা, জনগণের উপর অন্যায় প্রভাব বলবৎ রাখা।[১৪১] যে সব গোত্র আরব ভূখন্ডের অভ্যন্তরে বসবাস করত। তাদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা ও বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করত। গোত্র গোত্রে কলহ বিবাদ, বংশ পরম্পরাগত শত্রুতা, ধর্মীয় মতবিরোধ, গোষ্ঠিগত বিদ্বেষ প্রভৃতি নানা কারণে পরিস্থিতি থাকত প্রায়ই উত্তপ্ত। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন প্রত্যেক গোত্রের লোকজন নিজ নিজ গোত্রের পক্ষে কাজ করত। তা সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক সেটা দেখার বিষয় ছিল না। আরবের ভিতরে এমন কোন শক্তিশালী একক শাসক ছিলেন না যে তাদের কণ্ঠকে শক্তিশালী করতে পারতেন। এমন কোন আশ্রয়স্থল ছিল না বিপদ আপদ কিংবা সংকটের সময়ে যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

যুদ্ধাংদেহী মনোভাব

তাদের রাজনৈতিক দর্শন ছিল: 'Might is right and Blood for blood.'
শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী "ইসলাম এন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, আরবরা মরুময় মেজাজে গড়ে উঠার কারণে সর্বদা একটি যুদ্ধাংদেহী মনোভাব পোষণ করত। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত। এমন কি যুদ্ধ তাদের কাছে আনন্দের বিষয় বলেই মনে হত। তাদের কবিগণ যুদ্ধকে আনন্দের বিষয় উল্লেখ করে কবিতা রচনা করতেন। একজন আরব্য কবির ভাষায়:

"শত্রুর কোন গোত্র আমরা দেখি না
বন্ধু ভাবাপন্ন গোত্রের সাথে আমরা যাই সমরে,
মিটাই মোদের যুদ্ধের তিয়াস।"

আরেকজন কবির ভাষায়:
"গোত্রের মধ্যে বাধুক যুদ্ধ এই মোর কামনা
মোর অশ্ব যবে হবে উপযুক্ত সওয়ারী বহনে,
সুযোগ আসিবে ত্বরা

---

১৩৯. *আর রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪

১৪০. প্রাগুক্ত

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪

দেখাইব শৌর্য মোর তরবারীর আর অশ্বের॥"[১৪২]

সাংস্কৃতিক অবস্থা

Culture is the mirror of a nation. জাহেলি যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক অবস্থা কেমন ছিল নিম্নে তা তুলে ধরা হল:
ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা সাহিত্য ও গীতিকাব্য চর্চায় খুবই পারদর্শী ছিল। সেকালে গ্রীকরা যেমন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল তদ্রুপ আরবগণ সাহিত্য ও গীতিকাব্য চর্চায় অশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিল।

কাব্যপ্রীতি

বিশুদ্ধ ও উন্নত আরবী ভাষায় কাব্য রচনা করা সেকালের প্রতিটি নর নারীর চিত্ত বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল।

কবিতার ভাবধারা

তাদের কবিতার মূল বিষয় বস্তু ও ভাবধারা ছিল নারী, যুদ্ধ, মদ-জুয়া, প্রেমচর্চা, বংশীয় বীরত্ব প্রকাশ করা।

সাব'ঈ মুয়াল্লাকাহ

জাহেলি আরবের উকায মেলায় বাৎসরিক কাব্য প্রতিযোগিতা হত। সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী সাতজন কবির সাতটি কাব্য-সাহিত্য, স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে কা'বার দেয়া লে ঝুলিয়ে রাখা হত। এ গুলোকেই সাব'ঈ 'মুয়াল্লাকাহ' বলা হত।

খ্যাতনামা কবিগণ

সে যুগের খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন: ইমরাউল কায়েস, আনতারা ইব্ন সাদ্দাদ, লাবীদ ইব্ন রবিয়াহ, বুহায়র, হারিস, কালসুম প্রমুখ।

আরব জাতির নীতি-নৈতিকতা

সাহসিকতা

আরব জাতি ছিল অপরিসীম সাহসের অধিকারী, কোন শক্তিই বল-বিক্রমের ভয় দেখিয়ে কখনো তাদের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি। ভয়াবহ রণাঙ্গনকে তারা সাধারণ খেলার মাঠের চেয়ে কখনো বেশি মর্যাদা দেয়নি। একইসাথে তাদের হৃদয়ে ছিল কাজ করার মত মানসিক দৃঢ়তা। এ জন্যই কুর'আনের সংস্পর্শে এসে তারা একা শুধু পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নয় বরং দুনিয়ার সমস্ত জাতি ও সমস্ত রাজ্যের বিরুদ্ধে একসঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে একদিকে ভারত এবং অন্যদিকে স্পেন পর্যন্ত ইসলামের (শান্তির) বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে পেরেছিলেন।[১৪৩]

---

১৪২. মাওলানা আকবর আলী খান শাহ নজিরাবদী, *ইসলামের ইতিহাস, প্রথম খন্ড* (ই, ফা, বা, দ্বিতীয় সংস্করণ মে-২০০৫), পৃ. ৬৭

১৪৩. *ইসলাম ও খিলাফত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা

ইতিহাসের শুরু থেকেই কখনোই আরব জাতি কোন বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নত করেনি। বিশেষভাবে ইসমাঈল বংশীয়দের আবাসভূমি উত্তর আরব চিরদিনই স্বাধীন থেকেছে। প্রাক ইসলামিক যুগে কোন এক আরব এক মামলার শুনানি উপলক্ষ্যে পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। বিপক্ষের কৌশলী অপরাধ সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে উক্ত আরবকে দোষারোপ করে বলেছিল 'তোমরা হিংস্র যাযাবর জাতি, অতি তুচ্ছ কারণে মারামারি, রক্তারক্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহ করতে অভ্যস্থ।' এ কথা শুনে উক্ত আরব বলিষ্ঠতার সাথে জবাব দিয়েছিল, 'জনাব, সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে কোটি কোটি লোকের মধ্যে মাত্র একজন লোক রাজ সিংহাসনে বসার উপযুক্ত ছিল। তেমনি বিশাল রোম সাম্রাজ্যেও। এদের প্রত্যেকেই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও সিংহাসনে আরোহণ করছেন মাত্র দু'জন। তবু এ দু'জনের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকে। কিন্তু আপনি তাঁদেরকে হিংস্র বলে আখ্যা দিতে রাজী হবেন না।

আর অন্য দিকে আরবের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর প্রত্যেকেই শক্তিতে সামর্থ্যে, শৌর্যে, সাহসে, বিরত্বে বংশ মযার্দায় এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার যোগ্য। অথচ রাজ মুকুট, সিংহাসন এবং রাজ্য বলতে তাদের কিছুই নেই। যদি তাঁদের মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকে তবে বিচিত্র কি? এজন্য কি তারা হিংস্র বলে বিবেচিত হতে পারে?' এ উত্তর থেকেই দুর্ধর্ষ আবরজাতির প্রকৃত সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের এ অসাধারণ বল-বিক্রম এবং বীরত্বের কারণেই বাবেলের দুর্দান্ত অত্যাচারী রাজা বোখতে নসর, বনি ইসরাঈলকে ধবংস করে দিতে পেরেছিল। কিন্তু আরবের দিকে চোখ তুলতেও সাহস করেনি।

গ্রীক ও রোমকরা বহু শতাব্দী ধরে মিশর থেকে ইরাকের সীমান্ত পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল কিন্তু ভুলেও কোনদিন 'আরবের অভ্যন্তরে পা রাখার সাহস পায়নি।[১৪৪] আলেকজান্ডার এবং রোম সেনাপতিরা যতবারই আরবের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল, ততবারই তাদেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। হাবশীরা ইয়ামান জয় করে হাতির পাল নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেছিল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সমূলে ধবংস করে দিয়েছিলেন। যার বর্ণনা রয়েছে পবিত্র কুর'আনের সূরা ফীলে।

আতিথেয়তা ও বদান্যতা

মেহমানদের সেবা এবং প্রতিবেশীদের জন্য আত্মোৎসর্গ করা ছিল তাদের একটি বিশেষত্ব। সুনাম অর্জনের জন্য মূল্যবান উট যবেহ করে অপরিচিত বিদেশী মেহমানদের আপ্যায়ন করা, জুয়া খেলার প্রতিযোগিতায় এবং খেলাধূলায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কার দিয়ে অথবা আপ্যায়ন করে নিজেদের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়া এবং আশ্রিত ও আত্মসমর্পণকারীদের সাহায্যার্থে নিজেদের জান মাল উৎসর্গ করে দেয়া ছিল তাদের চিরাচরিত প্রথা। প্রাক ইসলামী যুগের কবিদের হাজারো কবিতায় এসব ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, মেহমান মেজবানের বাবার হত্যাকারী হওয়া সত্যেও মেজবান তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি। এমনকি মেহমানের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেনি, যেহেতু সে তার মেহমান হয়েছে। দুনিয়ার সব অনাচার ও অবিচারের প্রতিকার ও প্রতিবিধান করার জন্য যে মহামানবের আগমন হবে তাঁর এমন একটা দেশে আবির্ভূত হওয়াই ছিল সঠিক; এবং সময়ের একমাত্র দাবী। আর আল কুর'আনও সেখানেই অবতীর্ণ হবে যে দেশ পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত, যে দেশের মানুষ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দুনিয়ার সব পবিত্র ধর্মের সত্যতা উপলব্দি করতে পারবে। তাঁরা সাহাবী ও মুহাজির এবং আনসার হয়ে অপ্রতিরোধ্য বীরত্ব বলে আল্লাহর শত্রুদেরকে পরাজিত করবে। তাঁরা বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিজেদের বংশ মর্যাদাবলে পৃথিবীর সকল জাতির উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করতে এবং নির্ভীক চিত্তে সত্যের বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। চাই সে মহান

১৪৪. প্রাগুক্ত

প্রভাবশালী হোক কিংবা সাধারণ।[১৪৫] তাঁরা বজ্রকণ্ঠে সত্যেরবাণী প্রচার করতে সক্ষম হবে। এ মহামানবের আবির্ভাবের সুসংবাদ শুনে দেশ দেশান্তর হতে পঙ্গপালের মত আগত নিঃসহায়, নিঃসম্বল দীন-দুঃখীদেরকে নিজেদের বদান্যতা বলে আশ্রয় দিয়ে এবং তাদেরকে মেহমানদারী করে বিনা দ্বিধায় ধন-সম্পদসহ সর্বস্ব লুটিয়ে দিতে পারবে এবং নিজেদের আল্লাহ প্রদত্ত স্মরণশক্তি বলে আল্লাহর পবিত্র কালাম কণ্ঠস্থ করে পৃথিবীর দূর-দূরান্তে প্রত্যেক নর-নারীর কর্ণ-কুহরে পৌঁছে দিতে পারবে। আরব ব্যতিত আর কোন দেশ বা জাতি এমন গুণসম্পন্ন ছিল না। অন্য সকল দেশে তখন চলছিল গরীবের উপর ধনীদের অমানুষিক অত্যাচার এবং ধর্মীয় নেতাদের দোর্দন্ড প্রতাপ, মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা ও বল-বীর্য পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। এজন্যই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সমগ্র জগতের জন্য রহমত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও সর্বকালের সর্বসেরা গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কুর'আনকে প্রেরণ করলেন চির মুক্ত, চিরস্বাধীন, বীরের দেশ, আরব দেশে, আরবী ভাষায় পবিত্র মক্কা নগরীতে।[১৪৬]

অঙ্গীকার পালন

আরবের লোকেরা অঙ্গীকার পালনকে ধর্মের অংশ বলে মনে করত। অঙ্গীকার পালন বা কথা রাখতে গিয়ে তারা জান-মালের ক্ষতিকেও তুচ্ছ মনে করত। এটা বোঝার জন্য হানী ইব্ন মাস'উদ শায়বানি, শামোয়াল ইব্ন আদীয়া এবং হাজের ইব্ন জারারার ঘটনাগুলোই যথেষ্ট। এ জন্যই তারা রাসূলে আকরাম (স.) এর আনিত কালিমা তাইয়্যেবাহ ঘোষণা করতে এত ভেবেছিল যে কেউ কেউ কয়েক বছর পর্যন্ত এ দাওয়াত নিয়ে চিন্তা করেছে তবু গ্রহণ করেনি। তাদের ধারণা এটাই ছিল যে আমি আজ যা ঘোষণা করব যে কোন মূল্যে আমাকে তার উপর অটুট থাকতেই হবে।[১৪৭] প্রতিজ্ঞা পালনে জাহেলি যুগের লোকদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এ ছিল যে, কোন কাজ করতে প্রতিজ্ঞা করলে সে কাজ থেকে তারা কিছুতেই দূরে থাকত না। এতে কোন বাধাই তাঁরা সহ্য করতেন না। জীবন বিপন্ন হলেও সেকাজ তারা করতেন।[১৪৮]

স্মৃতিশক্তি ও বংশ গৌরব

প্রাক ইসলামী যুগে আরবদেশে বংশগত ও গোত্রগত মর্যাদার লড়াই নিয়েই বিভিন্ন গ্রোত্রের মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ঘৃণার উদ্রেক ছিল মারাত্মক আকারে। এ মর্যাদা রক্ষার জন্যই তারা একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেত। এমনকি তারা অতি যত্নসহকারে নিজ নিজ গোত্রের মূল এবং শাখা-প্রশাখার তথ্য যাবতীয় প্রমাণ সহকারে রক্ষা করত। এজন্য প্রত্যক গোত্রেই দু-একজন বেতনভুক্ত বংশ পরিচয় বিশারদ নিযুক্ত করা হত। তাদের স্মরণশক্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁরা প্রাচীন ও মধ্য যুগের লক্ষ লক্ষ কবিতা পংক্তির পর পংক্তি মুখস্ত করে রাখতে পারতেন, অন্যকে শুনাতে পারতেন। বাৎসরিক মেলা ও হজ্ব অনুষ্ঠানে নিজেদের জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিয়ে প্রশংসিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। তারা এরূপ অসাধারণ

১৪৫. মাওলানা ফজলুর রহমান ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, *বিশ্বনবী হয়রত মুহম্মদ (স:) এর জীবনী* (ঢাকা: মীনা বুক হাউজ), পৃ: ৬৪

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

১৪৭. *আর রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১৪৮. প্রাগুক্ত

স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন বলেই, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহাগ্রন্থ আল কুর'আন সম্পূর্ণটা এবং রাসূলে আকরাম (স.) এর লক্ষ লক্ষ হাদীস অক্ষরে অক্ষরে কণ্ঠস্থ করে রাখতে পেরেছিলেন।[১৪৯]

বেদুঈনসুলভ সরলতা

তাঁরা সভ্যতার উপকরণ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন এবং এক্ষেত্রে তাদের অনীহা ছিল। এ ধরনের সহজ সরল জীবন যাপনের কারণে তাদের মধ্যে সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তা এবং আমানতদারিতা পাওয়া যেত। প্রতারণা করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এসবকে তাঁরা মারাত্মকভাবে ঘৃণা করতেন। সমগ্র বিশ্বের সাথে জাযিরাতুল আরবের ভৌগলিক অবস্থানের পাশাপাশি আরববাসীদের উল্লিখিত চারিত্রিক গুণাবলীর কারণেই তাঁদেরকে মানব জাতির নেতৃত্ব এবং নবী প্রেরণ ও কুর'আন নাযিলের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। এসব গুণাবলীর কারণে যদিও তাঁরা হঠাৎ করে ভয়ংকর হয়ে উঠত এবং অঘটন ঘটাতো তবুও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, এ সব গুণাবলী ছিল প্রশংসনীয় প্রকৃত মানবিক গুণ।[১৫০]

ঐশী জ্ঞানের ছোঁয়ায় সংশোধনের পর এসব গুণ মানুষের জন্য মহা কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে। মহাগ্রন্থ আল কুর'আন সে কাজই সম্পাদন করেছে। [১৫১]

তখনকার মানুষরা নিরক্ষর থাকলেও তাদের উন্নত মনন, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি অপরিসীম রসবোধ সম্পন্ন সাংস্কৃতিক চেতনা ছিল প্রশংসনীয়। আর এক্ষেত্রে আরবরা ছিল সবার শীর্ষে। ঐতিহাসিক হিট্রি যথার্থই বলেছেন, "পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি সম্ভবত আরবদের ন্যায় সাহিত্য চর্চায় এতবেশি স্বতস্ফূর্ত একাগ্রতা প্রকাশ করেনি।"

কেমন ছিল বড় বড় ধর্মগুলোর অবস্থা

আরবে ইয়াহুদীবাদ

আরব উপদ্বীপে ইয়াহুদীদের ধর্মীয় ইতিহাসে দু'টো বিশাল সময় অতিবাহিত হয়েছিল। প্রথম যুগটি সে সময়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল যখন ফিলিস্তিনের বাবেল এবং আশুরের রাষ্ট্র বিজয়ের কারণে ইয়াহুদীদেরকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। এ সময়ে ব্যাপকভাবে ইয়াহুদীদেরকে ধর পাকড়, বখতে নসরের হাতে ইয়াহুদী বসতি ধবংস ও উজার, ওদের মুখাকৃতির ক্ষতি সাধন এবং ব্যবিলন থেকে ব্যাপকভাবে দেশান্তরের ফলে একদল ইয়াহুদী ফিলিস্তিন ছেড়ে গিয়ে হিজাজের উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় যখন টাইটাসের নেতৃত্বে রোমানগণ ৭০ খ্রিষ্টাব্দে জোরপূর্বক ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। সে সময়ও রোমানদের বহু বসতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের মুখাকৃতির ক্ষতি সাধন করা হয়। এর ফলে বহু ইয়াহুদী গোত্র হিজাজ থেকে পলায়ন করে ইয়াসরেব, খায়বার ও তাইমায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সে সকল স্থানে তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে আর্থিক সমৃদ্ধি ও সঙ্গতি লাভের পর তারা সুদৃঢ় দূর্গও নির্মাণ করে।

---

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১৫০. প্রাগুক্ত

১৫১. প্রাগুক্ত

এসব দেশত্যাগী ইয়াহুদীদের মাধ্যমে আরববাসীগণের মধ্যে এক প্রকার ইয়াহুদী প্রথা চালু হয়ে যায়। এ আরব ইয়াহুদী সংমিশ্রণের সূত্রপাত হয় ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষাপটে তা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ইসলামের আবির্ভাবকালে উল্লেখযোগ্য ইয়াহুদী গোত্রগুলো ছিল যথাক্রমে খায়বার, নাযির, মোস্তালিক, কোরায়যা ও কায়নুকা। বিখ্যাত সামহুদী "ওয়াফাইল ওয়াফা" গ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, সে সময়ে ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সংখ্যা বিশেরও কিছু বেশি ছিল।[১৫২]

ইয়ামানে ইয়াহুদীবাদ বেশ বিস্তার লাভ করে। এখানে এর বিস্তার লাভের মূল কারিগর ছিলেন 'তাবআন আসাদ আবু করব'। এ ব্যক্তি যুদ্ধ করতে করতে ইয়াসরেব গিয়ে উপনীত হন। সেখানে তিনি ইয়াহুদী মতবাদ গ্রহণ করেন। বনূ কোরায়যার দু'জন ইয়াহুদী বিদ্বানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ইয়ামান যান। এভাবে ইয়ামানে ইয়াহুদী মতবাদ বিস্তার লাভ করে। আবু করবের পর তাঁর পুত্র 'ইউসুফ যু-নাওয়াস' ইয়ামানের শাসন কর্তা নিযুক্ত হন। শাসন ভার গ্রহণ করার পর তিনি নাজরানবাসী খ্রিষ্টানদের উপর ইয়াহুদী মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ইয়াহুদী মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। কিন্তু প্রবল চাপ সত্ত্বেও খ্রিষ্টানগণ ইয়াহুদী মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। যার ফলে যু-নাওয়াস গর্ত খনন করে সে গর্তে অগ্নি প্রজ্জলিত করেন। তাঁদের বহু যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে বহু জ্যান্ত লোককে সে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে নির্মমভাবে হত্যা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, বিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক এ নারকীয় হত্যা কান্ডের শিকার হয়েছিলেন। এ নারকীয় হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছিল ৫২৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। কুর'আন মাজীদের সূরা বুরুজে 'আসহাবুল উখদূদ' বলে উক্ত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।[১৫৩]

ইয়াহুদী ধর্ম

ইয়াহুদীবাদের অবস্থা ছিল বাস্তবতা বিবর্জিত। ইয়াহুদীদের মধ্যে অসার ও মিথ্যা বাগাড়ম্বর ও মনগড়া বানানো কথা বার্তা ছাড়া তেমন আর কিছুই ছিল না । ইয়াহুদী পুরোহিতগণ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিজেরাই চেয়েছিলেন প্রভুর আসনে সমাসীন হতে। ধর্মের আবরণে তারা চেয়েছিলেন নিজেদের খোদায়ী প্রতিষ্ঠা করতে। তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ সংগ্রহ করে সম্পদের পাহাড় রচনা করা। সম্পদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আসল ধর্ম-কর্ম যদি চুলায় যায় যাক, অবিশ্বাস কিংবা অধর্ম যদি বিস্তার লাভ করে করুক তাতে কিছুই আসে যায় না। এটাই ছিল ইয়াহুদীবাদের আসল চেহারা।

আরবে খ্রিষ্টবাদ

খ্রিষ্টান ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে যতটুক জানা যায়, তা হল এ যে, আরবের শহরগুলোতে ওদের আগমনের ব্যাপারটি ঘটেছিল হাবশি এবং রোমানদের আধিপত্য বিস্তারের পর বিজয়ীদের মাধ্যমে। সে সময় এমন এক বুজুর্গ ব্যক্তি নাজরানে আগমন করেন, যার প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হত বলে কথিত আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন পুরুষ। তাঁর নাম ছিল 'ফাইমিউন"। খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি নাজরানে খ্রিষ্টীয় মতবাদের প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। নাজরানবাসীর উপর

---

১৫২. উদ্ধৃত, *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১৫৩. *সীরাতে ইব্ন হিশাম* (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), ১ম খন্ড, পৃ, ১০

তাঁর প্রচারকার্যের প্রভাব খুবই কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। তারা তাঁর কাছে এমন কতগুলো অলৌকিক ঘটনা দেখতে পান; যা তাদের বিশ্বাসের ভিক্তিমূলকে সুদৃঢ় করে তোলে। এরপর তারা সকলেই তার ধর্ম গ্রহণ করে।

এরপর যু নাওয়াসের পৈশাচিক কর্মকান্ডের প্রতিশোধস্বরূপ হাবশিগণ পুনরায় ইয়ামান দখল করে নেন। 'আবরাহা' নামক এক ব্যক্তি রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র নায়কের আসনে সমাসীন হওয়ার পর নতুন উদ্দমে খ্রিষ্টীয় মতবাদের প্রচার ও প্রসার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তার এ প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে ইয়ামানে ভিন্ন একটি বিকল্প কা'বা গৃহ নির্মাণ। তার নির্মিত কা'বা গৃহে হজ্জ পালনের জন্য আরববাসীকে আহবান জানান। বাদশাহ আবরাহা শুধু বিকল্প একটি কা'বা গৃহ নির্মাণ এবং হজ্জ পালনের আহবান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কা'বাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি বিশাল হাতিবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেন। কিন্তু মক্কা ধ্বংস করাতো দূরের কথা আল্লাহ তা'আলার গযবে পরে বিশাল হাতিবাহিনীসহ তিনি নিজেই সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আল কুর'আনুল কারীমের সূরা ফীলে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফীলের এই ঘটনা সর্বকালের সকল মানুষের শিক্ষা লাভের জন্য একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে থাকবে। অপরদিকে রোমান অঞ্চল সমূহের নিকটে হওয়ার কারণে গাসসান, বনূ তাগলীব, বনূ তাঈ এবং অন্যান্য আরব গোত্র সমূহে খ্রিষ্টীয় মতবাদ বিস্তার লাভ করতে থাকে। হীরার আরব সম্রাটগণও খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৫৪]

খ্রিষ্ট ধর্ম

খ্রিষ্টান ধর্মও ইয়াহুদি ধর্মের মত সত্য বিবর্জিত শিরক ও পৌত্তলিকতায় ভরপুর হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদের গোলক ধাঁধাঁ তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এ ভ্রান্ত বিশ্বাস আল্লাহ ও মানুষের মাঝে এক আজব সংমিশ্রণের সৃষ্টি করেছিল। তা সত্ত্বেও আরববাসীগণ যে আশায় এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর এ ধর্মের কোন প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। কেননা এর আদর্শের সঙ্গে তাদের পুরানো জীবন যাত্রা প্রণালী পরিত্যাগ করতে পারছিলেন না। আরবের অন্যান্য ধর্মালম্বীদের অবস্থা মুশরিকগণের মতই ছিল। কারণ তাদের মন-মানসিকতা একই ছিল। বিশ্বাসসমূহে অনেকটাই মিল ছিল। তাদের রীতি-নীতি ছিল একই রকম।[১৫৫]

মাজূসী মতবাদ ও অগ্নি পূজারী

মাজূসী মতবাদ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে এ যে, পারস্যের নিকটে আরব ভূমিতে এ মতবাদ বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন আরবের ইরাকে, বাহরাইনে (আল আহসা), হিজর এবং আরব উপসাগরীয় সীমান্ত অঞ্চলে। তাছাড়া ইয়ামানে পারস্য শাসন আমলেও বিচ্ছিন্নভাবে দু একজন মাজূসী মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন।

সাবী বা তারকা পূজারী

এরপর অবশিষ্ট থাকে সাবী মতবাদের কথা। ইরাক এবং অন্যান্য দেশের প্রাচীন শহর-নগরে ধ্বংস স্তুপ খননের সময় যে সকল প্রত্নতাত্বিক প্রমাণাদি পাওয়া যায় তা থেকে এটা বুঝা যায় যে, তা হযরত

---

১৫৪. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

ইব্রাহীম (আ.) এর কালদানী মতবাদ। প্রাচীন শাম এবং ইয়ামানের বহু অধিবাসী এ মতবাদের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ইয়াহুদী মতবাদ এবং তার পরে খ্রিষ্টীয় মতবাদ বিস্তার লাভ করে তখন উক্ত সাবী মতবাদের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়ে। প্রজ্জলিত প্রদীপ ক্রমে নিভে যেতে থাকে। কিন্তু তবু মাজুসীদের সঙ্গে একত্রে কিংবা পাশাপাশি বসবাসের ফলে আরব ভূখন্ডের ইরাকে এবং আরব উপসাগরীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উক্ত মতবাদের কিছু সংখ্যক অনুসারী থেকে যায়।

ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্মের বিকৃতি

তারা ইব্রাহীম (আ.) প্রচারিত সত্যধর্মের অনুসারী বলে দাবী করলেও প্রকৃত পক্ষে দ্বীনে ইব্রাহীমের কোন বৈশিষ্ট্যই তাদের চিন্তা চেতনা, ধ্যান ধারণা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল না। কালক্রমে তারা মূর্তিপূজা, নানা রকম অশ্লীলতা এবং পাপাচারের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত অহীর আলোকে হযরত মুহাম্মাদ (স.) যখন আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামের শাশ্বতরূপ এবং ইব্রাহীমের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গে এর সম্পর্কের কথাটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, তখন তাদের ধর্ম সম্পর্কিত দাবির অসারতা দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।[১৫৬]

চতুর্থ অধ্যায়
কুর'আন নাযিল পূর্ববর্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অবস্থা

পাশ্চাত্য জগত

রোমক সভ্যতার বিলোপ সাধন

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীকে মানবেতিহাসের অন্ধকারময় যুগ বলে অভিহিত করা হয়। শাইখ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "মানবতা গিরিচূড়ার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। দুঃখজনকভাবে শতাব্দীকাল ধরে মানবতা শুধু সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বে এমন কোন সংস্থা বা শক্তি দেখা যাচ্ছে না যা মানবতার উদ্ধারে এগিয়ে আসতে পারে এবং ধ্বংসের অতল গহবরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া থেকে একে রক্ষা করতে পারে।" পাশ্চাত্যে রোমকগণ (কনস্ট্যান্টিনোপলবাসী) নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য ভোগ করে আসছিল, পক্ষান্তরে প্রাচ্যে ছিল পারস্য সম্রাটদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। এই উভয় সাম্রাজ্য দুর্নীতি ও ক্ষয়িষ্ণু মানব সভ্যতার সাথে সাথে এক বিশৃঙ্খল ও অকল্যাণকর অবস্থার মধ্যে ডুবে ছিল। বস্তুত গ্রীক সংস্কৃতির উপর ভর করে রোমক সভ্যতা দাঁড়িয়েছিল। আর্নল্ড জে. টয়েনবি'র মতে

১৫৬. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত

"আগে ও পরে গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস না জেনে রোমের ইতিহাস জানা সম্ভবপর নয়। গ্রীক ইতিহাসের পর সভ্যতার ক্ষেত্রে রোম তার স্বীয় ভূমিকা পালন করে। রোম ব্যতীত কেউ গ্রীক ইতিহাস জানতে পারে না। কিন্তু গ্রীক সমাজ ও সভ্যতা ব্যতীত রোমক ইতিহাস অকল্পনীয়। আমরা যখন গ্রীক সভ্যতার নিজস্ব রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করি, তখন লক্ষ্য করি যে, গ্রীক ইতিহাসের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রীক সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐক্য ও এর রাজনৈতিক অনৈক্যের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।[১৫৭] এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে আর্নল্ড জে. টয়েনবি আরো বলেন, "গ্রীক সমাজ রাজনৈতিকভাবে একাধিক সংখ্যক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত, যার নাগরিকগণ স্বীকার করে যে, তারা সকলে একটি সাধারণ সংস্কৃতির অংশীদার। তবুও তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না- এই সংস্কৃতি তাতে এমন বাধাও দেয় না। কালের আবর্তণে তাদের মধ্যকার ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এতই বিধ্বস্তকর হয়ে ওঠে যে তাদের সভ্যতা যেন মর্মযন্ত্রণায় মুষড়ে পড়ে। যখন এই সভ্যতা প্রায় বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে তখন রোমক সাম্রাজ্যে গ্রীক সমাজের বিলম্বিত রাজনৈতিক সংযুক্তির মাধ্যমে এটা সাময়িকভাবে রেহাই পায়। এর ফলে সাময়িক শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে, কিন্তু এ জন্য একের পর এক ধ্বংসকর যুদ্ধ বিগ্রহে তাদেরকে দারুণ মূল্য দিতে হয় যার পরিণতি ঘটে সকল রাজনৈতিক শক্তির উচ্ছেদের মাধ্যমে একজন বিজয়ীর টিকে যাওয়া। এই সময়ের মধ্যে রোম কর্তৃক যখন গ্রীকের সার্বজনীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গ্রীক সভ্যতা এত মারাত্মকভাবে নিঃশেষিতপ্রায় ও নীতিহীন হয়ে পড়ে যে এর সার্বজনীন রাষ্ট্র চিরকালের জন্য বজায় রাখতে অসমর্থ হয় এবং রোমক সাম্রাজ্যের অবসান গ্রীক সভ্যতার বিলুপ্তির অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে প্রতিপন্ন হয়।[১৫৮]

পাশ্চাত্য জগতের অন্ধকার যুগ

ইউরোপীয় জাতিসমূহ তখনও পর্যন্ত অন্ধকার যুগের মধ্যে নিমজ্জিত এবং অজ্ঞতা ও অতীব দুর্দশাজনক অবস্থার গভীরে নিপতিত ছিল। H.G.Wells এর মতে "পশ্চিম ইউরোপে তখন শৃঙ্খলা অথবা ঐক্যের চিহ্নমাত্র ছিল না।"[১৫৯] আরেকজন বিখ্যাত গ্রন্থকার রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, "৫ম হতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ বর্বরতার কালরাত্রির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল যা ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল। এ বর্বরতা ছিল আদিম বন্য অবস্থা থেকে অধিকতর ভীতিজনক ও ভয়ংকর, কারণ এ ছিল একটি বিগলিত শবদেহ যা এক সময় মহান সভ্যতার ধারক হিসাবে বিরাজমান ছিল। এ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। যখন এ সভ্যতার উন্নয়ন পরিপূর্ণতা লাভ করে যেমন ইতালী ও গাউল (Gaul)- এর, তখন সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত, জঘন্য ও বিবর্ণ এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়।"[১৬০]

পাশ্চাত্য জগতের শাসক শ্রেণী সম্পূর্ণ নৈতিক বিচ্যুতির মধ্যে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এর অন্যতম কারণ ছিল মাত্রাতিরিক্তভাবে করারোপ, বাণিজ্যস্বল্পতা, কৃষিতে অবহেলা এবং ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা, নগরীর সৌকর্যময় ধবংসাবশেষ দ্বারা এর সত্যতা প্রতিপাদিত হয়। যা ছিল ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত এবং আর কখনও প্রাচীনকালের সাফল্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে না। সামাজিক শৃঙ্খলা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং মহান রোমক সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধবংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতে আধ্যত্মিক স্থবিরতাও লক্ষণীয় ছিল। শাইখ আবুল হাসান 'আলী নদভী বলেন, "হীন চরিত্র পাদ্রীদের হাতে মহান ধর্মসমূহ খেলার বস্তুতে পরিণত হয়। ধর্মকে তারা এমনভাবে দূষিত ও বিকৃত করে যে তা যেন আর ধর্ম হিসাবে চেনা যায় না। এ ধর্ম প্রবর্তকগণের যদি

---

১৫৭. *শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)*, ড. মজিদ আলী খান (ঢাকা: ই. ফা. বা., এপ্রিল ২০০৫), পৃ. ৪৩

১৫৮. প্রাগুক্ত

১৫৯. প্রাগুক্ত

১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

সশরীরে ফিরে আনা সম্ভবপর হত তাহলে তারা ধর্মকে আর চিনতে পারতেন না। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ায় মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য কোন বার্তা তাদের কাছে আর থাকত না।"[১৬১] ৬ষ্ঠ শতকের খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে সালে (Sale) লিখেছেন, "পাদ্রীদের এবং বিশেষ করে মূর্তিপূজা এমন এক কলংকজনক পর্যায়ে নেমে আসে যে বর্তমানে রোমের ক্যাথলিক ধর্মানুসরণকারীগণ যা চর্চা করেন তা পর্যন্ত অতিক্রম করে যায়। ইয়াহুদীরাও খুবই দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। 'শাইখ আবুল হাসান আলী নদভী' লিখেছেন, "ভন্ডামী, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা এবং উচ্চহারে সুদের ব্যবসা তাদের প্রকৃত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ক্লান্তিলগ্নে খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদীদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার ফলে তাদের মধ্যে বিরাজিত পুরনো অমূলক ভীতি নিরসনের কোন সুযোগ কাজে লাগান সম্ভবপর হয়নি।[১৬২]

প্রাচ্য জগত

পারস্য সাম্রাজ্য

তখনকার পরিচিত জগতের পূর্বাংশের উপর পারস্য সাম্রাজ্যের আধিপত্য বজায় ছিল। ক্ষমতা ও সামরিক শক্তির দিক দিয়ে যদিও তারা রোমক সাম্রাজ্যের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল তবুও তাদের নৈতিক অবস্থা ছিল আরও অধঃপতিত। ইরান এ পরিমাণ অনৈতিকতা ও পাপে পূর্ণ ছিল যে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় ইয়েযদেগার্দ (রাজত্বকাল ৪২০-৪৫৭ খ্রি:) স্বীয় কন্যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে এবং পরে তাকে হত্যা করে। বাহরাম চোবিস নামক আরেকজন সম্রাট এর বোনের সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল।[১৬৩] পারস্যের সম্রাটগণ তাদের বিখ্যাত 'কোসরো' [(Chosroe) (কিসরা)] উপাধি গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, তাদের শরীরে পবিত্র স্বর্গীয় রক্ত প্রবাহিত।' জনগণ তাদের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির দাবিকে মেনে নেয়, তাদের দেবত্বের প্রশংসা কীর্তণ করে এবং শপথ করে ঘোষণা দেয় যে সম্রাটগণ কোন অন্যায় করতে পারেন না। সম্রাটদের স্বর্গীয় আলো সকলের উপরে আপতিত আছে বলে প্রজাদেরকে বিশ্বাস করানো হত এবং সম্রাটদের ক্ষমতা ও কার্যকলাপ সাধারণ্যে প্রশ্নাতীত বলে বিবেচিত হত। আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী 'অতি মানুষ' হিসাবে ধরে নেয়া হত।

শাসক ও যাজকগণ ব্যতিত সমাজে মানুষের মধ্যে একাধিক সংখ্যক শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। জনজীবনে দু'টি সুস্পষ্ট শ্রেণী বিদ্যমান ছিল পেশাজীবী ও শ্রমিক। প্রফেসর আর্থার ক্রিষ্টেনসেন বলেন, "সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটি অপূরণীয় শূন্যতা বিরাজিত ছিল। সমাজের বিত্তবান সুবিধাভোগী শ্রেণীর সম্পত্তি সাধারণ মানুষের ক্রয়ের ব্যাপারে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সাসানী শাসনামলে এটা একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ছিল যে জন্মসূত্রে একজন নাগরিক যে পদমর্যাদা পাওয়ার অধিকারী তার বাইরে কোন উচ্চতর পদমর্যাদা লাভের উচ্চাশা সে করতে পারবে না। যে শ্রেণীতে যে জন্মগ্রহণ করেনি সে শ্রেণীর পেশা গ্রহণ করার অধিকার তার ছিল না। ইরানের সম্রাটগণ তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে রাষ্টীয় কোন পদে নিয়োগ দান করতেন না। সমাজে প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করা ছিল। পারস্যের অধিবাসীগণ তাদের জাতির জন্য গর্বিত ছিল। শাইখ আবুল হাসান আলী নদভী লিখেছেন, "ইরানীরা তাদের জাতির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিল। তারা নিজেদেরকে অবশিষ্ট মানব সমাজ থেকে পবিত্র, অধিকতর পূতচরিত্র ও মহৎ বলে মনে করত এবং ধারণা করত যে তারা

---

১৬১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১৬৩. প্রাগুক্ত

স্বাভাবিকভাবে অপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী। তারা প্রতিবেশী দেশ সমূহের জনগণকে ঘৃণা করত এবং তাদেরকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপনামে আখ্যায়িত করে অপমান করত।[১৬৪]

ইরানীরা ধর্মবিশ্বাসে পৌত্তলিক ছিল। তারা আগুনকে ঈশ্বরের আলো হিসাবে মনে করে তার পূজা করতে শুরু করে। শাইখ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "অতঃপর, অগ্নি উপাসকদের ধর্ম কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের একত্র মিশ্রিত পিন্ডাকার বিষয়ে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হত। মন্দিরের বাইরে ঘরে, ব্যবসাস্থলে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অগ্নি উপাসকগণ যা খুশী তাই করতে পারত। তাদের কোন আধ্যাত্মিক আদর্শ ছিল না, না ছিল নৈতিকভাবে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় যা ইরানের সামাজিক অথবা জাতীয় জীবনে খাপ খেতে পারে।"[১৬৫]

জরাথুষ্ট্রবাদ

বিখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা এবং একজন মিডীয় (Median) বাসী সংস্কারক জরাথুষ্ট্র (আনুমানিক ৬০০ খ্রি. পূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম জরাথুষ্ট্রবাদ ছিল পৌত্তলিকতাবাদের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। জরাথুষ্ট্রবাদীরা কখনও একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম লাভ করেনি। তাদের পবিত্র গ্রন্থ 'আভেস্তা' প্রাচীন অপ্রচলিত নীতিকথার সমষ্টি যা জরাথুষ্ট্র কর্তৃক কথিত বলে মনে করা হয়। এছাড়া এ গ্রন্থে উৎসর্গের স্তোত্র ও প্রার্থণা, যাজকীয় বিধিমালা এবং গীর্জার প্রার্থনার অনুষ্ঠানের বিধিমালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাচীনকালের হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে এ ধর্ম সম্পর্কিত।[১৬৬]

ভারত ও হিন্দুধর্ম

ভারতের বিষয় উল্লেখ করতে গেলে বলা যায় যে ইতিহাসে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে ৬ষ্ঠ শতাব্দীকে সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময়ে সকল প্রকার সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটে যা প্রতিবেশী দেশসমূহে তাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্যে বিস্তার লাভ করে। এ অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল দেবতা ও উপ-দেবতার আধিক্য, বর্ণপ্রথা এবং যৌণ উচ্ছৃঙ্খলতা। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদে ৩৩টি দেবতার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু হিন্দুরা ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ দেব-দেবীর পূজা করে। তাদের পূজিত বিষয়ের মধ্যে শিলা, খনিজ পদার্থ, গাছপালা ও লতাপাতা, নদী ও পর্বতমালা, জীব-জন্তু এবং এমনকি যৌনাংগ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। Dr. Gustave le Bon তার 'Les Civilisations de I'Inde' গ্রন্থে বলেন, "সকল মানুষের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায় ধর্মীয় উপাসনার জন্য দৃশ্যমান বস্তুর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি বোধ করে এবং যদিও বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় সংস্কারকগণ হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ প্রচলনের চেষ্টা করেছেন তবুও তা এক নিষ্ফল প্রচেষ্টায় সকল বস্তুগত বিষয়ের উপর পূজা-অর্চনা করে চলেছে। যা কিছু তার নিয়ন্ত্রণের বা জ্ঞানের বাইরে তাই তার চোখে পবিত্র ও স্বর্গীয় এবং তা তার কাছে পূজার যোগ্য। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দু সংস্কারকদের একেশ্বরবাদের দিকে ধর্মকে পরিচালনা এবং দেবতার সংখ্যা তিন-এ নামিয়ে আনার সকল প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। হিন্দু সমাজ তাদের কথা শুনেছে কিন্তু বাস্তবে তিন দেবতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে যতক্ষণ প্রতিটি বস্তুর ও প্রকৃতির বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে কোন দেবতাকে তারা খুঁজে না পেয়েছে।[১৬৭]

---

১৬৪. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৬৫. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৬৬. প্রাগুক্ত,

১৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

হিন্দু পুরানে দেব-দেবীদের নির্লজ্জ যৌনাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ নির্লজ্জ যৌন ক্রিয়াকলাপ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তারা লিঙ্গ (পুরুষের যৌনাঙ্গ) অর্থাৎ শিব দেবতার লিঙ্গের পূজার প্রবর্তণ করে এবং তা সারা ভারতে ছড়িয়ে দেয়। Dr. Gustave le Bon আরো লিখেছেন "হিন্দুরা প্রতিমা ও প্রতিকৃতি পূজার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। তাদের মন্দিরসমূহ এসব দিয়ে পরিপূর্ণ। এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে লিঙ্গ ও যোনি যা প্রকৃতির জন্মদায়ক ক্ষমতাকে প্রতীকীরূপে প্রকাশ মনে করে। এমন কি অশোক স্তম্ভকেও অনেক অজ্ঞ হিন্দু শিবলিঙ্গের প্রতিরূপ বলে মনে করে। খাড়া ও মোচাকৃতির সকল বস্তু তাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বিষয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, "হিন্দু সম্প্রদায়ের এমন একটি গোষ্ঠী আছে যাদের মধ্যে নিরাবরণ স্ত্রী-পুরুষের পূজা করার বিধান রয়েছে।[১৬৮]

ভারতের জাতিভেদ প্রথা

ভারতের সমগ্র হিন্দু সমাজ বর্ণভেদ প্রথায় বিভক্ত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম অর্থাৎ অনার্য জাতিসমূহের সাথে আট জাতির মিশ্রণরোধ করার জন্য বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে আর্যরা এ জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করে। প্রাচীনকালে হিন্দু (আর্য) সম্প্রদায়ের প্রদান নেতা 'মনু' তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মনুশাস্ত্র' তে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন জাতিতে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করেন।[১৬৯] নিম্নবর্ণিতভাবে তিনি জনগণের শ্রেণীকরণ করেন:

ক. ব্রাহ্মণ

তাদেরকে সমাজের উঁচু শ্রেণী ও মস্তিস্ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সকল বিদ্বান ব্যক্তি ও পুরোহিত এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমাজের অন্য শ্রেণীকে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করতে দেয়া হয় না।

খ. ক্ষত্রিয়

ঈশ্বরের বাহু থেকে তাদের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী ও শাসক শ্রেণী ক্ষত্রিয়দের নিয়ে গঠিত। এদের দায়িত্ব জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা, ভিক্ষাদান, নৈবেদ্য অর্পণ, বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকা।

গ. বৈশ্য

এ শ্রেণীর লোকেরা বাণিজ্য ও কৃষি কাজে রত থাকে। ঈশ্বরের উরুযুগল থেকে তাদের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। তাদের দায়িত্ব গবাদি পশুর সেবা (বিশেষ করে গাভী অর্থাৎ গো-মাতা), ভিক্ষাদান, নৈবেদ্য অর্পণ, বেদগ্রন্থ পাঠ এবং ব্যবসা ও কৃষিকাজ সম্পাদন।

ঘ. শুদ্র

সমাজের সবেচেয়ে নিম্নশ্রেণী হচ্ছে শুদ্র (অধিকাংশ স্থানীয় অনার্য অধিবাসী)। এদের দায়িত্ব হ'ল সারাজীবন উপরের তিন শ্রেণীর লোকদের সেবাদান। ঈশ্বরের পদযুগল থেকে তাদের সৃষ্টি হয়েছে বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। সমাজে তাদের মর্যাদা এত নীচুতে অবস্থিত যে উচ্চ শ্রেণীর কোন লোকের সাথে তাদেরকে বসতে পর্যন্ত দেয়া হয় না।[১৭০]

---

১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১৭০. প্রাগুক্ত,

তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

গুপ্ত রাজবংশের গৌরবময় শাসনের পর অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (রাজত্বকাল ৩৭৫-৩৮০) এর আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিশাল অঞ্চল শাসনাধীনে রেখে যখন গৌরবের শীর্ষে পৌঁছে, তখন রাজনৈতিকভাবে ভারত খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হতে শুরু করে। এভাবে ভারতীয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে।[১৭১]

চীন ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং দূর প্রাচ্য

খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে ভারতে একজন ব্যক্তি জন্ম লাভ করেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন বুদ্ধ (সিদ্ধার্থ গৌতম)। বুদ্ধদেব হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত কপিলাবস্তুর নিকটে নুম্বিনী গ্রামে ৫৬০ খ্রি. পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও বাল্যজীবনে তাঁকে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয়, কিন্তু তিনি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তণ করেন। এ ধর্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম। হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি। বুদ্ধের শিক্ষা বৈদিক হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব বলে ঘোষণা করলেন এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্ম বেদিক হিন্দুধর্মের কিছু কিছু মৌল বিশ্বাস যেমন 'আত্মার দেহান্তরিত হওয়া (জনাসন্তরবাদ), অহিংসা ও কর্মযোগ' আত্মস্থ করে এবং প্রতীমা পূজারও প্রবর্তন করেন। এরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত পক্ষে হিন্দুধর্মের উপরে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম খুব একটা জনপ্রিয় হতে পারেনি কারণ ব্রাহ্মণগণ এ ধর্মকে প্রথমে বেআইনী ঘোষণা করেন এবং অনতিকাল পরেই একে সমাজ থেকে বহিষ্কার করেন। H.G.Wells লিখেছেন, "কিছুকাল ধরে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে উন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদ-এর অসংখ্য দেবতা ও সীমাহীন বৈচিত্রপূর্ণ ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি বেড়ে উঠতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ সমাজ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে বর্ণবাদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মকে ভারত থেকে সমূলে উৎপাটন করে বহিষ্কার করতে সক্ষম হয়। ভারত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর যদিও বৌদ্ধধর্ম চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহে একটি জনপ্রিয় ধর্মে পরিণত হয় তবুও এ ধর্ম মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্বাসনে কিংবা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। দূর প্রাচ্যের অন্যান্য জাতিসমূহ বৌদ্ধধর্ম ও বর্বর পৌত্তলিকতার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করবে সে বিষয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। তারা তখনও সভ্যতার ক্রান্তিকালে অবস্থান করছিল। রাজনৈতিকভাবে চীনারা বরাবরই তাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহে লিপ্ত ছিল। লুই রাজবংশ শাসন ক্ষমতায় এলে তাং রাজবংশ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ৩০০ বছর ধরে চীন শাসন করে। জাপানে প্রথমবারের মত একজন সম্রাজ্ঞী রাজসিংহাসন অধিকার করেন। জাপানে তখন বৌদ্ধ ধর্মের কেবলমাত্র শিকড় অঙ্কুরিত হচ্ছিল এবং তা ক্রমান্বয়ে জাপানী ধ্যান-ধারণা ও আদর্শকে প্রভাবিত করতে থাকে।[১৭২]

বিশ্বের হতাশাজনক পরিস্থিতি

"শাইখ আবুল হাসান আলী নদভী তৎকালীন বিশ্বের সাধারণ অবস্থার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "সংক্ষেপে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে সমগ্র বিশ্বে এমন একটি জাতিও ছিল না যারা উঁচু নৈতিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত। এমন একটি সমাজও ছিল না যা ন্যায় বিচার, সাম্য ও সততার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

---

১৭১. প্রাগুক্ত,

১৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা একটি নেতৃত্বও ছিল না যা আল্লাহ তা'আলার মহান নবীগণের পবিত্র শিক্ষাকে মানসপটে তুলে ধরে। স্বাস্থ্যকর বা উন্নতি অর্জনকামী নেতৃত্বের একটি সার্বজনীন অভাব সর্বত্র বিরাজমান ছিল। আল্লাহর বাণী কলুষিত হয়ে পড়েছিল। চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত গভীর হতাশার মধ্যে গীর্জা ও উপাসনালয়সমূহ বর্ষণ মূখর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে বড়জোর জোনাকী পোকার মত ক্ষুদ্র আলোর সাথে তুলনীয় হতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান ও সৎকর্ম প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল এবং যারা মানুষকে আল্লাহর মহান গুণাবলীর মহিমান্বিত পথে পরিচালিত করতে পারেন সে নৈতিক শিক্ষক পাওয়া প্রায় দূর্লভ ছিল। বিশ্বব্যাপী এ অন্ধকার, হতাশা ও বিশৃংখলার মধ্যে পবিত্র কুর'আন নিম্নের চিন্তা উদ্রেককারী বাণী নিয়ে আগমন করে:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে।"[১৭৩]

এভাবে যখন সমগ্র মানবজাতি অত্যাচার ও নিগ্রহ, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা, পাপ ও কুসংস্কারের মধ্যে পড়ে গভীর আর্তনাদ করছিল অর্থাৎ সংক্ষেপে মানবতা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটপট করছিল তখন সর্ব শক্তিমান আল্লাহ মানব জাতিকে উদ্ধার ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাযিল করলেন মহাগ্রন্থ আল কুর'আন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন:

الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"আলিফ লাম রা। এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি (এর দ্বারা) মানব জাতিকে তাদের প্রতি পালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আনতে পার, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী একমাত্র প্রশংসার যোগ্য।"[১৭৪] সারকথা, সমগ্র পৃথিবীর নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান এত অধঃপাতে পর্যবসিত হয়েছিল যে, মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতি হস্তক্ষেপ ব্যতিত মানব জাতিকে এহেন সংকটকুল অবস্থা থেকে বাঁচানো যেত না। বিশ্বকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার জন্য একজন মহামানব ও একটি সুস্পষ্ট গাইড লাইন ছিল একান্ত কাম্য। যা ইতোঃপূর্বে কখনো এত তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি। পরিণতিতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত বিশ্ব ও মানব জাতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-কে মহাগ্রন্থ আল কুর'আন দিয়ে প্রেরণ করলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কুর'আন নাযিল শুরু

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা

মক্কাবাসীসহ পৃথিবীবাসীকে সত্যের প্রতি আহবান

আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুর'আনকে একই সময় সম্পূর্ণরূপে লিখে হযরত মুহাম্মাদ (স.)-কে দিয়ে এর বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে একটি বিশেষ জীবন-যাপন পন্থার দিকে আহবান জানাননি। বস্তুত তা আদৌ সে ধরনের কোন গ্রন্থ নয়। এতে গ্রন্থ প্রণয়নের পদ্ধতির চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু ও এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও আলোচনার অবতারণা করা হয়নি। অনুরূপভাবে সাধারণ বই পুস্তকের ধরন-ধারণও এতে পাওয়া যায় না। বস্তুত এর স্বরূপ এ যে, আল্লাহ তা'আলা আরবের মক্কা নগরে তাঁর এক প্রিয় বান্দাহকে পয়গাম্বরীর গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য নিযুক্ত

---

১৭৩. *আল কুর'আন*, ৩০:৪১

১৭৪. *আল কুর'আন*, ১৪:০১

করেছিলেন এবং তাঁর নিজ শহর ও নিজ গোত্র কোরাইশদের মধ্যেই এ দাওয়াতি কার্যের সূচনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কাজ শুরু করার জন্য প্রথমেই যেসব উপদেশের প্রয়োজন হয়েছিল, তাই দেখা হয়েছিল এবং তা প্রধানত তিন প্রকারের বিষয়বস্তু সমন্বিত ছিল।

প্রথম

পয়গম্বর নিজে এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে কিরূপে তৈরী করতে পারেন এবং তিনি কোন পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ করবেন সে সব বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হল।

দ্বিতীয়

প্রকৃত রহস্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য এবং নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সমাজের সাধারণ প্রচলিত ভুল ধারণাসমূহের প্রতিবাদ করা হল। কারণ এ ভুল ধারণার জন্যই তাদের জীবন যাত্রা অত্যন্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হচ্ছিল।

তৃতীয়

সঠিক ও নির্ভুল জীবন যাপন পন্থার দিকে আহবান এবং আল্লাহর দেয়া বিধানের মৌলিক চরিত্র ও নীতির বিশ্লেষণ করা হল; কারণ এর অনুসরণের মধ্যেই বিশ্বের এবং বিশ্বমানবতার চিরন্তন শান্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হিকমত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে রবের পথের দিকে আহবান

হযরত মুহাম্মাদ (স.) অবিশ্বাসী, ধর্মদ্রোহী, কপট বিশ্বাসী কাফিরদেরকে কিয়ামতের সম্ভাবনা ও অস্তিত্বের কথা, আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন মহাগ্রন্থ আল কুর'আন হতে পাঠ করে শুনানো, ধর্মকে খেলার সামগ্রী বানিয়ে পার্থিব জীবন গ্রহণ ইত্যাকার বিষয়ের ভয়ংকর পরিণতির কথা তাদেরকে বার বার বলা সত্ত্বেও যখন তারা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে বুঝতে চাচ্ছিল না- উপরন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে রাসূলরূপে অবিশ্বাস করতে লাগল, তখন আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত নাযিল করে হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে শান্তনা দেন এবং বলেন যে, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী হিসেবে প্রেরিত হননি। আপনি শুধু ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর নির্দেশ প্রচারকারী। সৎপথে আনয়ন করা আপনার ইচ্ছাধীন নয়। আপনি আল্লাহর পক্ষ হতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং পবিত্র আল কুর'আন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সুতরাং এ গ্রন্থের আলোকে যারা আমার আযাবকে ভয় করে না এবং যারা ধর্মকে খেলার সামগ্রী বানিয়েছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে তাদেরকে কুর'আনের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করুন। কুর'আনের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করার তাৎপর্য এ যে, তারা অসৎ কর্মের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হবে। অতঃপর মান্য করা না করা তাদের ইচ্ছাধীন। কুর'আনের বহুসংখ্যক আয়াতে একে বিশ্ববাসীর উপদেশ এবং উপদেশপত্র বলে উল্লেখ রয়েছে। নিম্নের আয়াতসমূহে আল্লাহ বলেন:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

"এরা যা বলে আমি তা সবচেয়ে ভাল জানি। আর তুমি তাদের উপর কোন জোর- জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং যে আমার ধমককে ভয় করে তাকে কুর'আনের সাহায্যে উপদেশ দাও।"[১৭৫]

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

"কুর'আন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।"[১৭৬]

---

১৭৫. *আল কুর'আন*, ৫০:৪৫

১৭৬. *আল কুর'আন*, ৬৮:৫২

أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا

"আল্লাহ তাদের জন্য এক কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ঈমান এনেছো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ।"[১৭৭]

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার রবের পথে ডাক এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর। তোমার রব, তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয়, তার সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যে সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ জানেন।"[১৭৮]

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

"আর তুমি পরিত্যাগ কর তাদেরকে, যারা নিজেদের দ্বীনকে গ্রহণ করেছে খেল-তামাশা রূপে এবং যাদেরকে প্রতারিত করেছে দুনিয়ার জীবন। আর তুমি কুর'আন দ্বারা উপদেশ দাও, যাতে কোন ব্যক্তি তার কৃতকর্মের দরুন ধ্বংসের শিকার না হয়, তার জন্য আল্লাহ ছাড়া নেই কোন অভিভাবক এবং নেই কোন সুপারিশকারী। আর যদি সে সব ধরনের মুক্তিপণও দেয়, তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এরাই তারা, যারা ধ্বংসের শিকার হয়েছে তাদের কৃতকর্মের দরুন। তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানীয় এবং বেদনাদায়ক আযাব, যেহেতু তারা কুফরী করত।"[১৭৯]

হিদায়াতের জন্য এ কুর'আনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং উপদেশ গ্রন্থ হওয়ার জন্য যে সমস্ত মহাগুণের প্রয়োজন কুর'আনে তার সবগুলোই রয়েছে- যেমন বিষয়গুলো উত্তম হওয়া তদুপরি তার ভাষা আরবী হওয়াতে যাতে তার প্রথম শ্রোতাবর্গ আরববাসীরা কারও সাহায্য ব্যতিত বুঝতে সক্ষম হন। অতঃপর তাদের সাহায্যে অন্যান্য লোকদের বুঝিয়ে দেয়া সহজ হয়। তদুপরি তার কোন বিষয় বস্তুর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। এতে বিন্দুমাত্র বক্রতা নেই। কুর'আনের ভাষা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর। আর কুর'আন অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে যাতে এতে বর্ণিত ঘটনাগুলি হৃদয়াঙ্গম করা সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন যাতে অবিশ্বাসীরা ঐ সমস্ত ঘটনা হতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কওম যখন আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করল না উপরন্তু তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করল তখন তিনি তাদেরকে আযাবে নিপতিত করেন, তাদেরকে মহাপ্লাবনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস (কেবলমাত্র ঈমানদারদের ছাড়া) করে দেন। এ ঘটনা হতে অবিশ্বাসীদের উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ- وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ- وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ- تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ- وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.

"এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও অস্বীকার করেছিল- অস্বীকার করেছিল আমার বান্দাকে আর বলেছিল, "এ তো এক পাগল" আর তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। তখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহবান

---

১৭৭. *আল কুর'আন*, ৬৫:১০

১৭৮. *আল কুর'আন*, ১৬:১২৫

১৭৯. *আল কুর'আন*, ০৬:৭০

Dhaka University Institutional Repository

করে বলেছিল, আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।" ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ, অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে। তখন নুহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চালিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।"[১৮০]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা নূহেও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কুর'আন থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ তা'আলা 'আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাদের অবাধ্যতার জন্য তিনি এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলেন। উক্ত ঝঞ্ঝাবায়ু 'আদ জাতিকে এমনভাবে উপড়িয়ে নিক্ষেপ করল যেন তারা উপড়ানো খেজুর বৃক্ষের ন্যায় হয়ে গেল। এ ঘটনা থেকে তাদেরকে উপদেশ গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ-

"আদ সম্প্রদায় সত্য অস্বীকার করেছিল, ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে, মানুষকে তা উৎখাত করেছিল উন্মুলিত খর্জুর কান্ডের ন্যায়। কী কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। কুর'আন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?"[১৮১]

আল্লাহ তা'আলা কুর'আন থেকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সামূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। সামূদ সম্প্রদায় নবীগণকে অবিশ্বাস করেছিল। সামূদ সম্প্রদায়ের মিথ্যা ও অহংকারের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা একজন মাত্র ফিরিশতার চিৎকার আপতিত করলেন। ফলে তারা এমন হয়ে গেল যেমন ক্ষেতের চতুর্পার্শ্বে তার সংরক্ষণের জন্য কাঁটার বেড়ার খন্ডসমূহ। ফল বাগান কিংবা গৃহপালিত পশুর হেফাজতের জন্য কাঁটা ইত্যাদি দ্বারা মানুষ যেমন বেড়া নির্মাণ করে দেয় এবং কিছু কাল পরে সেগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ বা টুকুরা টুকরা হয়ে যায়- তদ্রুপ উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেল। আরববাসীরা দিবা-রাত্রি এ ভয়ংকর ধ্বংসস্তুপকে দেখত, কাজেই এ উপমা ভালভাবে বুঝতে পারত। আর আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনুল কারিম থেকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য কুর'আনকে সহজ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ-فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ- أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ

"সামূদ জাতিও সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। অতঃপর তারা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তাহলে নিশ্চয় আমরা পথভ্রষ্টতা ও উম্মত্ততার মধ্যে পড়ব'। 'আমাদের মধ্য থেকে কি তার ওপরই উপদেশবাণী পাঠানো হয়েছে? বরং সে চরম মিথ্যাবাদী অহঙ্কারী'।"[১৮২]

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ-إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ- وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ-

"আগামী দিন তারা জানতে পারবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, অহঙ্কারী। নিশ্চয় আমি তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ উষ্ট্রী পাঠাচ্ছি। অতএব তুমি তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। আর

---

১৮০. *আল কুর'আন*, ৫৪:০৯-১৬

১৮১. *আল কুর'আন*, ৫৪:১৮-২২

১৮২. *আল কুর'আন*, ৫৪:২৩-২৫

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন সুনির্দিষ্ট। প্রত্যেকেই (পালাক্রমে) পানির অংশে উপস্থিত হবে।"[১৮৩]

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ-

"অতঃপর তারা তাদের সাথীকে ডেকে আনল। তখন সে উষ্ট্রীকে ধরল, তারপর হত্যা করল। অতএব আমার আযাব ও ভয় প্রদর্শন কিরূপ হয়েছিল? নিশ্চয় আমি তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম এক বিকট আওয়াজ, ফলে তারা শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত খোয়াড়ের মত হয়ে গেল।"[১৮৪]

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ-

"আর আমি তো কুর'আনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? লূতের কওম সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। নিশ্চয় আমি তাদের উপর কংকর–ঝড় পাঠিয়েছিলাম, তবে লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে শেষ রাতে নাজাত দিয়েছিলাম।"[১৮৫]

نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ- وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ- وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ

"আমার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ; এভাবেই আমি তাকে প্রতিদান দেই, যে কৃতজ্ঞ হয়। আর লূত তো তাদেরকে আমার কঠিন পাকড়াও সম্পর্কে সাবধান করেছিল, তারপরও তারা সাবধানবাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল। আর তারা তাঁর কাছে তাঁর মেহমানদেরকে (অসদুদ্দেশ্যে) দাবি করল। তখন আমি তাদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিলাম। (আর বললাম) আমার আযাব ও সাবধানবাণীর পরিণাম আস্বাদন কর।"[১৮৬]

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ-فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ-

"আর সকাল বেলা তাদের উপর অবিরত আযাব নেমে আসল। 'আর আমার আযাব ও সাবধানবাণীর পরিণাম আস্বাদন কর'। আমি তো কুর'আনকে সহজ করে দিয়েছি, উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?"[১৮৭]

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ- كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ- أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ-

"ফির'আউন গোষ্ঠীর কাছেও তো সাবধানবাণী এসেছিল। তারা আমার সকল নিদর্শনকে অস্বীকার করল, অতএব আমি মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমানের মতই তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তোমাদের (মক্কার) কাফিররা কি তাদের চেয়ে ভাল? না কি তোমাদের জন্য মুক্তির কোন ঘোষণা রয়েছে (আসমানী) কিতাবসমূহের মধ্যে?"[১৮৮] আল্লাহ তা'আলা কুর'আন থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য লূৎ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথা বর্ণনা করেছেন। লূত সম্প্রদায় জঘন্য পাপকার্যে লিপ্ত ছিল। হযরত লূত (আ.) তাদেরকে আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তারা হযরত লূতের কথা শুনল না উপরন্তু হযরত লূৎ (আ.) এর নিকট আল্লাহর ফিরিশতাগণ অতিথির আকৃতিতে আসলে লূত সম্প্রদায় সুদর্শন ফিরিশতাদেরকে বালক আকৃতিতে দেখে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ফিরিশতাদেরকে

---

১৮৩. *আল কুর'আন*, ৫৪:২৬-২৮

১৮৪. *আল কুর'আন*, ৫৪:২৯-৩১

১৮৫. *আল কুর'আন*, ৫৪:৩২-৩৪

১৮৬. *আল কুর'আন*, ৫৪:৩৫-৩৭

১৮৭. *আল কুর'আন*, ৫৪:৩৮-৪০

১৮৮. *আল কুর'আন*, ৫৪:৪১-৪৩

তাদের হাতে তুলে দিতে লূত (আ.) কে চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে আল্লাহর আযাব তাদের উপর নিপতিত হয় এবং লুৎ সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করে দেন। এ জঘন্য কাজের জন্য আল্লাহ আযাবের নিদর্শন রেখে দেন এবং তা হতে উপদেশ গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে এবং কুর'আনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য গ্রন্থ হিসেবে সাব্যস্ত করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"আমি কুর'আনকে সহজ করে দিয়েছে উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি?"[১৮৯]

মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান

গোটা বিশ্বের অধিপতি মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে নবুওয়াতের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর উপর মহাগ্রন্থ আল কুর'আন নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা, জ্ঞানবিজ্ঞানের মৌলিকত্ব ও যাবতীয় তথ্যাদি। মানুষ আল কুর'আনের অনুসরণে জাগতিক জীবনে পাবে পরম শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং পরকালিন জীবনে পাবে অনন্ত জীবনের সন্ধান এটা বিশ্বমানবতার জন্য Complete code of life তথা শ্বাশত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আল কুর'আন মানুষের ইহকালও পরকালে শান্তির দিক নির্দেশনার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল। এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন কিংবা বাতিল করার কোন ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। এ সংবিধানের প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ সংবিধানের সংরক্ষকও তিনিই। মানুষ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ন্যায় বিচার, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাকার যে সকল বিষয়ে সমস্যার সম্মুখিন হয় তাদের মধ্যে এমন কোন দিক নেই যার সমাধান আল কুর'আনে নেই। বিজ্ঞানীদের জন্য অসংখ্য গবেষণার বিষয় রয়েছে এতে। কুর'আনে বর্ণিত আদল, ইহসান ও ই-তাউযিল-কুরবা (নিকটাত্মীয়দের দান) যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং অসৎকর্ম যদি মানব চরিত্র হতে দূর করা যায় তাহলে মানব জাতি অনুভব করতে পারবে অমীয় স্বর্গীয় সুখ। সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে অনাবিল শান্তি।

আদল (সু-বিচার)

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন আদল তথা সুবিচার, সমদর্শিতা ও ন্যায় পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে অন্য কোন ধর্মে বা ধর্মগ্রন্থে তার দৃষ্টান্ত বিরল। মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন ন্যায়দন্ড। যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর ন্যায়দন্ডে। আর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর এবং মানদন্ডের ক্ষতি সাধন কর না।"[১৯০]

ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ব্যাপারে এ নীতি সর্বদাই সমভাবে প্রযোজ্য। যেখানেই আদল অর্থাৎ সুবিচার ও সমদর্শিতার অভাব সেখানেই অশান্তি কলহ মূর্ত হয়ে দেখা দেয় এবং মানবকে স্বভাবতই বিদ্রোহী ও বিপথগামী করে তোলে যার উদাহরণ আজকের সমাজে ভুরি ভুরি।

---

১৮৯. *আল কুর'আন*, ৫৪:৩২

১৯০. *আল কুর'আন*, ৫৫:০৭-০৯

Dhaka University Institutional Repository

ইহসান (সৎকর্ম)

সৎকাজ, সহানুভূতিমূলক কাজ অথবা প্রতিদানবিহীন কাজ। সাধারণত: সৎকাজের বিনিময়ে সৎকাজ, সদাচারের বিনিময়ে সদাচার এবং কার্যানুযায়ী প্রতিদান প্রদান করাকে আদল বা সুবিচার বলে। তা সাধারণ শ্রেণীর সৎকাজ। কিন্তু ইহসান বা সহানুভূতিমূলক সৎকাজের স্থান তার অনেক উর্ধ্বে। যে সকল সৎকর্ম আন্তরিক উচ্চ প্রেষণার প্রভাবে সম্পন্ন করা হয় এবং বিনিময় ও প্রতিদান প্রাপ্তির পরিকল্পনার সাথে যার কোনই সম্পর্ক নেই তাকেই সাধারণত: ইহসান বলে অভিহিত করা হয়। হযরত রাসূলে আকরাম (স.) স্বয়ং জিব্রাঈল (আ.)-র প্রশ্ন "আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন।" এর জবাবে বলেছিলেন, "ইহসান হচ্ছে তুমি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি আল্লাহকে দেখতে না-ও পাও তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।"[১৯১]

ই-তাউযিল-কুরবা (নিকটাত্মীয়কে দান করা)

আত্মীয় স্বজনদেরকে দান করা। তা অতি উন্নত সৎকর্ম। আদল ও ইহসান অর্থাৎ সুবিচার ও সহানুভূতির পরীক্ষায় সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ না হলে কেউ আন্তরিকতার সাথে এ সৎকর্ম করতে পারে না। সমাজের কিছুলোক এমন রয়েছে এরা সময় সময় পার্থিব নাম কেনার জন্য লক্ষ কোটি টাকা দান করলেও অভাবগ্রস্থ আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র প্রতিবেশী এবং অধিনস্থ অনুচরগণ এদের কাছ থেকে দূর্ভাগ্যবশতঃ অতি অল্পই সাহায্য সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা আহকামুল হাকিমীন আত্মীয় স্বজনদেরকে উদারতার সাথে দান করাকে অতি উচ্চস্তরের সৎকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। উপরোক্ত বিষয়গুলো যদি কুর'আনের আলোকে মানবজীবনে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে মানব জীবনে কোন অশান্তি বিরাজ করতে পারে না।

মুনকার (অন্যায়কর্ম)

অন্যায়কর্ম, অগ্রাহ্য, দুস্কার্য; সুনীতি, সদাচার, সুশাসন, সামাজিক সভ্যতা, পর্দা, পবিত্রতা ও শান্তি শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা এর বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি যাবতীয় স্বেচ্ছাচারমূলক কর্মই এর অন্তর্ভুক্ত। তা দুস্কার্যের চরম বিকাশ। বর্তমান সময়ে এ ধরনের ধর্মদ্রোহীতা, সমাজদ্রোহীতা, স্বেচ্ছাচার ও শয়তানী প্রবৃত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে মানবজাতির অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করছে। মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে যদি কুর'আনের নির্দেশিত পথে এসব অপকর্মগুলো পরিহার করা যায় তা হলে মানব জীবন অত্যন্ত সুখী ও শান্তিময় হয়ে উঠত। পৃথিবীতে নেমে আসত অনাবিল শান্তি। সুতরাং মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই, যার সম্বন্ধে কুর'আনে উল্লেখ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"এ কুর'আন মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা এবং নিশ্চিতবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"[১৯২]

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"অতঃপর তাঁর রব তাঁকে উত্তমভাবে কবুল করলেন এবং তাঁকে উত্তমভাবে গড়ে তুললেন। আর তাঁকে যাকারিয়্যার দায়িত্বে দিলেন। যখনই যাকারিয়্যা তাঁর কাছে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করত, তখনই তাঁর নিকট

১৯১. *সহীহ বুখারী*, বাবু সু'আলি জিব্রাঈল, হাদিস নং. ৪৮; *সহীহ মুসলিম*, বাবু বায়ানিল ঈমানি ওয়াল ইসলামি, হাদিস নং. ০৯, আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত

১৯২. *আল কুর'আন*, ৪৫:২০

খাদ্যসামগ্রী পেত। সে বলত, 'হে মারইয়াম, কোথা থেকে তোমার জন্য এটি'? সে বলত, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান বিনা হিসাবে রিয্ক দান করেন।"[১৯৩]

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার নিস্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতেছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।[১৯৪]

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"আর আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।"[১৯৫]

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

"আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী এবং দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি কওম। আমি কিতাবে কোন ত্রুটি করিনি। অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।"[১৯৬]

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.

"নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।"[১৯৭]

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

"আর আমি এই কুর'আনে মানুষের জন্য সকল প্রকার উপমা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্ককারী।"[১৯৮] আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনে ফাহেশা কাজ থেকে দূরে থাকার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। ফাহেশা কাজ হলো অশ্লীলতা ও লজ্জাকর কাজ। যাবতীয় কু-কথা, কুকার্য্য, দুর্নীতি, ব্যভিচার ও অন্যায় কার্যই এর অন্তর্ভুক্ত। এ অশ্লীলতার দ্বারাই মানুষের সাথে অন্যান্য ইতর প্রাণীর পার্থক্য হয়ে থাকে।

মানব জাতিকে অন্ধকার হতে আলোর পথে আনয়ন

ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের জমাট বাধা গাঢ় অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর উপর কুর'আন নাযিল করেন। রাসূল (স.) এর ধর্মনীতি, স্বভাব

১৯৩. *আল কুর'আন*, ০৩:৩৭

১৯৪. *আল কুর'আন*, ০৫:৪৮

১৯৫. *আল কুর'আন*, ২৭:৭৫

১৯৬. *আল কুর'আন*, ০৬:৩৮

১৯৭. *আল কুর'আন*, ০৪:১০৫

১৯৮. *আল কুর'আন*, ১৮:৫৪

চরিত্র, প্রত্যাদেশ, অলৌকিকতা ও জীবনের আদর্শ তাঁর নবুওয়াতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ রাসূল (স.) ছাড়া একাধারে সমস্ত নবীর গুণ গরিমা, শক্তি ও সদগুণের বিকাশ আর কোন রাসূলের জীবনেই পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি ছিলেন পরশ পাথরের মত। তারপর কুর'আনের আদেশ উপদেশ বিধি নিষেধ ও শিক্ষা দীক্ষা মানব জীবনের পক্ষে সমুজ্জল জ্যোতি সাদৃশ্য। কারণ অধর্মের উপর ধর্মের এবং অসত্যের উপর সত্যের এরূপ সুস্পষ্ট বিজয়বাণী আর কোন ধর্মগ্রন্থে উচ্চারিত হয়নি। যুগ যুগান্তর ধরে ধর্মজ্ঞান ও নীতি উপদেশ বিতরণে অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ যা করতে পারেনি পবিত্র কুর'আন মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে সে অসাধ্য সাধন করেছে। পবিত্র কুর'আনের স্বর্গীয় জ্যোতির প্রভাবে জগতের যাবতীয় অধর্ম ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরীত হয়ে সত্যের সমুজ্জল কিরণে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং অংশীবাদী ত্রিত্ববাদী পৌত্তলিক ও জড়পূজক জাতিদের একত্ববাদের মিলন বিশ্বাস ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে। একমাত্র কুর'আনের বদৌলতে কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত আরব জাতি আলোর সন্ধান পেয়েছিল।[১৯৯] এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতসমূহে আল্লাহ ঘোষণা করেন:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালবাসে। আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"[২০০]

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

"আলিফ লাম রা। এ কিতাব, এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ।[২০১]

সকল সমস্যার সমাধান

আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর সমস্ত বিষয়ই পরিজ্ঞাত আছেন। বিশ্বজগতের গুপ্ত-ব্যক্ত কোন বিষয়ই তাঁর অজানা নেই এবং তা সমস্তই সমুজ্জ্বল গ্রন্থ লাওহে মাহফুজে অর্থাৎ সুরক্ষিত ফলকে সংরক্ষিত রয়েছে। খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তির ধারণা কুর'আনের উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও সদুপদেশসমূহ তাওরাত ও ইঞ্জিল হতে পরিগ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এটা মোটেই সত্য নয়। যদি অবিশ্বাসীদের এ দাবি সত্য হত, তাহলে অসংখ্য বিষয়ে আধুনিক তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃত শিক্ষার তীব্র প্রতিবাদ কখনই কুর'আনে পরিদৃষ্ট হতো না। আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ নবীগণের আদর্শ ও তাদের প্রচারিত ধর্মনীতি সম্বন্ধে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান জাতির বর্তমান বাইবেলে যে সমস্ত ভ্রান্তমত ও বিকৃত শিক্ষা সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং সত্য ধর্মের স্বরূপ ও রাসূলগণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান জাতির পরস্পরের মধ্যে যে পর্বত প্রমাণ বিরোধসমূহ বিদ্যমান রয়েছে পবিত্র কুর'আনের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ জলদগম্ভীর স্বরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মিমাংসা করে দিয়েছে। এ কুর'আনের দ্বারা ভ্রান্ত ইয়াহুদী ও বিপথগামী খ্রিষ্টান জাতির জ্ঞান চক্ষু উম্মিলিত না হলেও বিজ্ঞানীগণের জন্যও এ স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ নিশ্চয় সুপথ ও করুণা স্বরূপ। সুতরাং ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানেরা এখন এটা বিশ্বাস না করলেও সে মহা বিচারের দিন মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় প্রতিপালক স্বীয় সুবিচারের দ্বারা অবশ্যই তাদের মধ্যে সমস্ত বিষয়ের

১৯৯. এম এ সালাম, *মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে আল কুর'আন* (ঢাকা: সেরা লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ২০০৩), পৃ. ৭২

২০০. *আল কুর'আন*, ৫৯:০৯

২০১. *আল কুর'আন*, ১৪:প্রাগুক্ত

মিমাংসা করে দিবেন এবং সে দিনই তারা এর সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। কিন্তু তখন সেই অনুভূতি তাদের কোন কাজে আসবে না।[২০২] নিম্নের আয়াতসমূহে আল্লাহ বলেন:

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ.

"আর আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। নিশ্চয় এ কুর'আন তাদের কাছে বর্ণনা করছে, বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে বিতর্ক করে তার অধিকাংশই। আর নিশ্চয় এটি মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। নিশ্চয় তোমার রব নিজের বিচার-প্রজ্ঞা দ্বারা তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন; আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। অতএব আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর; কারণ তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর অধিষ্ঠিত আছ।"[২০৩]

ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা

পবিত্র কুর'আন নাযিল হওয়ার পর পৌত্তলিকদের অধর্ম অনাচার ও অত্যাচার অবিচারমূলক অসত্যের যুগ শেষ হল। সত্যের সম্মুখ হতে অসত্যকে অবশ্যই অন্তর্হিত হয়ে এবং অধর্মের উপর ধর্মের বিজয় সিংহাসন এভাবেই চিরকাল প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন সত্য অর্থ মুহাম্মাদ (স.) ও তৎ প্রবর্তিত ইসলাম এবং তাঁর প্রতি নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কুর'আন। আর অসত্য অর্থ মানবের ভ্রান্তি কুসংস্কার ও তজ্জনিত অংশীবাদিতা পৌত্তলিকতা প্রভৃতি। বস্তুত কুর'আন নাযিল হওয়ার পর কুর'আনের আলোকে সমস্ত হিংসা, হানাহানি, অধর্ম, কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিদূরিত হয়ে অনাবিল শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন:

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

"নিশ্চয় আল কুর'আন মিমাংসাকারী বাণী এবং তা নিরর্থক নহে।"[২০৪]

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুল্‌ম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করে থাকে।"[২০৫]

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"বল সত্য এসেছে মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যাতো বিদূরিত হবারই।"[২০৬]

ইনসাফ বা ন্যায়বিচার ভিত্তিক ব্যবস্থা

আল কুর'আন এসেছে মূলত মানব জাতিকে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার ভিত্তিক বিচার ফয়সালা করার দিক নির্দেশনা দানের জন্য। এর বিচার ফয়সালার নমুনা নিম্নরুপ:

ক. কোন গোষ্ঠির একজন বা কয়েকজন কোন দোষ করলে তা সেই গোষ্ঠির সকলের উপর চাপানো যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "কেউ অন্য কারো ভার গ্রহণ করবে না।"[২০৭]

---

২০২. *মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

২০৩. *আল কুর'আন*, ২৭:৭৫-৭৯

২০৪. *আল কুর'আন*, ৮৬:১৩-১৪

২০৫. *আল কুর'আন*, ১০:৪৪

২০৬. *আল কুর'আন*, ১৭:৮১

২০৭. *আল কুর'আন*, ০৬:১৬৪

তাছাড়া ঘটনা ভাল করে না জেনে রায় দেয়ার প্রবণতাও পরিহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন সত্যত্যাগী তোমাদের নিকট বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করবে যাতে অজ্ঞতাহেতু কোন কওমকে আঘাত না কর, পরে তোমাদের কৃতকর্মে অনুতপ্ত না হও।"[২০৮]

আমাদের কথাবার্তায় ও আচরণে ভারসাম্যপূর্ণ, সুবিবেচক ও উদার হতে হবে। অতিশয়োক্তি বা ত্রাস সৃষ্টিকারী কথা পরিহার করতে হবে।

খ. একগুঁয়েমির দ্বারা একগুঁয়েমি, গোড়ামীর দ্বারা গোড়ামী এবং অপকর্মের দ্বারা অপকর্মের মোকাবিলা করার পথ পরিহার করতে হবে। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

"ভাল ও মন্দ সমান নয়। যা উৎকৃষ্ট তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করুন, ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা আছে সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"[২০৯]

আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করা

ইসলামের দেওয়ানী আইন সব মানুষের সাথে ন্যায়-নীতি ও হকের ভিত্তিতে আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। ফৌজদারী আইনেও সকলের জন্য একই রকম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। যে অত্যাচার, সন্ত্রাস ও বাড়াবাড়ি করে তাকে শায়েস্তা করা হয়। হত্যাকারী জ্ঞানী হোক বা মূর্খ হোক, নিহত ব্যক্তি ধনী বা গরীব হোক, মযলুম আরব হোক বা অনারব হোক, প্রাচ্যবাসী হোক বা পাশ্চাত্যবাসী সবাই আইনের চোখে সমান।

আল কুর'আন জাতি, ধর্ম, বর্ণ তথা সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদকে স্বীকার করে না। তাই আল কুর'আন যেমন সর্বত্র আইনের স্বীকৃতি দিয়েছে তেমনি বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতাও প্রতিষ্ঠিত করেছে। আল্লাহর নির্দেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রেখো যে, তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[২১০]

আল্লাহ আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনও সুবিচারের ক্ষেত্রে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের

---

২০৮. *আল কুর'আন*, ৪৯:০৬

২০৯. *আল কুর'আন*, ৪১:৩৪

২১০. *আল কুর'আন*, ০৪:৫০

নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।"[২১১] ন্যায়-নিষ্ঠ বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতিই মূলত: পৃথিবীতে অশান্তির অন্যতম কারণ।

অমুসলিমদের অধিকার দান

আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমের মাধ্যমে শুধু মুসলমানদের জীবনকেই সম্মানিত করেননি। বরং আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার জীবনকেই সম্মানিত করেছেন। কোন মুসলিমের হাতে অন্যায়ভাবে কোন জিম্মি নিহত হলে সে মুসলমানের জন্য জান্নাত হারাম। নবী কারিম (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন জিম্মিকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।"[২১২] "যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমকে হত্যা করল সে কখনো জান্নাতের সুগন্ধি ও পাবে না।"[২১৩] একবার কোন এক যুদ্ধে মুশরিকদের কতিপয় শিশু আক্রমণের পাল্লায় নিহত হয়। এতে রাসূল (স.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কোন কোন সাহাবী আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরাতো মুশরিকদের সন্তান। তিনি বললেন : "মুশরিক শিশুরাও তোমাদের চাইতে উত্তম। সাবধান! শিশুদের হত্যা করো না, সাবধান! শিশুদের হত্যা করো না। প্রতিটি জীবন আল্লাহর নির্ধারিত ফিৎরাতে (সৎ স্বভাব নিয়ে) জন্ম গ্রহণ করে থাকে।"[২১৪] হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নববী যুগে এক ব্যক্তির মৃত দেহ পাওয়া গেল, কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। মহানবী (স.) এতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন: "হে লোক সকল! ব্যাপার কি আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে মানুষ নিহত হচ্ছে এবং তার হত্যাকারীর পরিচয় মিলছে না। একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য আসমান জমীনের সমগ্র সৃষ্টিও যদি একত্রিত হয়ে যায় তবুও আল্লাহ এদের সকলকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।"[২১৫]

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার নজিরবিহীন ঘটনা থেকে আমরা যথার্থই অনুমান করতে পারি যে, মানুষের প্রাণের মূল্য এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের অনুসৃত কর্মপন্থা ছিল কত উন্নত। যে কাফিররা মদীনায় মুসলিমদেরকে আক্রমণ করার জন্য সুদূর মক্কা থেকে ছুটে আসল মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন বদর প্রান্তরে দুই পক্ষে তুমুল লড়াই হল। কাফিরদের ৭০জন মুসলিমদের হাতে বন্দি হল। আল্লাহর রাসূল (স.) তাদেরকে নামে মাত্র মুক্তিপণের মাধ্যমে ছেড়ে দিলেন। এমনকি যারা মুক্তিপণ দিতে সম্পূর্ণ অপারগ ছিল তাদের উপর আদেশ জারি করলেন যে, প্রতিজন ১০ জন মুসলিম বাচ্চাকে একটি নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত শিক্ষাদানের বিনিময়ে মুক্তি পাবে। আল্লাহর রাসূলের এ নব ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে এ বিষয়টিই সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলাম ও কুর'আন একমাত্র মানবতার কল্যাণে। মক্কা বিজয়ের পর কাফিরদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। তাদের অন্যায় নির্ভর রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটল। মহানবী (স.) যখন মক্কায় (ফাতহে মক্কার দিন) প্রবেশ করেছিলেন সেখানে তার প্রাণের শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধীরা অবস্থান করছিল। এখানে সে সব লোক বাস করত যারা প্রতি পদে তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে অমানবিক কষ্ট দিত। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হযরত সুমাইয়া (রা.)-র মত অবলা পবিত্রা মহিয়সী রমণীকে নির্মমভাবে হত্যা করল। নবী কারিম (স.)-কে পরিবারের মুসলিম সদস্যদেরসহ তিনটি বৎসর আবু তালেব গিরি সংকটে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। তাঁকে হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছিল, এমনকি তাঁকে তাঁর জন্মভূমি মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল, তিনি মদীনায় আশ্রয় নিলেন সেখানেও তাঁকে শান্তিতে

---

২১১. *আল কুর'আন*, ০৫:০৮

২১২. *সুনানু আন নাসাঈ*, বাবু তা'জীমি ক্বাতলিল মা'আহাদ, হাদিস নং. ৪৬৬৮ ; *সুনানু আততিরমিযী*, বাবু মা জা'আ ফীমান ইয়াক্বতুলু নাফসান, হাদিস নং. ১৩২৩ (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত),

২১৩. *সহীহ বুখারী*, বাবু ইসমু মান ক্বাতালা মু'আহাদান, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২০৩০

২১৪. *মুসনাদু আহমদ*, বাবু হাদিসু আসাদ ইব্ন সারী'ঈ (রা.), প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৫০৩৭

২১৫. তাবারানী, উদ্ধৃত, *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

বসবাস করতে দেয়নি। তারা মদীনার উপর বার বার হামলা চালিয়েছিল। বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধে তারা রাসূলে কারিম (স.) এর নিবেদিত প্রাণ অনেক সাথীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল এবং স্বয়ং তাঁকেও মারাত্মকভাবে আহত করেছিল।

ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরাহ পালনে বাধা দিয়ে তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেদিন রাসূল (স.) এর প্রিয় চাচা হযরত হামযাহ (রা.)-র হত্যাকারী ওয়াহশী, তাঁর বক্ষ ফেড়ে কলিজা চর্বণকারিনী হিন্দা, তলোয়ার দিয়ে রাসূল (স.) এর মাথায় আঘাতকারী ইকরামা ইব্ন আবি জাহল সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া এদের মত অসংখ্য ইসলামের দুশমন সেখানে বর্তমান ছিল। মহানবী (স.) আজ তাদের এক একটি অপকর্মের পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হওয়া সত্যেও তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ফরমান জারি করেন:

১. যারা অস্ত্র সমর্পণ করবে তাদেরকে হত্যা করবে না।
২. যে ব্যক্তি কা'বা গৃহে অবস্থান নিবে তাকে হত্যা করবে না।
৩. যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নিবে তাকে হত্যা করবে না।
৪. যে ব্যক্তি নিজের গৃহে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তাকে হত্যা করবে না।
৫. যে ব্যক্তি হাকিম ইব্ন হিযামের বাড়ীতে অবস্থান নিবে তাকে হত্যা করবে না।
৬. পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করবে না।
৭. আহত ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।

মক্কা মুয়ায্যামায় তিনি ক্ষমা ও অনুগ্রহের যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এটাই কুর'আনি দিক নির্দেশনা। পরবর্তিকালে এটাই ইসলামের যুদ্ধ নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায় হয়ে আছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত এ নীতিই বলবত থাকবে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সিরিয়া, ইরাক, ইরান, মিশর ও রোমের যত অঞ্চল বিজিত হয়েছিল সেগুলোতে জয়লাভের পর খুন-খারাবী ও রক্তপাত পরিহার করা হয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত 'উমর ফারূক (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) তাঁদের সেনাধ্যক্ষ ও প্রাদেশিক গভর্ণরদেরকে এ প্রসঙ্গে যে নির্দেশনা ও ফরমান জারী করেছিলেন সেগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবেই অনুমিত হয় যে, এসব বিজয়ের উপর মক্কা বিজয়ের সাধারণ ক্ষমার কার্যকারী প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[২১৬]

২১৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

মূলত শান্তি বলতে বুঝায় স্থিরতা, প্রশান্তি, দুশ্চিন্তাহীনতা, হিংসা-মারামারি ও শত্রুতা না থাকা ইত্যাদি।[২১৭] ইংরেজীতে শান্তিকে বলা যেতে পারে peace, absence of passion, satisfaction, gratification, welfare, prosperity, comfort, happiness ইত্যাদি। এর আরবী ইসলাম। আর ইসলাম শব্দটি নির্গত হয়েছে 'সালামুন' (سلم) ধাতু থেকে। যার আরেক অর্থ 'সন্ধি', 'সমৃদ্ধি'। এ শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকেই আল কুর'আন আহবান জানিয়েছে ঈমানদার লোকদেরকে। আল কুর'আনের ঘোষণা:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে (শান্তির মধ্যে) প্রবেশ করো।"[২১৮]

আল কুর'আন যে মানুষকে শান্তির দিকে ডাকে ও হাতছানি দেয় তার উজ্জল দৃষ্টান্ত মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের উপরোল্লিখিত আয়াত। আর আজকের শত্রুও যদি সন্ধি ও সন্ধির পরিণতিতে সমৃদ্ধির জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তবে তার সাথে সন্ধির হাত মিলাতে দ্বিধা করা যাবে না। আল কুর'আনে আরো বলা হয়েছে:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

"শত্রুও যদি শান্তি ও সন্ধি-সমৃদ্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তাহলে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও।"[২১৯]

কুর'আনের চিরন্তন আহবান হচ্ছে শান্তি রক্ষার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। এমনকি পারিবারিক ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পরিবেশেও শান্তি-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা আল কুর'আনই উপস্থাপন করেছে। কেননা তাই হচ্ছে বৃহত্তর পরিবেশের প্রাথমিক স্তর। যেমন পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে: والصلح خير "সন্ধি-সমৃদ্ধিই সর্বোত্তম ও সর্বাধিক কল্যাণের বাহক।"[২২০]

'ইসলাম' পরিভাষাটির অর্থ আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা। আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা পার্থিব জীবন ও আখিরাতে শান্তির পূর্বশর্ত। আর এ আত্মসমর্পণের প্রতিফল হলো

---

২১৭. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত,

২১৮. *আল কুর'আন*, ০২:২০৮

২১৯. *আল কুর'আন*, ০৮:৬১

২২০. *আল কুর'আন*, ০৪:১২৮

শান্তি।[২২১] 'ইসলাম' পরিভাষার মূল শব্দ হলো سلم (সিলমুন) বা 'সিন, লাম, মীম'। 'সিন' দ্বারা সালামত বা সুস্থতা, শান্তি, স্বস্তি, শালীনতা ইত্যাদি বোঝায়। 'লাম' দ্বারা 'লিনাত' বা নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য ইত্যাদি বোঝায়। আর 'মীম' দ্বারা বোঝায় মহব্বত বা ভালবাসা, সম্প্রীতি, প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি। সুতরাং 'ইসলাম' শব্দের মাঝেই লুকিয়ে আছে শান্তি, স্বস্তি, সুস্থতা, সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য, নম্রতা, বিনয়, পারস্পারিক ভালবাসা, সম্প্রীতি ইত্যাদি মানবীয় গুণ, যা মানুষকে প্রকৃত 'মানুষ' হতে শেখায়।[২২২]

মুসলিমগণ শান্তিপ্রিয় জাতি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে প্রতিদিন বহুবার নিজের ও বিশ্বমানবের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন তারা। প্রথম দর্শনেই তারা একে অন্যকে সম্ভাষণ করে সালাম দিয়ে তথা পরস্পরের শান্তি কামনা করে। ইসলাম নির্দেশিত সালাম 'আসসালামু আলাইকুম' সরাসরি শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জড়িত। এর অর্থ হলো "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" এ যেন এক ঐতিহাসিক শান্তির ঘোষণা। একবার একজন সাহাবী মহানবী (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন: اي الاسلام خير "ইসলামে কোন আচরণটি সর্বোত্তম?" জবাবে মহানবী (স.) বললেন: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف- "অপরকে খাবার খাওয়াবে এবং তুমি চেনো আর না-ই চেনো সকলকে 'সালাম' দিবে।"[২২৩] 'সালাম' এত উত্তম হওয়ার কারণ হলো এটি শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এছাড়া সামাজিকভাবে সালাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনেকগুলো উপকার রয়েছে। যথা:

১. এতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত আছে। এর দ্বারা রাসূল (স.) এর নির্দেশও পালন করা হয় এবং সওয়াবও পাওয়া যায়। তাছাড়া এটি ইসলামী আচরণের অন্যতম নিদর্শন।
২. এতে সৌহার্দ্য প্রকাশ পায়।
৩. এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের ওয়াদা রয়েছে।
৪. এতে অন্য মুসলিম ভাইয়ের অধিকার আদায় হয়।
৫. এটি সার্বজনীন অভিবাদন পদ্ধতি এবং ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সকাল-বিকাল সর্বক্ষেত্রে ও সর্বযুগেই মানানসই।
৬. এটি মুসলিমগণের ঐক্য, ভালবাসা ও পারস্পারিক কল্যাণ কামনার প্রতীক।
৭. এটি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করার অন্যতম উপায়।

উপরোক্ত হাদীসে সালামের সাথে সাথে ক্ষুধার্তকে আহার করানো, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এবং শেষ রাতে নামায পড়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. সালাম অহংকারমুক্ত করে ও বিনয় সৃষ্টি করে। আগে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত হন।
৯. সালাম দেয়ার দ্বারা মানুষের কাছে প্রিয় হওয়া যায় যদিও উদ্দেশ্য থাকে কেবল আল্লাহকে খুশি করা।
১০. এতে অধিক পরিচিতি লাভ করা যায় এবং সমাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায়।[২২৪]

সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আল কুর'আন নির্দেশিত ছোট্ট একটি নফল ইবাদাত 'সালাম'ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বড় অবদান রাখতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনের এ লক্ষ্য যেমন মুসলিম জনগণের জন্য প্রযোজ্য, তেমনি সমগ্র মানব সমাজের জন্যও তা প্রযোজ্য। তাই আল্লাহ বলেন:

---

২২১. মো: মোখলেছুর রহমান, *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম* (ঢাকা: এন আর বি গ্রুপ, প্রকাশকাল, মার্চ ২০১১), পৃ. ৭৪

২২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

২২৩. *সহীহ বুখারী*, বাবু ইতা-'আমিত'আ-মি মিনাল ইসলাম (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ১১, ২৭, ৫৭৬৭, *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং. ৫৬

২২৪. মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, *সালাম অনুপম ব্যক্তিত্ব ও সুন্দর সমাজ গঠনের হাতিয়ার* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, অক্টোবর ২০০৩), পৃ. ২০

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

"আর যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে বা ওরই অনুরূপ করবে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।"[২২৫]

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা করছ, আশা করা যায় (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ সর্ব শক্তিমান এবং আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২২৬]

'ইসলাম' শব্দের অর্থই হলো 'শান্তি'। এ জীবন ব্যবস্থার নামকরণ থেকে সহজে অনুমিত হয়, ইহ-পরকালে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলামে শান্তির চিন্তা সামগ্রিক জীবনে ব্যক্তি ও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, ইহ ও পরকাল, সর্বক্ষেত্রে। পবিত্র কুর'আনে 'সালাম' শব্দটি ৪২ বার বিভিন্ন সুরায় ব্যবহৃত হয়েছে।[২২৭] 'সালাম' অর্থও 'শান্তি'। 'সালাম' আল্লাহ তা'আলার পবিত্র একটি নামও। ইসলামে অভিবাদনের ভাষা হলো:.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।"

প্রত্যেক মুসলিম প্রতিদিন এ বাণী বহুবার উচ্চারণ করে। একে অন্যকে শান্তির পয়গাম জানায়। বড়ো-ছোট, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গেঁয়ো সবার জন্য সালামের ভাষায় কোন ভেদাভেদ নেই। পূর্বাহ্ন-মধ্যাহ্ন-অপরাহ্ন, রাত-প্রভাত সর্বাবস্থায় সালামের বাণী প্রযোজ্য। সুখী-দুঃখী সকলে শান্তি প্রত্যাশী। প্রত্যেককে সালাতের ইতি টানতে হয় সালামের বাণী দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরল প্রথ প্রদর্শন করেন।"[২২৮]

বস্তুতঃই আল কুর'আন মানবজীবনের সকল দিকে ও ক্ষেত্রেই শান্তি স্থাপনের পক্ষে সচেষ্ট। নবী কারিম (স.) এ বিধানকে বাস্তবে অনুসরণ করেছেন এবং সমস্ত কাজই কুর'আন নির্দেশিত পন্থা ও পদ্ধতিতে আঞ্জাম দিয়েছেন।

মদীনায় হিজরতের পর তথাকার অধিবাসীদের মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য রাসূল (স.) 'মদীনা সনদ' প্রণয়ন করেন। কুর'আন ও ইসলাম যে শান্তি এবং সম্প্রীতির জন্য তার উজ্জল দলীল এ সনদ। শান্তি ও সম্প্রীতি সংশ্লিষ্ট এর কয়েকটি ধারা হচ্ছে:

১. সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলিম, ইয়াহুদী, নাসারা এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং একটি সাধারণ জাতি (উম্মাহ) গঠন করবে।
২. মুসলিম এবং অমুসলিম বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।
৩. কোন সম্প্রদায়-ই কুরাইশদের কিংবা বাইরের অন্য কোন শত্রুর সাথে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।
৪. মদীনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো এবং সেখানে রক্তক্ষয়, হত্যা এবং অন্যায়-অনাচার নিষিদ্ধ করা হলো।

---

২২৫. *আল কুর'আন*, ০৪:৮৬

২২৬. *আল কুর'আন*, ৬০:০৭

২২৭. *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

২২৮. *আল কুর'আন*, ১০:২৫

৫. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার পাপী বা অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।
৬. ইয়াহুদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।
৭. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করতে হবে।
৮. মুহাম্মাদ (স.) এর পূর্বানুমতি ছাড়া কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।[২২৯]

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে সুস্পষ্ট মুসলিম স্বার্থবিরোধী কয়েকটি শর্ত থাকলেও সুদূরপ্রসারী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূল (স.) তা মেনে নিয়েই সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। আপাতঃদৃষ্টিতে উক্ত সন্ধিকে মুসলিম স্বার্থবিরোধী মনে হলেও তা ছিল فتح مبين বা সুস্পষ্ট বিজয়।[২৩০] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا "নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।"[২৩১] হুদাইবিয়ার সন্ধি মক্কার কুরাইশদের সাথে স্থাপিত হয়েছিল। হুদাইবিয়ার এ সন্ধির ইতিহাস ও দলিল-দস্তাবেজ আল কুর'আনের শান্তি প্রয়াসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাতে কুরাইশদের দাবি অনুযায়ী রাসূলে কারিম (স.)-এর নামের পর 'রাসূলুল্লাহ' লেখাও বাদ দেয়া হয়েছিল।[২৩২]

মহানবী (স.) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি করেছেন। তাতে উল্লেখ ছিল:

وضع الحرب بين الطرفين عشرسنين يأمن فيها الناس ويكن بعضهم عن بعض

"উভয় পক্ষ দশ বছর যাবৎ যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এ সময়ে জনসাধারণ নিশ্চিত ও নিরাপদ থাকবে। কেউ কারো উপর হাত তুলবে না।"[২৩৩]

মক্কা বিজয়কালে তিনি যে পরম মানবতাবাদী অবদান রেখেছেন তা চিরকালের বিশ্বশান্তির মূর্ত প্রতীক এবং বিশ্ব নেতৃত্বের অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি সেদিন হযরত সা'আদ ইব্ন 'উবাদা (রা.) এর হাতে পতাকা দিয়েছিলেন। তিনি সে পতাকা নিয়ে যখন অগ্রসর হলেন তখন আবূ সুফিয়ানকে দেখতে পেয়ে তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আবূ সুফিয়ান আজকের দিন লড়াই জবাইর দিন, আজকের দিন সমস্ত হারাম হালাল হওয়ার দিন, আজ আল্লাহ কুরাইশদেরকে অপমানিত করেছেন।' উক্ত কথা শুনতে পেয়েই নবী কারীম (স.) বলে উঠলেন:

الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ الْيَوْمَ أَعَزَّ اللّٰهُ فِيهِ قُرَيْشًا

"না আজকের দিন ক্ষমা ও দয়ার দিন, আজই আল্লাহ কুরাইশদেরকে সম্মানিত করেছেন।"[২৩৪]

মূলত আল কুর'আন গোটা মানবতাকে একক হিসাবে গণ্য করেছে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিকট বংশ সম্পর্কসম্পন্ন নিকটাত্মীয় বলে ঘোষণা করেছে। আর নিকটাত্মীয়দের মাঝে কোনরূপ ঝগড়া বিবাদ কোন ক্রমেই বাঞ্চনীয় নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল কুর'আন সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে এ অনুভূতিই জাগ্রত করে দিতে চায়। সৃষ্টি করতে চায় সকলের মাঝে ঐকান্তিক বন্ধুত্ব। দূর করতে চায় সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর সকল স্তর থেকে যাবতীয় অন্যায়মূলক কর্মকান্ড।[২৩৫]

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স.)-র গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

২২৯. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২; ড. মাহদী রিযকুলণ্ঢাহ আহমাদ, *আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফী যুউল মাসাদির্ল আসলিয়াহ* (রিয়াদ: মারকাযুল মালিক ফয়সাল, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩০৭

২৩০. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

২৩১. *আল কুর'আন*, ৪৮:০১

২৩২. *সীরাতে ইব্ন হিশাম*, বাবু বাই'আতুর রিদওয়ান (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), খ. ১ম, পৃ. ৩২৫

২৩৩. *আর রাহিকুল মাখতুম* (রিয়াদ: মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৩৪২

২৩৪. *আল মাগাযী লিল ওয়াকিদী* (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), খ. ১ম, পৃ. ৮২১

২৩৫. *আর রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (স.) সেখানে দেখতে পেলেন যে, মদীনায় প্রধানত: তিন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। যথা: ১. মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, ২. বিদেশী সম্প্রদায় ও ৩. নব বাইয়াত প্রাপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়। তাদের পারস্পরিক আদর্শগত কোন মিল ছিল না, এর উপর ছিল গোষ্ঠিগত হিংসা-বিদ্বেষ। বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মের অনুসারীদের মাঝে শান্তি স্থাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) প্রাথমিকভাবে যে ব্যবস্থা নেন তা একখানি দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়। ৫৩টি ধারাবিশিষ্ট এ দলিলই 'মদীনার সনদ' বা 'The Charter of Madina' নামে খ্যাত।[২৩৬]

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এ দলিলের ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মাঝে বিদ্যমান হানাহানী ও ভুল বুঝাবুঝির কারণে সৃষ্ট বর্তমান বিশ্বের অশান্তি দূরীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ রচনায় তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। মদীনায় অবস্থানকারী ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের সম্প্রীতি ও ঐক্যসুত্রে বন্ধনের নিমিত্তে মহানবী (স.) যে সনদ রচনা করেন তা পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে সকলের জান-মাল ও ধর্মের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।[২৩৭] মহানবী (স.) সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

যুদ্ধের জন্য উস্কানীদায়ক উপাদানের মূলোৎপাটন

আরবজাতি ছিল ঝগড়াটে, যুদ্ধপ্রিয় ও সংঘাতে পারঙ্গম। যুদ্ধ ছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয় কর্ম। সামান্য বিষয় নিয়েই তারা যুদ্ধে লিপ্ত হতো। ৬০৫ ঈসায়ী সনে কা'বা ঘর সংস্কারের সুত্র ধরে মক্কাবাসী হাজরে আসওয়াদকে কেন্দ্র করে এক তুমুল সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। গোত্রপতিগণ শপথ করলো যে, প্রয়োজনে আমরা জীবন দিবো, তবু এ কালো পাথর অন্যকোন গোত্রকে সংস্থাপন করতে দিবো না। বর্ষীয়ান কুরাইশ নেতা উমাইয়া স্বজাতিকে এ আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষার জন্য বললেন যে, যে ব্যক্তি আগামীকাল সকালে সর্বপ্রথম কা'বাচত্বরে প্রবেশ করবেন, তিনিই এ ঝগড়ার মীমাংসা করবেন। সকলে এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। ভোর হতে না হতেই দেখা গেল, সকলের আগে এসেছেন মুহাম্মাদ (স.) তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে সকল গোত্রের দলপতিদেরকে সাথে নিয়ে পাথরটি স্থাপন করলেন। এভাবে তিনি অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তথা সন্ত্রাস থেকে জাতিকে রক্ষা করেন। আল কুর'আন এ সাংঘাতপ্রিয় আরব জাতিকে অল্পকয়েক বছরের ব্যবধানে বিশ্বের এক শান্তিকামী, সন্ধিপ্রিয় ও সংঘাতবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। কারণ যেসব উপকরণ মানুষকে যুদ্ধের প্ররোচনা যোগায় আল কুর'আন তা মানুষের মন থেকে সমূলে উৎপাটন করে দিয়েছে। উপকরণগুলো হলো:

অর্থের মোহ

যেসব উপকরণ আরবদেরকে ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধোন্মাদ ও জঙ্গি করে তুলতো তার অন্যতম হলো অর্থ প্রাপ্তির আশা ও লোভ। যখন কোন আরব অস্ত্র ধারণ করতো তখন সর্বপ্রথম যে অভিলাষ তার মনে জাগতো তা ছিল রণাঙ্গন থেকে সে অনেক ধন-সম্পদ ও গোলাম-বাদী হস্তগত করবে। শ্রম দ্বারা অর্জিত সম্পদের চেয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদই ছিল তাদের কাছে পবিত্র সম্পদ ও একমাত্র সম্মানজক জীবিকা। জাহেলী যুগের কবিদের সাহিত্য থেকে বুঝা যায়, কোন গোত্র যখন যুদ্ধ করতে রওয়ানা দিতো তখন মহিলারা পুরুষদের অঙ্গীকার করিয়ে নিতো যে, লুটের মাল না নিয়ে তারা বাড়ি ফিরবে না। এ লুটতরাজ ছিল আরবদের যুদ্ধবিগ্রহের প্রধানতম লক্ষ্য। যে যুদ্ধে গণিমত লাভ হতো না, তৎকালীন আরব বুদ্ধিজীবিরাও তাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অর্থহীন যুদ্ধ মনে করতো।[২৩৮] আল কুর'আনের ঘোষণা হলো, যারা

---

২৩৬. মোঃ রফিকুল ইসলাম, *মদীনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান* (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, জুলাই ২০১৩), পৃ. ২১৪

২৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

২৩৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *আল জিহাদ*, অনু. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, মার্চ ২০০৫), পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

লুটতরাজ ও সম্পদের লোভে যুদ্ধ করবে তাদের 'জিহাদ' আল্লাহর পথে হবে না। এ ধরনের যুদ্ধের তীব্র সমালোচনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করেছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছো ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছো, আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছো, কারণ তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া, আর কারো বা কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তোমাদের সরিয়ে দিলেন, ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।"[২৩৯] আর যারা নিজের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর পথে জিহাদ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন:

لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"কিন্তু রাসূল (স.) এবং যেসব লোক ঈমান এনেছে, তাঁর সঙ্গে তাঁরা (একত্রিত হয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাঁদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে।"[২৪০]

বীরত্ব প্রদর্শন

নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতা জাহির করার জন্যও আরবরা যুদ্ধ করতে প্রছন্দ করতো। পরস্পরের আভিজাত্যের গর্ব করা ও তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া আরবদের সহজাত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম ছিল। অন্যের তুলনায় নিজেদেরকে অধিকতর শক্তিমান, খ্যাতিমান ও মর্যাদাবান প্রমাণ করার জন্য তারা যেকোন ধরনের ঝুঁকি গ্রহণেও প্রস্তুত হয়ে যেতো। প্রাক-ইসলামী যুগে যতগুলো বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে তার অধিকাংশই এ আভিজাত্যবোধের প্রতিযোগিতার ফল। বনু তাগলীব ও বনু বকরের মধ্যে দীর্ঘ ৪০ বছরব্যাপী সংঘটিত রক্তক্ষয়ী সেই কুখ্যাত 'বাসূস' যুদ্ধের কারণ ছিল একজনের চারণভূমিতে অন্যের উট ঢুকে পড়ার মতো তুচ্ছ ঘটনা। এরপর 'দাহেস' যুদ্ধের ইতিহাস। ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় একটা ঘোড়া আগে চলে যাওয়া থেকে যার সূচনা। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণ এক শতাব্দী চলে এ যুদ্ধ। তা শুরু হয়েছিল পারস্পারিক ঈর্ষা ও ক্ষমতার দর্প থেকে। ফিজার যুদ্ধ একইভাবে অহঙ্কার ও প্রতিহিংসার ফল ছিল।[২৪১] আল কুর'আন মানুষের এ মনোভাবকে সম্পূর্ণ উৎপাটনের চেষ্টা করেছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন:

أَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ

"কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। প্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আনা হবে সে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিল। আল্লাহ তাকে নিজের নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে যখন তা স্বীকার করবে তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি আমার জন্য কী করেছো? সে বলবে, আমি তোমার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি যুদ্ধ করেছিলে কেবল

---

২৩৯. *আল কুর'আন*, ০৩:১৫২

২৪০. *আল কুর'আন*, ০৯:৮৮

২৪১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

লোকে যাতে তোমার বীরত্বের প্রশংসা করে বলে, অমুক ব্যক্তি বড় সাহসী ছিল। তোমার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তার জন্য আযাবের নির্দেশ দিবেন। এমনকি অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"[২৪২]

প্রতিশোধ স্পৃহা

প্রতিশোধ স্পৃহাও ছিল আরবের রক্তাক্ত ইতিহাসের অন্যতম চালিকাশক্তি। তারা বিশ্বাস করতো যখন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় তখন তার আত্মা পাখি হয়ে উড়ে যায় এবং যতক্ষণ তার প্রতিশোধ না নেয়া হয় ততক্ষণ তা পর্বত ও উপত্যকায় 'আমাকে পান করাও, আমাকে পান করাও' বলে চিৎকার করতে থাকে। জাহেলী যুগের কবিদের কাব্যচর্চার অন্যতম উপজীব্য ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের ধ্যান-ধারণা। তারা এর ভিত্তিতে আরব গোত্রসমূহকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিতো। আল কুর'আন মানুষের উক্ত প্রতিশোধ স্পৃহাকে সংকুচিত করেছে। 'কিসাস' বা হত্যার প্রতিশোধ হত্যার আইনের মাধ্যমে মানবজাতিকে হিংসাপ্রবৃত্তির ক্ষতিকারক ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুত ঃ যারা তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা তাদের উপর সীমালঙ্ঘন করো, ততটা যতটা তারা তোমাদের উপর করেছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, যারা মুত্তাকী, আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন।"[২৪৩]

শান্তি বিঘ্নকারী উপাদানের অপসারণ

যে উপাদান মানুষের মধ্যে ক্ষোভ, অশান্তি ও হাহাকার জাগিয়ে তোলে, আল কুর'আন সেসব উপাদানগুলোকে অপসারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে নাগরিকদের মাঝে ক্ষোভ ধূমায়িত না হয়, অশান্তি ও হাহাকার দানা বেঁধে না ওঠে, মানুষের মধ্যে নাবিশ্বাস না ওঠে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

আর্থ-সমাজিক বৈষম্য দূরীকরণ

যে সমাজে বিশাল অট্টলিকার পাশেই বস্তির জীর্ণ-শীর্ণ কুড়েঘর থাকবে, যে সমাজে অভাব, নৈরাজ্য, হাহাকার দগদগে ঘায়ের মতো মানুষকে পীড়া দিবে, যেখানে একমুঠো ভাতের জন্য একগজ কাপড়ের জন্য নারীদেরকে সম্ভ্রম বিকাতে হবে, কনকনে শীতে রাতের খোলা আকাশের নিচে কুয়াশাভেজা রাস্তার ফুটপাত ছাড়া যেখানে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাই নেই, যেখানে লক্ষ লক্ষ যুবক বেকার থাকবে সে সমাজ কখনেই শান্তির নীড় হতে পারে না। সে সমাজে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যে সমাজে কেউ খাবে আর কেউ খাবে না এমন হয়, কেউ আঙ্গুল চুষে ক্ষুধা নিবারণ করবে আর কেউ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হবে, কেউ খাবে পাঁচ তারা হোটেলে আর কেউ ডাস্টবিন থেকে সেখানে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, হাহাকার লেগে থাকবেই। সেখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘাত এবং পেশায় পেশায় দ্বন্দ্ব থাকবেই। তাই আল কুর'আন সুষম অর্থ বণ্টন ব্যবস্থার প্রচলন করেছে। চালু করেছে ঐতিহাসিক যাকাত ব্যবস্থা।[২৪৪]

---

২৪২. *সুনানু আন নাসাঈ*, বাবু মান ক্বাতালা লি ইউক্বালা ফুলানুন জারিউন (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৩০৮৬

২৪৩. *আল কুর'আন*, ০২:১৯৪

২৪৪. *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যথাযথ অধিকার দান

অন্যদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি অসদাচরণ, বিমাতাসুলভ ব্যবহার সমাজে অশান্তি তৈরী করে। সমাজে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তৃতি লাভ করে। আল কুর'আন তাই সংখ্যালঘুদের প্রতি সুন্দর আচরণ, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। মহানবী (স.) বলেছেন:

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন সংখ্যালঘুকে অত্যাচার করবে, তার অধিকার ক্ষুন্ন করবে, তাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করাবে, তার অমতে তার কিছু ছিনতাই করবে, আমি কিয়ামতের দিবসে তার প্রতিপক্ষ হবো।"[২৪৫]

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

যে সমাজে আইনের সুশাসন অনুপস্থিত থাকে, অপরাধীদেরকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না, আইনের শাসন দীর্ঘসূত্রিতায় আটকা পড়ে, সে সমাজ থেকে শান্তি নির্বাসিত হয়ে যায়। সন্ত্রাসী ও অপরাধীচক্র আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অপরাধ সংঘটন মামুলী হয়ে যায়। আল কুর'আন তাই বিচার ব্যবস্থাকে গতিশীল, স্বাধীন ও নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক রেখে আইনের শাসনকে মজবুত করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"হে মু'মিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে- পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।[২৪৬]

হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা

হিংসা-বিদ্বেষ একটি মারাত্মক নৈতিক ত্রুটি। এটা একটি সমাজিক ব্যাধি। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের সৎকর্মকে বিনষ্ট করে দেয়। মহানবী (স.) বলেছেন:

إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

২৪৫. *আস-সুনান আবু দাউদ*, বাবু ফি তা'শীরি আহলিয্যিম্মাতি, (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ২৬৫৪

২৪৬. *আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

"তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের নেক আমল ও পুণ্য তেমনই খেয়ে ফেলে যেমন আগুন লাকড়ি খেয়ে (জ্বালিয়ে) ফেলে।"[২৪৭] অতএব এ ধরনের ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকলে সামাজিক সম্প্রীতি অনেকটা মজবুত হবে। এজন্য কুর'আনের শিক্ষা হলো হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা।

গীবত ও চোঘলখুরী পরিহার করা

সমাজে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিতে এ দু'টো দোষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। কোন ব্যক্তির পিছনে তার দোষ-ত্রুটি চর্চার নাম গীবত এবং একজনের কথা অন্যজনকে লাগানোর নাম চোঘলখুরী। সমাজ থেকে এ দু'টো ব্যাধি বিদূরিত হলে সমাজ অনেকাংশে সম্প্রীতিপূর্ণ হবে। গীবত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

"হে মু'মিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা একে অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।"[২৪৮] চোঘলখুরী হলো গীবতের চেয়েও মারাত্মক। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন: لايدخل الجنة نمام "চোঘলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২৪৯]

কু-ধারনা ও অপবাদ থেকে বিরত থাকা

সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্টে এ দু'টো বিষয় খুবই কার্যকর। আজকে সমাজে অস্থিরতা, অবিশ্বাস শুধু এ কারণে। দেশে যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদি ঘটনার দায়ভার সব সময় ইসলামপন্থীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ায় এ ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে, সন্ত্রাস শুধুমাত্র ইসলামপন্থীরাই করতে পারে। এসবও উপরিউক্ত গুণাগুণের ফল। সামাজিক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এ দু'টো থেকে সবাইকে বেঁচে থাকা চাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"আর যারা মু'মিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোন অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।"[২৫০] কু-ধারণা সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেন:

إياكم والظن- فإن الظن أكذب الحديث

"সাবধান! খারাপ ধারণা থেকে বিরত থাকো। কেননা খারাপ ধারণা-অনুমান হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।"[২৫১] মহানবী (স.) আরো বলেছেন:

---

২৪৭. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, বাবু ফিল হাসাদি (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৪২৫৭; মুসনাদু আব্দ ইব্ন হুমাইদ, বাবু ইয়্যাকুম ওয়াল হাসাদা, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৪৩৪

২৪৮. *আল কুর'আন*, ৪৯:১২

২৪৯. *সহীহ মুসলিম*, বাবু বায়ানি গিলজি তাহরীমিন নামীমাহ, খন্ড-১, পৃ. ২৭৩, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৫১

২৫০. *আল কুর'আন*, ৩৩:৫৮

২৫১. *সহীহ বুখারী*, বাবু লা ইয়াখতুবু 'আলা খিতবাতি আখীহি, (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৪৭৪৭

Dhaka University Institutional Repository

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولاتناجشوا ولاتحاسدوا ولا تباغضوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله إخوانا

"তোমরা [কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে] কু-ধারণা হতে বেঁচে থেকো। কেননা কু-ধারণা সবচেয়ে মিথ্যা কথা। কারো (খারাপ বা দোষের) খবর জানার চেষ্টা করো না। গোয়েন্দাগিরী করো না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না। আর পরোক্ষ নিন্দাবাদে একে অন্যের পিছনে লেগো না। তোমরা বরং আল্লাহর বান্দাহ, সকলে ভাই ভাই হয়ে থেকো (অন্য এক বর্ণনায় আছে, পরস্পরের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ লালসা করো না)।"[২৫২]

শান্তি স্থাপনকারী উপাদান প্রতিষ্ঠা

মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দান

আল কুর'আন ধর্ম, বর্ণ, বংশ, গোত্র-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দান করেছে। মানুষকে তার অর্থ, শক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় অথবা অঞ্চলের জন্য সম্মান নয়, মানুষকে সম্মান করতে হবে মানুষ হিসেবেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিয্ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছি।"[২৫৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"[২৫৪] আল্লাহ তা'আলার এ মহান ঘোষণার দ্বারা মানুষ মানুষের মর্যাদা পেলো। কালো বা নীচু বংশের বলে তাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। আল কুর'আন সকল মানুষকে মর্যাদা দান করে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা

কুর'আন অমুসলিমদের ধর্মমত ও বিশ্বাসের স্বীকৃতিদান করে। হত্যা, শাস্তি, নানা নির্যাতন ও নির্বাসন প্রদানের হুমকি দিয়ে তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা থেকে আল কুর'আন বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

"সুতরাং তুমি ডাক এ ধর্মের দিকে, নির্দেশ অনুযায়ী দৃঢ় থাক এবং ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। বল, আল্লাহ্ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাসী এবং আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার

---

২৫২. *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাহরীমুয্যন্নি, অত্তাজাস্সুসি, অত্তানাফুসি (আল মাক্তাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৪৬৪৬

২৫৩. *আল কুর'আন*, ১৭:৭০

২৫৪. *আল কুর'আন*, ৪৯:১৩

করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া নেই। আল্লাহ্ই আমাদের একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তণ তাঁরই কাছে।"[২৫৫] কুর'আনের উক্ত ঘোষণায় অমুসলিমদের জন্য স্বাধীন ধর্মমত পোষণের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

ধর্ম পালনের স্বাধীনতা

কুর'আন অমুসলিমদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। অর্থাৎ কুর'আন তাদেরকে ধর্মের নির্দেশিত পথের বিপরীতে চলতে বাধ্য করে না। যেমন ইয়াহুদীদের ধর্ম মতে শনিবার কাজকর্ম নিষিদ্ধ এবং খ্রিষ্টানদের রোববারে গির্জায় যাওয়া অপরিহার্য। তাই ইয়াহুদীদের শনিবারে কাজ করতে বাধ্য করা এবং খ্রিষ্টানদের রোববারে গির্জায় যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা যাবেনা। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

"আর বল, 'সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরি করে। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়, তবে তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মত, যা চেহারাগুলোকে ঝলসে দেবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ বিশ্রামস্থল!"[২৫৬]

জোর করে বা কোন রকম বলপ্রয়োগে বাধ্য করে কাউকে ধর্মান্তরিত করা যাবে না। সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাঁর দ্বীনি দাওয়াতীকাজ, উপদেশ দান, আহবান-আমন্ত্রণ ও সন্দেহ-সংশয় অপনোদন পর্যন্তই যেন সীমিত রাখেন এবং অপরাপর ধর্ম বিশাসের প্রতি কোন রকম অশোভন কটাক্ষ না করেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

"আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং নিরক্ষরদেরকে বল, 'তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ'? তখন যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারা অবশ্যই হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি ফিরে যায়, তাহলে তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[২৫৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ- وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

"আমি প্রত্যেক জাতির জন্য ইবাদাতের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, তারা যার অনুসরণকারী। সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক করতে না পারে। আর তুমি তোমার রবের দিকে আহবান কর। নিশ্চয় তুমি সরল পথেই রয়েছ। আর তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতন্ডা করে, তাহলে বল, 'তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"[২৫৮] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

---

২৫৫. *আল কুর'আন*, ৪২:১৫

২৫৬. *আল কুর'আন*, ১৮:২৯

২৫৭. *আল কুর'আন*, ০৩:২০

২৫৮. *আল কুর'আন*, ২২:৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا- وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

"আর তারা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল। আর ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে। আর তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দাও।"[২৫৯]

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[২৬০]

নাজরানের খ্রিষ্টানদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) যে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছিলেন তা মানবজাতির ইতিহাসে মৌলিক মানবাধিকার ও পরমত-সহিষ্ণুতার এক অসামান্য দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। নাজরান এবং পাশ্ববর্তী এলাকাসমূহের খ্রিষ্টানদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তা ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর অঙ্গীকারের বার্তা পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। তাদের জীবন, তাদের ধর্ম, তাদের সম্পদ সবকিছুর ব্যাপারেই নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছানো হয়েছিল। তাদের ধর্মাচারণ এবং উৎসব পালনে কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না মর্মে ঘোষণা দেয়া হল। আরো ঘোষণা করা হল, তাদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বা অধিকারে পরিবর্তন আনা হবে না। কোন বিশপকে তার আরাধনার স্থান থেকে অপসারণ করা হবে না, কোন ভিক্ষুকে তার আশ্রম থেকে অপসারণ করা হবে না, কোন পুরোহিতকে তার নির্দিষ্ট আসন থেকে স্থানচ্যুত করা হবে না। তারা সকলেই পূর্বের মতই সমুদয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকবেন। কোন মূর্তি অথবা ক্রুশ বিনষ্ট করা হবে না।[২৬১] মদীনায় আগমনের অব্যবহিত পরেই মহানবী (স.) এক রাষ্ট্রীয় সনদ (মদীনা সনদ) ঘোষণা করেন, যাতে বলা হয়েছিল: "ইয়াহুদী, যারা তাদের নিজেদের আমাদের সাথে সম্মিলিত করেছে, তাদেরকে সকল অশান্তি-উপদ্রব থেকে রক্ষা করা হবে। সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে তারা আমাদের লোকদের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। মুসলমানদের মতই তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে। ইয়াহুদীদের অধীনস্ত ব্যক্তি ও মিত্ররাও একই ধরনের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে, অপরাধীদের পাকড়াও করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে।"[২৬২]

জেরুজালেম অধিকারের পর খলিফা হযরত 'উমর (রা.) খ্রিষ্টানদের পবিত্র স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন। যখন তিনি একটি গির্জা পরিদর্শন করেছিলেন তখন নামাযের নির্দিষ্ট সময় এসে যায়। পুরোহিত ঐ স্থানে (গির্জাতেই) নামায আদায়ের অনুরোধ করলেন। কিন্তু হযরত 'উমর (রা.) সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বললেন 'আমি যদি আজ এখানে নামায আদায় করি, তাহলে পরবর্তীকালে মুসলিমগণ একে তাদের উপাসনার স্থান বলে দাবি করতে পারে।'[২৬৩]

মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা

আল কুর'আন সংখ্যালঘু অমুসলিম সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে দিয়েছে। তাদের জান-মালের নিরাপত্তা, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আল কুর'আন আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করতে বলে। তাদের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করতে বলে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

---

২৫৯. *আল কুর'আন*, ৭৩:১০-১১

২৬০. *আল কুর'আন*, ০২:২৫৬

২৬১. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ;* বালাজুরি, *ফুতুহুল বুলদান;* উদ্ধৃত, *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

২৬২. *আর রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

২৬৩. T.W Arnold : *Preaching of Islam,* Page 5-7; উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ **وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ**

"তাদেরকে হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়, কিন্তু আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত করেন এবং তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এবং তোমরা কোন উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না।"[২৬৪] এতে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ সংলাপ এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক সম্প্রীতি স্থিতিশীল থাকে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** "তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য।"[২৬৫] আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল কুর'আন অন্যান্য ধর্মমতকে ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার সকল বিষবাষ্প বিদূরিত করে দিয়েছে।

ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা

সামাজিক সম্প্রীতির পদক্ষেপ হিসেবে আল কুর'আন মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হিসেবে ঘোষণা করেছে। এতে করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি মজবুত থাকবে, প্রশাসন সুদৃঢ় থাকবে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির অবসান হয়ে সম্প্রীতির বারিধারায় পরিণত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"নিশ্চয় মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।"[২৬৬] মহানবী (স.) বলেছেন:

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

"তোমরা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ করবে না, প্রতারণামূলক দালালি করবে না, শত্রুতা করবে না, পরোক্ষ নিন্দাবাদে একে অন্যের পিছনে লাগবে না, একজনের দরের উপর অন্যজন মাল দর করবে না। আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। কেউ কারো প্রতি যুল্‌ম করবে না, কেউ কাউকে অপদস্ত করবে না, তুচ্ছ ভাববে না।" অতঃপর রাসূল (স.) নিজ হাত দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, "পরহেজগারী বা আল্লাহ ভীতি এখানে। মানুষের অনিষ্ট হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাববে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পরস্পরের রক্ত, অর্থ ও মর্যাদা খর্ব করা হারাম।"[২৬৭] মহানবী (স.) আরো বলেছেন:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুল্‌ম বা অবিচার করবে না এবং তাকে অকল্যাণের পথে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাই-এর প্রয়োজনে এগিয়ে আসল, আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সঙ্কট দূর করবে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার

---

২৬৪. *আল কুর'আন*, ০২:২৭২

২৬৫. *আল কুর'আন*, ১০৯:০৬

২৬৬. *আল কুর'আন*, ৪৯:১০

২৬৭. *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাহরীমি যুলমিল মুসলিমি ও খুযূলিহি, (আল মাকতাবাতস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৪৬৫০

Dhaka University Institutional Repository

কিয়ামতের দিনের সঙ্কট দূর করে দেবেন, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।"[২৬৮]

ধৈর্য ধারণের শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়বন্ধু নবী (স.) ও সাহাবীগণের সর্বোতভাবে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা মৃত্যু পর্যন্ত। ঐ ধৈর্য কিছুক্ষণের জন্য বা বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য নয়। মুসলিমকে ধৈর্যধারণ করতে হবে চিরকালের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত। আল্লাহর ধৈর্যধারণের এ নির্দেশ তাঁর পক্ষ থেকে এক প্রকারের সাহায্যদান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কওমকেই ধ্বংস করা হবে।"[২৬৯]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"আমি তোমাদেরকে ভয়ভীতি ক্ষুধা ধনসম্পদ জীবন ও ফলন হ্রাস দ্বারা পরীক্ষা করবো। তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। তাদের উপর বিপদ এলে বলে- আমরা তো আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"[২৭০] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের কষ্টদায়ক কথাবার্তার দরুন মনোকষ্টের জন্য ধৈর্য্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।"[২৭১]

চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে, সিজদারত অবস্থায়, মাথায় উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে, তায়েফে পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত করে চরম কষ্ট দেয়ার পরও বিশ্বনবী (স.) অন্যায়-অত্যাচারের পরিবর্তে একমাত্র সত্য দ্বীন, ইসলামের শাশ্বত বাণীর দিকে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। তারা বাড়িয়ে দেয় মহানবী (স.) এর উপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা। কিন্তু সর্বশেষ প্রিয় নবী (স.) তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জবাব রাগ ও সন্ত্রাস দ্বারা না দিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য ও শান্তিপ্রিয়তার পরিচয় দ্বারা দিয়েছেন।

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله (ص) ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب.

---

২৬৮. *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাহরীমুজ যুল্‌মি, (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ্, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৪৬৭৭

২৬৯. *আল কুর'আন*, ৪৬:৩৫

২৭০. *আল কুর'আন*, ০২:১৫৫-১৫৬

২৭১. *আল কুর'আন*, ১৫:৯৭-৯৯

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন: "ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে অন্যকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং (প্রকৃত) শক্তিশালী সে-ই যে রাগের সময় নিজকে সংবরণ করতে পারে।"[২৭২] আল কুর'আন সর্বাত্মকভাবে ধৈর্য ও পরম সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়েছেন, আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্তা ও বাকশৈলীতে নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয়ই আল কুর'আনের শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

"তুমি সংযতভাবে চলাফেরা কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর; নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[২৭৩] আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (স.) এর পরিচয় দিয়ে বলেন:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"নিশ্চয় তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।"[২৭৪] রাসূল (স.) এর সঙ্গে সাহাবীদের সম্পর্ক বর্ণনা করে রাসূলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।"[২৭৫]

বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান

আল্লাহ তা'আলা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে নাযিল করেছেন আল কুর'আন। পবিত্র কুর'আনে তিনি বলেছেন:

ما فرطنا فى الكتاب من شيئ.

"আমি কিতাবে (আল কুর'আনে) কোন কিছুর বর্ণনাই বাদ রাখিনি।"[২৭৬]

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন কিভাবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভুমিকা রেখেছে নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল:

ব্যক্তি জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আন

মানুষ যাতে ব্যক্তি জীবনে পূর্ণ শান্তি পেতে পারে এজন্য আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি জীবন পরিচালনার গাইড লাইন আল কুর'আনে দিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে শান্তি পেতে হলে সে গাইড লাইনের বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

২৭২. *সহীহ বুখারী*, বাবু আল হাজর মিনাল গাদাবি, আল মাকতাবাতস শামিলাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৫৬৪৯

২৭৩. *আল কুর'আন*, ৩১:১৯

২৭৪. *আল কুর'আন*, ০৯:১২৮

২৭৫. *আল কুর'আন*, ০৩:১৫৯

২৭৬. *আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় এ (কুর'আন) দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথ দেখান এবং নিজ ক্ষমতাবলে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং সরল পথে পরিচালিত করেন।"[২৭৭]

মানবকুলের প্রত্যেকেই যেন পৃথিবীতে পূর্ণনিরাপত্তা ও শান্তি পেতে পারে যাবতীয় ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে এ সংক্রান্ত যাবতীয় নসিহত ও উপদেশ রয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে। মানুষের অন্তরে যে সব ব্যাধি রয়েছে তা নিরাময়ের জন্যই আল কুর'আন নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে এসেছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তার প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া এসেছে।"[২৭৮]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আমি কুর'আন অবতীর্ণ করি যা বিশ্বাসীদের জন্য উপশমকারী ও দয়া, কিন্তু যা বৃদ্ধি করে তা যালিমদের ক্ষতি ব্যতিত অন্য কিছু নয়।"[২৭৯]

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

"বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই এবং তাঁর মনোনীত গোলামদেরদের প্রতি সালাম! শ্রেষ্ঠ কে- আল্লাহ্, না ওরা যাদের শরীক করে তারা?"[২৮০]

দাম্পত্য জীবনে শান্তি

ব্যক্তি জীবনে শান্তি লাভের জন্য যত দিক আর বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম নিজের দাম্পত্য জীবন। আল্লাহ তা'আলা সূরা রূমে বলেছেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"এবং তাঁর নিদর্শন হল: তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীলদের জন্য এতে নিদর্শণ রয়েছে।"[২৮১] বিশ্বশান্তির প্রথম সোপান হলো দাম্পত্যজীবন। প্রত্যেক দম্পতি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী শান্তি রক্ষা করে চললে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা শুধু মূহুর্তের কাজ ব্যতিত অন্য কিছুই নয়। সুতরাং বিশ্ব শান্তির জন্য দাম্পত্য জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রথম এবং প্রধান শর্ত। যা উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আর আলোচ্য বাণীটুকুও পৃথিবীর সেরা বানী হিসেবে প্রতীয়মান হয়।"[২৮২]

এর দ্বারা একথা বলিষ্ঠভাবে বলা যায় যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনুল কারিমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জীবনের নিরাপত্তা

আল কুর'আন মানব জীবনকে একান্তই সম্মানের বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একটি মানুষের জীবন সংহারকে সমগ্র মানব গোষ্ঠির হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করে ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তার গুরুত্বের প্রতি

---

২৭৭. *আল কুর'আন*, ০৫:১৬

২৭৮. *আল কুর'আন*, ১০:৫৭

২৭৯. *আল কুর'আন*, ১৭:৮২

২৮০. *আল কুর'আন*, ২৭:৫৯

২৮১. *আল কুর'আন*, ৩০:২১

২৮২. এস.এ.এম মহিউদ্দীন খান, *ইসলাম ও বিশ্বশান্তি* (ঢাকা: খান পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০২, রমজান ১৪২৩ হিজরী), পৃ. ৬২

যতটা জোর দিয়েছে তার নজির পৃথিবীর কোন ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা আইন শাস্ত্রিয় সাহিত্য কোথাও মিলে না।[২৮৩] মহান আল্লাহর বাণী:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"এ কারণেই বনি-ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেলো।[২৮৪]

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।"[২৮৫] আল কুর'আন **قتل بالحق** (সংগত কারণে হত্যা) ছয়টি ক্ষেত্রের মধ্যে নির্ধারণ করে দিয়েছে:

১. ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধীকে তার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা (কিসাস)।
২. জিহাদের ময়দানে সত্য দীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদেরকে হত্যা করা।
৩. ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পতনের চেষ্টায় লিপ্তদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা।
৪. বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে হত্যা করা।
৫. ধর্ম ত্যাগের অপরাধে হত্যা করা।
৬. ডাকাত অর্থাৎ রাজপথে রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা।

এ ছয়টি কারণ ব্যতিত অন্য কোন কারণে মানুষের প্রাণের মর্যাদা বিনষ্ট হয় না। আল কুর'আনের সূরা আন'আমের ১৫২ নং আয়াত, বাক্বারার ১৭ ও ১৭৯ নং আয়াত এবং সূরা ফুরকানের ৬ নং আয়াতে এতদসম্পর্কিত নির্দেশ রয়েছে।[২৮৬]

মহান আল্লাহ হত্যাকে এত গুরুতর ও জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন যে, এ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহকালে কিসাসের শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও আখিরাতে জাহান্নামী হবে বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। উপরন্তু সে মহান আল্লাহর গজব ও ভয়ংকর শাস্তির মুখোমুখি হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।"[২৮৭]

---

২৮৩. মুহাম্মাদ সালাহ উদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, অনু. মুহাম্মাদ আবু তাওয়াম (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯২), পৃ. ২১৮

২৮৪. *আল কুর'আন*, ০৫:৩২

২৮৫. *আল কুর'আন*, ১৭:৩৩

২৮৬. *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯ ও ২২০

২৮৭. *আল কুর'আন*, ০৪:৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান হত্যা বন্ধ

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"বলুন, 'এসো, আমি তোমাদের পড়ে শোনাই যা তোমাদের রব নিষিদ্ধ করেছেন। তোমরা তার সাথে কোন অংশীদার করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে দারিদ্র্যের জন্য হত্যা করবে না নিজ সন্তানদের, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি। অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিত তাকে হত্যা করো না। তোমাদের তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝ।"[২৮৮]

অনুরূপ উপদেশ সূরা বানী ইসরাঈলের ৩১ নং আয়াত ও সূরা আন 'আমের ১৪০ নং আয়াতেও দেয়া হয়েছে। জাহেলী যুগে আবর দেশে কন্যাসন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়ার অমানবিক প্রথা চালু ছিল। এ জঘন্য অপকর্মের জন্য পরকালের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে অত্যন্ত ভয়ংকর বাচন ভঙ্গিতে আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি দোষে ওকে হত্যা করা হয়েছিল?"[২৮৯]

দেহইয়াতুল কালবী সাহাবী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার অসংখ্য কন্যা সন্তানকে হত্যা করেছিল। যে ঘটনার বিবরণ আবূ দাউদ শরীফে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কেবল অপরকে হত্যা করাই নিষিদ্ধ করেননি বরং তিনি মানুষকে নিজের জীবন ধ্বংস না করারও নির্দেশ দিয়েছেন এবং এভাবে আত্মহত্যার পথও চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ। আর নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[২৯০] জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে কুর'আনের এসব সুস্পষ্ট বিধানের পর এখন নবী কারিম (স.) এর বাণী সমূহ ও তাঁর ঐতিহাসিক কল্যাণময় জীবনের কতিপয় ঘটনা লক্ষণীয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, "হে লোক সকল! তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের উপর হারাম করা হল। তোমাদের আজকের এ দিন এ মাস (যিলহজ্জ) এ শহর (মক্কা) যেমন পবিত্র ও সম্মানিত অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পরের হন্তা হয়ে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যেও না।"[২৯১] অতঃপর তিনি তাঁর এ নসীহত কার্যকর করতে গিয়ে সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়ে বললেন:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ

---

২৮৮. *আল কুর'আন*, ০৬:১৫১

২৮৯. *আল কুর'আন*, ৮১:০৮-০৯

২৯০.*আল কুর'আন*, ০৪:২৯

২৯১. *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাহরীমু যুল্‌মিল মুসলিমি ওয়া খুজলিহি, হাদিস নং. ৪৬৫০; *সুনানু ইবনু মাযাহ*, বাবু হুরমাতু দামুল মু'মিনি, হাদিস নং. ৩৯২৩; *মুসনাদে আহমদ*, হাদিস নং. ৭৪০২, ৮৩৬৫, ১৫৪৪৪ (আল মাকতাবাতস শামিলাহ, প্রাগুক্ত)

"সাবধান! আমি সকল প্রকার জাহিলিয়াত ও বর্বরতাকে আমার পায়ের নিচে পিষ্ট করছি। আজ থেকে জাহিলী যুগের যাবতীয় হত্যা রহিত হল। প্রথম যে হত্যার প্রতিশোধ আমি গ্রহণ করলাম তা হচ্ছে আমার বংশের রবী'আ ইবনুল হারিস এর দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ, যাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।"[২৯২] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"কেউ যদি খুনের পরিবর্তে বা জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি ছাড়া কাউকেও হত্যা করে সে যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করার মত অপরাধ করল। আর কেউ যদি কারো জীবন বাঁচিয়ে দিল তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিল।"[২৯৩]

জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ও উত্তর

জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কখন থেকে এর প্রয়োজন হবে? পৃথিবীর সাধারণ আইনে ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই প্রাণের নিরাপত্তা অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহর আইনে মাতৃউদরে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর থেকেই প্রাণের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ কারণে মহানবী (স.) গামেদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ প্রদান করেননি। কেননা সে তার জবানবন্দিতে নিজেকে গর্ভবতী ব্যক্ত করে। অতঃপর সন্তান প্রসব ও দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাৎক্ষনিকভাবে শাস্তি কার্যকর করলে সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা ছিল। ইসলামী আইন বিশারদগণ সন্তান গর্ভধারণের ১২০ দিনের মাথায় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য করেছেন। কেননা এ সময়সীমায় গর্ভসঞ্চার (Fetus) গোশত পিন্ডে রুপান্তরিত হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে এবং তার উপর মানুষ পরিভাষা প্রযোজ্য হয়। আমাদের (ফকিহ) আইন বিশারদগণের এ অভিমত সহস্র বছর পর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে। আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট রো বনাম ওয়েড (Roe vs. wade) এর বিখ্যাত মামলায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যের বরাতে রায় দিয়েছে যে, মাতৃগর্ভে "মানব অস্তিত্ব" কে গর্ভ ধারণের তিন মাস পরে আইনত: স্বীকার করে নিতে হবে।[২৯৪]

মান ইয্যতের নিরাপত্তা

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন মানুষের মান-ইয্যতের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.

---

২৯২. *সহীহ মুসলিম*, বাবু হুজ্জাতিন্নাবিয়্যি সালণ্ডালণ্ডাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ডাম (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ২১৩৭

২৯৩. *আল কুর'আন*, ০৫:৩২

২৯৪.*আমেরিকা যুক্তরাষ্টের সুপ্রীম কোর্টের প্রতিবেদন*, অক্টোবর- ১৯৭২ খৃ., পৃ. ১৪৭, উদ্ধৃত, *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

"হে বিশ্বাসীগণ! কোনও পুরুষ যেন অপর পুরুষকে ঠাট্টা না করে কেননা, সে ঠাট্টাকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন ঠাট্টা না করে; কেননা, সে ঠাট্টাকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; বিশ্বাস স্থাপন করার পর মন্দ নামে ডাকা অন্যায়। আর যারা নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় তথ্য খুঁজিও না ও পশ্চাতে নিন্দা করো না। কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃণা করবে। আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, দয়ালু।"[২৯৫] পারস্পারিক বাক্য বিনিময়ে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

"মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ ভালবাসেন না; তবে যার উপর যুল্‌ম করা হয়েছে সে স্বতন্ত্র এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"[২৯৬] এ আয়াতে একদিকে যেমন অসাদাচরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে অন্য দিকে যালিমের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদী হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..الخ

"হে নবী আপনি বিশ্বাসীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত। বিশ্বাসী নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে; তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ব্যতিত তাদের আবরণ প্রদর্শণ না করে।" [২৯৭] লক্ষ্যনীয় যে, উল্লেখিত আয়াত সমূহে সরাসরি মুসলিমগণকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয়নি, বরং রাসূলে কারিম (স.) এর মাধ্যমে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যেখানে মুসলিমগণ ব্যক্তিগতভাবে এগুলোর উপর আমল করবে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রও এসবের পৃষ্টপোষকতা করবে। আর যেখানে এর বিরুদ্ধাচরণ হতে থাকবে সেখানে এর প্রভাব প্রতিহত করবে। এতে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, নাগরিকদের মান-মর্যাদা রক্ষায় পরিপূর্ণ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং অশ্লীলতার বিস্তার সমূলে রোধ করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[২৯৮] রাসুলে আকরাম (স.) বলেন:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْشَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি অন্য কোন লোকের মানহানি করে অথবা অন্য কোন প্রকার যুল্‌ম করে তবে সে দিন আসার পূর্বেই তার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত-যে দিন তার না থাকবে ধন-সম্পদ, আর না অন্য কিছু। অবশ্য তার নেক আমল সমূহ তার কাছ থেকে কেঁড়ে নেওয়া হবে সে যুল্‌মের পরিমাণ অনুসারে। আল্লাহ না করুন তার যদি কোন নেক আমল না থাকে মাযলুম ব্যক্তির মন্দ কাজগুলো তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে।"[২৯৯] দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'উমর (রা.) শাসকগণকে বিদায়ের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়ে পাঠাতেন: "আমি তোমাদেরকে যালিম অত্যাচারী হিসেবে নয় বরং ইমাম ও সত্য পথের দিশারী

---

২৯৫. *আল কুর'আন*, ৪৯:১১-১২

২৯৬. *আল কুর'আন*, ৪:১৪৮

২৯৭. *আল কুর'আন*, ২৪:৩০-৩১

২৯৮. *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

২৯৯. *সহীহ বুখারী*, বাবু আজ্ যুলমু যুলুমাতুন, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে নিয়োগ দান করে পাঠাচ্ছি। সাবধান! মুসলিমদের মারপিট করে তাদের অপমানিত করবে না।"[৩০০]

মান-সম্মান সংরক্ষণের ব্যাপারে কুর'আনের ভূমিকা কি তা সূরা নূরের সে ক'টি আয়াত থেকে সঠিকভাবে অনুমান করা যায়। যাতে মা 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-র উপর মদিনার মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ আরোপের কঠোর নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ তাঁর সতীত্বের সাক্ষ্য দান করেছেন। উপরন্তু তিনি মুসলিমগণকে মিথ্যা অপবাদ রটানো এবং আপত্তিকর অভিযোগ থেকে বেঁচে থাকার জোর তাকিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; এটাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; ওদের প্রত্যেকের জন্য ওদের কৃত পাপকর্মের ফল আছে এবং ওদের মধ্যে যে এর প্রধান ভূমিকায় ছিল তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎধারণা করেনি এবং বলেনি 'এ তো নির্জলা অপবাদ।' তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহ্‌র বিধানে মিথ্যাবাদী। ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ কথা প্রচার করছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র কাছে এ ছিল গুরুতর বিষয় এবং যখন তোমরা এ শুনলে তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্‌ই পবিত্র, মহান। এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনও এরূপ আচরণ পুনরায় করো না। আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাঁর বাক্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।"[৩০১] আল কুর'আনুল কারিম এমনিতেই প্রত্যেক ব্যক্তির মান-মর্যাদা সংরক্ষণের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত রমণীদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষাকল্পে আরও অসাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সূরা নূরে আরো বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

"যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও

---

৩০০. আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, উর্দূ অনু, পৃ. ৩৬৭ ; উদ্ধৃত, *ইসলামে মানবাধিকার*, অনু. মুহাম্মাদ আবু তাওয়াম (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল, এপ্রিল-১৯৯২), পৃ. ২২৯

৩০১. *আল কুর'আন*, ২৪:১১-১৯

তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে, যে দিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।[৩০২] এতো অনিবার্য সত্য যে, মুসলিমগণের ইতিহাসে অত্যাচার, যুল্‌ম, নির্যাতন, বল প্রয়োগ ও কঠোরতা প্রদর্শনের বহু সংখ্যক উপাখ্যান ও কাহিনীগ্রন্থের কোনটিতে এমন কোন ঘটনা পরিদৃষ্ট হয় না যে, কোন শাসক তার প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করার জন্য তাদের কন্যা-জায়া-মা-বোনদের ইয্যত-আবরু লুণ্ঠন করেছে।[৩০৩]

ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা

আল কুর'আন মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয় তা দিয়েছে। ব্যক্তির ঘরের চার দেয়ালকে একটা সুরক্ষিত দূর্গের মর্যাদা দিয়েছে, যেখানে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কারো নেই। এ পর্যায়ে কুর'আনের নির্দেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তবে তোমাদের যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হয় ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না; যদি তোমাদের বলা হয় 'ফিরে যাও' তবে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, আর আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানেন।"[৩০৪] খোদ নবী কারিম (স.) এর বাড়িতে সাহাবায়ে কেরামের প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে আয়াত নাযিল করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবীগৃহে প্রবেশ করো না। তবে, তোমাদের আহবান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, কারণ তা নবীর জন্য কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদের বিবাহ করা কখনও সংগত নয়। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ।"[৩০৫]

নবী কারিম (স.) বাড়িতে প্রবেশের সময় আওয়াজ দিয়ে কিংবা দরজা খটখটিয়ে প্রবেশ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, যাতে মা, বোন এবং কন্যাদের প্রতি এমন অবস্থায় দৃষ্টি না পড়ে যা মানুষকে নৈতিকতা বিরোধীদের কাতারে নামিয়ে ফেলতে পারে। যে বাড়িতে লোক বসতি নাই সে স্থান এ কঠোর নির্দেশের বহির্ভূত। আল্লাহ বলেন:

---

৩০২. *আল কুর'আন*, ২৪:২৩-২৫

৩০৩. *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৩০৪. *আল কুর'আন*, ২৪:২৭-২৮

৩০৫. *আল কুর'আন*, ৩৩:৫৩

Dhaka University Institutional Repository

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

"বসতিহীন গৃহে তোমাদের উপকরণ থাকলে সেখানে প্রবেশে কোনও পাপ নেই এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।"[৩০৬]

অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করে শুধুমাত্র প্রয়োজন মাফিক অবস্থান প্রসঙ্গেও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে কোন জিনিস গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তা পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিতে হবে। অনুরূপভাবে ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মেরে তাকানো নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) বলেন: "কেউ কারো ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মেরে তাকালে তার চক্ষু ক্ষত-বিক্ষত করে দাও। এর কোন বিচার নেই।" তিনি অন্যের চিঠি পত্র পড়া কিংবা পড়ার সময় সেদিকে গভীর মনোযোগে তাকাতে নিষেধ করেছেন।

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন একজন ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ করার সাথে সাথে মুসলিমদের এভাবেও তাগিদ দিয়েছে যে, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের গোপনীয়তা ফাঁস করবে না। ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য উদঘাটন করবে না এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষণে ব্যাপৃত থাকবে না।[৩০৭] মানুষ অন্যের গোপণ বিষয় অন্বেষণের দ্বারা তার দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। যদি এক্ষেত্রে তার দোষত্রুটি ও দুর্বলতা তার জ্ঞানে ধরা পড়ে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে সে আনন্দ পায়। এভাবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বদনাম ও অপমানের কারণ হয়ে পড়ে। আল কুর'আনুল কারীম অন্যের ছিদ্রান্বেষণ ও পরনিন্দা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।[৩০৮] রাসূলে আকরাম (স.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি অন্যের দোষত্রুটি দেখে তা গোপন রাখল সে যেন একজন জীবন্ত সমাহিত ব্যক্তিকে রক্ষা করল।"[৩০৯] তিনি আরো বলেন:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার একটি বিপদ দূর করে দিবে আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের অভাব মোচন করে দিবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অভাব মোচন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।[৩১০] হযরত 'উমর ফারূক (রা.)-র খিলাফত কালের একটি ঘটনা। এক যুবতী শরী'আতের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেবার তার জীবন রক্ষা পেল। পরে সে কৃত অপরাধের জন্য খাঁটিভাবে তওবা করল। অনন্তর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করার জন্য পয়গাম পাঠাল। সে তার অপকর্ম সম্পর্কে জানত না। অভিভাবক হযরত উমার (রা.) এর কাছে এসে আরজ করলেন হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি কি সে ঘটনাটি বলে দিব? তিনি বললেন আল্লাহ তা'আলা যা গোপন রেখেছেন তা প্রকাশ করে দিতে চাচ্ছ? আল্লাহর শপথ তুমি একথা কারো কাছে ফাঁস করে দিলে আমি তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিব। যাও একজন সতী-সাধ্বী নারীর ন্যায় তার বিবাহের ব্যবস্থা কর।[৩১১]

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার

---

৩০৬. *আল কুর'আন*, ২৪:২৯

৩০৭. *আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

৩০৮. *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৩০৯. *মুসনাদু আহমাদ*, বাবু হাদিসি 'উকবা ইব্ন 'আমের, আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৬৬৯৩

৩১০. *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফাদলুল ইজতিমায়ে 'আলা তিলাওয়াহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৪৮৬৭

৩১১. *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নাগরিকের অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক করার অনুমতি নেই। শুধুমাত্র সন্দেহ ও অনুমান বশত লোকদের গ্রেপ্তার করা কিংবা আদালতে বিচার ব্যবস্থা কার্যকর করা ব্যতিরেকে কাউকে গ্রেফতার করা ইসলামে আইনসিদ্ধ নয়। বর্তমানে দেশে দেশে বিভিন্ন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই বহু লোককে গ্রেফতার করে নির্যাতন ও রিমান্ডের নামে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ অন্যায় যা কিছু করা হচ্ছে ইসলামী আইনে কস্মিনকালেও তার অবকাশ নেই। কুর'আনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন কোন শাসক তো দুরের কথা খোদ আল্লাহর রাসূলেরও তা খর্ব করার অধিকার নেই। বর্ণিত হচ্ছে:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

"কোন মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুয়াত দান করেন, সে বলে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও, 'বরং আল্লাহওয়ালা হও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং অধ্যয়ন কর।' "[৩১২]

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

'তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সালিশ মানব, যদিও তিনিই অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব? যাদের কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে নিশ্চয় তা তোমার রবের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি সংশয়বাদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৩১৩] এতদ সম্পর্কিত বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এ যে, যতদুর সম্ভব অভিযুক্তের শাস্তি বৃদ্ধি নয় বরং লাঘবের চেষ্টা করতে হবে। বিচারককে একটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে, অপরাধীকে ভুল বশত ক্ষমা করে দেয়া ভুলবশত শাস্তি দেওয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ শাস্তির জন্য নয় বরং মুক্তির জন্য অনুসন্ধান করতে হবে। রাসূলে আকরাম (স.) এর ভাষ্য হচ্ছে, যতদুর সম্ভব নাগরিককে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, সুযোগ থাকলে তাকে ছেড়ে দাও। রাসূল (স.) আরো বলেন "বাঁচানোর কোন পথ পাওয়া গেলে মানুষকে শাস্তি থেকে মুক্তি দাও।"[৩১৪] রাসূলে আকরাম (স.) এর জীবদ্দশায় এমন বহু ঘটনা উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

একজনের অপরাধের জন্য অন্যজন দায়ী হবে না

আল কুর'আনুল কারিম অলঙ্ঘনীয় ঐতিহাসিক বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, একজনকে আরেকজনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"বলুন, আমি কি আল্লাহকে ছাড়া অন্য প্রভুকে খুজব? অথচ তিনিই সব কিছুর রব। প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের

---

৩১২. *আল কুর'আন*, ০৩:৭৯

৩১৩. *আল কুর'আন*, ০৬:১১৪

৩১৪. *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, বাবু আল হুদূদ (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ২৫৩৫

নিকটেই ফিরবে, তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।"[৩১৫]

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

"আর তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না বিপর্যয় দূর হয়। আর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা না হয়। যদি তারা বিরত হয়, তবে যালিমদের ব্যতিত আর কাউকে আক্রমণ করবে না।"[৩১৬]

পারিবারিক সমস্যার সমাধান

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে আদি প্রতিষ্ঠান সুবিন্যস্তভাবে অবিরাম অবদান রেখে চলেছে, এর নাম পরিবার। একই উৎস হতে বিস্তৃত নারী-পুরুষের সমাজ স্বীকৃত ও আইনসম্মত বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলার রীতি অনাদিকাল থেকেই সমাজে প্রচলিত রয়েছে। মানবজাতির বিস্তৃতি ও বংশ বৃদ্ধির নিমিত্তে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে তথা নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুজগত ও প্রাণীজগতের সবই এ নিয়মে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে নিজ নিজ অস্তিত্ব, বিস্তৃতি ও বিকাশের জন্য তাদের অতিরিক্ত কোন নিয়ম মানতে হয় না বা নিয়ম মানার কোন এখতিয়ার তাদের নেই। তারা সবাই মহান আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ব্যতিক্রম। তার এখতিয়ার রয়েছে কোন কিছু করা বা না করার। সে তার সমগোত্রীয় কোন পুরুষ বা নারীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়তে পারে বা একাকি চলারও ক্ষমতা রাখে। দাম্পত্য সম্পর্ক গড়াটা স্বাভাবিক এবং একাকি চলাটা ব্যতিক্রম। মানুষের স্বাভাবিক জীবন চলার পথকে অব্যাহত রাখতে, শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল করতে তাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেহেতু তার কোন কিছু করা বা না করার এখতিয়ার রয়েছে, সেহেতু সে কোনটা করবে আর কোনটা করবে না, তা নিয়ন্ত্রণের জন্যই তাকে তা মানতে হয়। বিশেষ করে যেসব বিষয়ে তার দুর্বলতা রয়েছে যেমন নারীর প্রতি পুরুষ এবং পুরুষের প্রতি নারী খুবই দুর্বল। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। তাছাড়া কাম-ক্রোধ, মোহ-লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মসাৎ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হিংস্রতা ইত্যাদি বিষয়েও তাকে ইসলাম ও সমাজের নিয়ম মেনে চলতে হয়। কাজেই জীবন চলার পথে স্তরে স্তরে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে তাকে নিয়মের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়। বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন গঠন ও এর সুষ্ঠুতা-যথার্থতা রক্ষা করে চলা এ নিয়মেরই একটি। কুর'আন নাযিলের পূর্বে তৎকালীন আরবসহ গোটা বিশ্বে সামাজিক যে অনিয়ম ও মারাত্মক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। আল কুর'আনই এর সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থা দান করেছে।

সামাজিক সমস্যার সমাধান

আল কুর'আনের চিরন্তন আহবান হচ্ছে শান্তি রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। এমনকি সামাজিক পরিবেশেও শান্তি সমৃদ্ধির যাবতীয় ব্যবস্থা সুস্পষ্টভাবে কেবলমাত্র আল কুর'আনই উপস্থাপন করেছে। বলা চলে বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে এ হচ্ছে প্রথম ধাপের অন্তর্ভুক্ত। আল কুর'আনে এসেছে:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

''আর সন্ধি-সমৃদ্ধিই সর্বোত্তম ও সর্বাধিক কল্যাণের বাহক।"[৩১৭]

---

৩১৫. *আল কুর'আন*, ০৬:১৬৪

৩১৬. *আল কুর'আন*, ০৬:১৬৪

৩১৭. *আল কুর'আন*, ০৪:১২৮

Dhaka University Institutional Repository

আল কুর'আন সব পুরুষ এবং নারীর মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেছে। তাদের মধ্যে কোন বিরোধ বা বিবাদ দেখা দিলে তা দূর করে অবিলম্বে সন্ধি কায়েম করে সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। বলা হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"নিশ্চয় বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই; তাই তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও।"[৩১৮]

আর মুসলিমদের দুই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাঝে যদি কোন বিবাদ কিংবা যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে গোটা মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের মধ্যে অনতিবিলম্বে মিমাংসা করে দেয়া। প্রয়োজনে সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করা। তাকে মিমাংসা মেনে নিতে বাধ্য করা। ঘোষিত হচ্ছে:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"আর যদি বিশ্বাসীদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; তারপরও একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকারিদের ভালবাসেন।"[৩১৯]

আল কুর'আনের এসব আদেশ ও বিধানের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হচ্ছে সামাজিক শান্তি রক্ষা করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যেন পৃথিবীর মানুষ পরম শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে জীবন যাপন করতে পারে। আল কুর'আনের এ লক্ষ্য যেমন মুসলিম জনগণের মাঝে, তেমনি সমগ্র মানব সমাজের মাঝেও নিবদ্ধ। তাই আল্লাহ বলেছেন:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন; আর আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩২০] বস্তুত আল কুর'আনই পৃথিবীতে সকল দিকের এবং বিভাগের ক্ষেত্রে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার রোডম্যাপ দিয়েছে। নিম্নোক্ত সামাজিক সমস্যাগুলোর সুস্পষ্ট সমাধান আল কুর'আন দিয়ে রেখেছে, তা হচ্ছে:

অজ্ঞতা ও মূর্খতার মূলোৎপাটন

দ্বীন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার। মানুষকে এই জ্ঞানার্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ নেই। সর্বসাধারণের জন্য নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য জ্ঞানার্জনের দ্বার পুরোপুরি উন্মুক্ত থাকতে হবে। এজন্যই আল্লাহ কুর'আন নাযিল শুরু করেছেন 'পড় তোমার প্রভুর নামে' এ আদেশদানের মধ্য দিয়ে। কেউ এ সুযোগ পাবে আর কেউ পাবে না, কুর'আনের দৃষ্টিতে তা নিতান্তই অবিচার। কুর'আন মাজিদ জ্ঞানার্জনের জন্য নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছে। কুর'আন মাজীদে যারা শিক্ষিত ও যারা অশিক্ষিত তারা সমান নয় এ ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

---

৩১৮. *আল কুর'আন*, ৪৯:১০

৩১৯. *আল কুর'আন*, ৪৯:০৯

৩২০. *আল কুর'আন*, ৬০:১৭

Dhaka University Institutional Repository

'বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[৩২১] আল কুর'আনে আরো বলা হয়েছে:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হোক, যেন তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং (নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে) ফিরে এসে যাতে (তারা) আত্মরক্ষা করে চলে সেজন্য স্বজাতিকে সতর্ক করতে পারে।"[৩২২] রাসূলে কারিম (স.) বলেছেন:

طلب العلم فريضة علي كل مسلم

''জ্ঞানানুসন্ধান প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।''[৩২৩]

অপরাধ দমন

আশাবাদ এবং শান্তি, সন্তোষ ও ভালবাসা, মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তি মু'মিনের হৃদয়লোকে সুদৃঢ়ভাবে বসা ঈমান বৃক্ষের মিষ্টি ফল। ঈমান বৃক্ষের ফল প্রচুর ও বিপুল। জীবন সংগ্রামের প্রতিটি বাঁকে এ ক্ষেত্রে তার যোগান আসে অফুরন্তভাবে। জীবন সংগ্রাম একটা দীর্ঘ অবিশ্রান্ত সাধনা। এখানে পদে পদে বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট লেগেই আছে। মানুষের বৈষয়িক জীবনের প্রকৃতিই এমন। বিপদশূণ্য জীবন এখানে সম্ভব নয়। দুঃখ, বিপদ ও কষ্টে পড়েনি, এমন একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। ফলে মানুষের কত কাজ ব্যর্থ হয়ে যায়, কত আশা-আকাঙ্খায় তাকে হতে হয় ব্যর্থ, বঞ্চিত। হয় তার কোন আপনজনের মৃত্যু ঘটে, না হয় তার শরীর হয় রোগাক্রান্ত কিংবা হয় তার ধন-মালের ক্ষয়-ক্ষতি। এসব ঘটনা দুর্ঘটনাই তো মানুষের জীবনকে কানায়-কানায় ভরে রেখেছে। এ হচ্ছে আল্লাহর জারী করা স্থায়ী নিয়ম। সাধারণভাবে জীবন মাত্রেরই এ যখন আল্লাহর নিয়ম, তখন বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালনকারী যে অধিকতর বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, সে আর বিচিত্র কি? বিশেষভাবে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যারা জন-সমাজে আবির্ভূত হয়, তাদের প্রথমেই সংগ্রাম করতে হয় আল্লাহদ্রোহী শক্তিগুলোর সাথে। কেননা, এ শক্তিগুলো মানব সমাজ থেকে আল্লাহর দ্বীনকে নির্মূল করে কায়েম করতে চায় শয়তানি রাজত্ব। তাঁরা যখন সত্যের আওয়াজ উচ্চ করে প্রচার করতে সচেষ্ট হয়, তখনই বাতিলপন্থীরা হয় তাঁদের প্রতি খড়গহস্থ। তাঁদের উপর অমানুষিক আক্রমণ চালায় নির্মমভাবে। তাঁরা মানুষকে চিরন্তন কল্যাণের দিকে আহবান জানায়, বাতিলপন্থীরা তখন সে আহবানকে স্তব্ধ করে দেয়ার অসৎ মতলবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তাঁরা বলে ন্যায় পথে চলতে, অন্যায় পথের পথিকরা তাদের টানতে চেষ্টা করে মহা ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে। তখন সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ কারণে সত্যদ্বীনপন্থী মানুষকে এক চিরন্তন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের মধ্যেই জীবন যাপন করতে হয়। এ জীবনে কত দিক দিয়ে কত আঘাত যে আসতে থাকে, তার আর কোন হিসাব করা যায় না। মানব ইতিহাসে আমরা এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) এর সঙ্গে সঙ্গেই ইবলিসকেও পাঠিয়েছেন দুনিয়ায়। ইবরাহীম (আ.) এর সময় নমরুদ, মূসা (আ.) এর সঙ্গে ফিরআউন আর হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর সময় ছিল আবু জাহেল, আবু লাহাব, উতবা ও শাইবা প্রমুখ কাফিররা। এ পর্যায়ে কুর'আন মাজিদে বলা হয়েছে, 'এমনি করেই আমরা প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি সব পাপিষ্ঠ ও অপরাধ প্রবণ লোকদের।' নবী-রাসূলগণের অবস্থাই এই। তাদের উত্তরাধিকারী তাদের পথের অনুসারী এবং তাদের দ্বীনি দাওয়াতের ধারক-বাহকদের অবস্থাও অনুরূপ হতে বাধ্য। আল্লাহর পথ

---

৩২১. *আল কুর'আন*, ৩৯:০৯

৩২২. *আল কুর'আন*, ০৯:১২২

৩২৩. *সুনানু ইব্ন মাযাহ*, বাবু ফাদলিল 'উলামা, আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ফিরিয়ে রাখতে সচেষ্ট লোকদের সাথে তাদের সংঘর্ষ ও সংগ্রাম হবেই। এ থেকে কখনো নিস্কৃতি পাওয়া যেতে পারে না।[৩২৪] এর ব্যতিক্রম হয় না কখনো। আল কুর'আন ঘোষণা করছে:

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"কাফিররা ঈমানদার লোকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে ছিল শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহর উপর।"[৩২৫] আর সত্যপন্থিদেরও কর্তব্য হচ্ছে অন্যায়-অসত্য এবং তাগুতি শক্তির কাছে মাথা নত না করে সত্যের কালিমাকে উঁচ্চ আওয়াজে তুলে ধরা। রাসূলে আকরাম (স.) বলেছেন:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِفَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِفَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমাদের কেউ যখন অন্যায় কর্ম দেখবে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে, এতে যদি সে সক্ষম না হয় তবে জিহবা দ্বারা, এতেও যদি সে সক্ষম না হয় তবে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে আর এটাই ঈমানের দূর্বলতম অংশ।"[৩২৬] হযরত রাসূলে কারিম (স.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন লোকদের উপর সর্বাধিক বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ কষ্ট নেমে আসে। জবাবে তিনি বলেছিলেন:

الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِفَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

'সব চাইতে বেশী বিপদ আসে নবী রাসূলগণের উপর, তাদের পরে যারা নিকটবর্তী তাদের উপর। এভাবে আরো নিচের দিকে চলতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তার দ্বীনদারী অবস্থানুযায়ী। যার দ্বীনদারী অতিশয় শক্ত, তার উপর পরীক্ষা আসে অত্যন্ত কঠিন। আর যার দ্বীনদারী নমনীয়, তাকে তার দ্বীনদারীর অবস্থানুপাতে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে আল্লাহর বান্দাগণের উপর বিপদ ও পরীক্ষা আসতেই থাকবে যতদিন সে দুনিয়ায় চলতে ফিরতে থাকে বিপদ পরীক্ষা আসা বন্ধ হবে না। এমনিভাবে তার সব গুনাহ-খাতা নিঃশেষ হয়ে যাবে।'[৩২৭]

দুর্নীতি প্রতিরোধ

দুর্নীতি একটি ব্যাপক পরিচিত শব্দ। দুর্নীতির গতি-প্রকৃতি বহুমুখী এবং বিচিত্র ধরনের বিধায় এর সংজ্ঞা নিরুপণ সহজ নয়। দুর্নীতি সমাজের প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থি বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ। দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, পদবী প্রভৃতির অপব্যবহার সংশ্লিষ্ট। দুর্নীতি হল দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ। স্ব-স্ব পেশার মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে কৃত অপরাধমূলক আচরণই হল দুর্নীতি।[৩২৮] ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী রমনাথ শর্মার মতে : In corruption a person wilfuly neglected his

৩২৪. *অন্যায় ও অসত্যের বির"দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০

৩২৫. *আল কুর'আন*, ৮৫:০৮

৩২৬. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত

৩২৭. *সুনানু আততিরমিযী*, বাবু মা জা'আ ফিস সবরি 'আলাল বালা, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২৩২২

৩২৮. *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭

specified in order to have an undue advantage. অর্থাৎ অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই দুর্নীতি।[৩২৯]

দুর্নীতি প্রতিরোধে আল কুর'আন

মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি হিসেবে অনেক মহৎ গুণের অধিকারী। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু জন্মগত কারণে নয় বরং তার এ শ্রেষ্ঠত্ব মূলত তার বিবেক-বুদ্ধি, ভাল-মন্দ পৃথকীকরণের যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবতা, পরোপকার প্রভৃতি মানসিক উন্নত গুণের কারণে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"আমি অবশ্যই আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি ওদের উত্তম জীবিকা দান করেছি এবং তাদেরকে অধিকাংশ সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৩৩০] কিন্তু মানুষ তা সত্ত্বেও নিজের অন্তর্নিহিত কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় নানা রকম অন্যায় ও অবৈধ কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এর ফলে তার অন্যান্য মানবিক মর্যাদাই শুধু ভুলুণ্ঠিত হয় না, সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বহু ক্ষেত্রে বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রকে অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে যুগে যুগে ও দেশে দেশে বহু জ্ঞানী-গুণী মনীষী,, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক ও মহাপুরুষগণ নানা পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা, দুর্নীতিবাজকে শাস্তি প্রদান করা, দুর্নীতি দমনে কঠোর আইন প্রণয়ন এমনকি দুর্নীতিবাজদের চারিত্রিক সংশোধনের জন্যও নানারূপ নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না, বরং দুর্নীতি দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে দুর্নীতি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যর্থতা শুধু বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোই বরণ করছে না বরং পশ্চাতের দেশগুলোয়ও একই দৃশ্য চোখে পড়ে।[৩৩১]

এ ক্ষেত্রে মহাগ্রন্থ আল কুর'আনই দুর্নীতিমুক্ত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের মহোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং করছে। আল কুর'আনের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিকারই উত্তম ব্যবস্থা। তাই আল কুর'আন দুর্নীতি সংঘটনের পরই তার প্রতিকারের পদক্ষেপ নেয় না; বরং দুর্নীতির মন-মানসিকতা, সুযোগ ও সম্ভাবনাকে আগে ভাগেই বন্ধ করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে মানবমন্ডলী! যমিনের হালাল ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য থেকে তোমরা আহার কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩৩২] আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য তাদেরকে স্বর্গীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অসংখ্য নবী এবং রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী ও রাসূলগণের আগমনের এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন আমাদের প্রিয় নবী (স.)। [৩৩৩] এ পৃথিবীতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল পথভ্রষ্ট মানবমন্ডলীকে সঠিক পথ দেখানো, তাদেরকে হালাল-হারামের শিক্ষা প্রদান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করা। তাদেরকে অন্যায়ের

---

৩২৯. Ramnath Sharma, *Indian Social Problems* (Bombay: Media Promoters & Publishers Pvt.Ltd. 1982), P. 101; উদ্ধৃত, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

৩৩০.*আল কুর'আন*, ১৭:৭০

৩৩১. *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

৩৩২. *আল কুর'আন*, ০২:১৬৮

৩৩৩. *আল কুর'আন*, ৩৩:৪০

পথ থেকে ফিরিয়ে ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দেয়া। তাইতো রাসূলে আকরাম (স.) দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: "বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যা দান-সাদকা করে তা কবুল করা হবে না। তা থেকে যা সে ব্যয় করে তাতে বরকতও হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয় মাত্র।"[৩৩৪] মহানবী (স.) আরো বলেছেন: "এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে। তার মাথার চুল এলোমেলো, উস্কো-খুস্কো, পদযুগল ধূলা-মলিন। সে তার দুটি হাত উপরের দিকে তুলে বার বার দু'আ করে আল্লাহ! আল্লাহ! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম, হারাম খাদ্যে সে লালিত-পালিত হয়েছে। এহেন ব্যক্তির দু'আ আল্লাহর কাছে কি করে কবুল হতে পারে?"[৩৩৫] তিনি আরো বলেছেন: "মানুষের খাদ্যের মধ্যে সে খাদ্যই কেবল উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে।"[৩৩৬] এভাবে রাসূলে আকরাম (স.) দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত হারাম সম্পদের অপকারিতা এবং স্বীয় কষ্ট ও পরিশ্রম করে উপার্জিত হালাল সম্পদের উপকারিতার কথা বর্ণনা করে মানবমন্ডলীকে সকল প্রকারের দুর্নীতি থেকে বিরত থাকার সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং দুর্নীতি উচ্ছেদে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। এর ফলে মানবমন্ডলী পেল সঠিক পথের সন্ধান। তাঁর আমলে তাঁর সাহাবীগণের মাঝে ছিল না কোন দুর্নীতির ছিটা-ফোটা। রাসূলে আকরাম (স.) এর এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আজও যদি দুর্নীতি দূর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তবে আজও সম্ভব পৃথিবী থেকে যাবতীয় দুর্নীতি দূরীভূত করা। কারণ ব্যক্তি যখন বুঝতে সক্ষম হবে যে, সে দুর্নীতি করে যা উপার্জন করছে এটাই একদিন তার ক্ষতির কারণ হবে, এর কারণে আল্লাহর কাছে তার কোন ভাল আমলই কবুল হবে না, আর পরকালে জাহান্নামই হবে তার একমাত্র ঠিকানা, তখন আশা করা যায় যে, এ ব্যক্তি আর কখনো দুর্নীতিতে জড়াবে না। এভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে যাবতীয় দুর্নীতি দূরীভূত করা সম্ভব।

মাদক নিয়ন্ত্রণ

মদের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

মদ্য পানে অভ্যস্ত হয়ে কত ধনী ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে গেছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। মদ্যপানে যে অর্থব্যয় হয়, তা সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই চরম বিপর্যয় নিয়ে আসে। এর দ্বারা একটি মানুষেরও একবিন্দু কল্যাণ সাধিত হয় না। অথচ এই অর্থ দিয়ে অসংখ্য অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে পেটভরে খাবার খাওয়ানো যায়, বস্ত্রহীনকে কাপড় দিয়ে, আশ্রয়হীনকে ঘর বানিয়ে দিয়ে, রোগাক্রান্তকে ওষুধ ও চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে মানুষের মর্যাদা দিয়ে বাস করার সুযোগ করে দেয়া যায়। এক একটি দেশে কত টাকার মদ পান করা হয় তার হিসেবটা সামনে রাখলেই স্পষ্টত এর সত্যতা বোঝা যায়। তাই আল কুর'আন জাতীয় সম্পদের এ অপচয় বরদাশত করতে রাজি হয়নি।

বস্তুত কুর'আন মাজিদ মানুষকে পরম কল্যাণ লাভের লক্ষ্যে সচেষ্ট ও সক্রিয় হওয়ার জন্যই আহবান জানিয়েছে। এ কল্যাণ শুধু পারলৌকিক নয়, ইহকালীনও। কেবল নৈতিক ও আকীদা বিশ্বাসগত কল্যাণই নয়, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক কল্যাণও। মানবতার এ সার্বিক ও সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের লক্ষ্য। রাসূলে কারিম (স.) এ উদ্দেশ্যেই দিন-রাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি যেমন রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন তেমনি সাথে সাথেই রাষ্ট্রের ধন-ভান্ডারকে সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

---

৩৩৪. *মুসনাদু আহমাদ* (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৩৪৯০

৩৩৫. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয-যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৬৮৬

৩৩৬. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৯৩০

Dhaka University Institutional Repository

মদ সভ্যতা ও মানবতার দুশমন

মদ্যপান তথা মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক সমস্যা। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দেয় মদ্যপানের কারণে। শারীরিক বিভিন্ন রোগ-শোক এসে ভর করে। লিভারে চর্বি জমে, লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস হয়। লিভার সিরোসিসের মতো জটিল রোগও দেখা দিতে পারে।[৩৩৭] মুখের ঠোঁট থেকে শুরু করে খাদ্যনালির বিভিন্ন অংশে মরণব্যাধি ক্যান্সার হতে পারে। হতে পারে পাকস্থলির প্রদাহ বা গ্যাস্ট্রাইটিস। অগ্নাশয়ের প্রদাহ বা প্যানক্রিয়াটাইটিসও হতে পারে। ওপরের পেটে প্রচন্ড ব্যাথা। রক্তের চর্বির পরিমাণ বাড়ে। রক্তনালির দেয়ালে চর্বি জমে। ফলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ। বেড়ে যায় হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি। মানসিক অশান্তি ও নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। শরীর হারায় শারীরিক ভারসাম্য। এর ফলে মারামরি, ছিনতাই, আত্মহত্যা, নারী ঘটিত সামাজিক অন্যায়, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মারাত্মক মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয় এবং মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।[৩৩৮]

বর্তমানে শ্লোগান উঠেছে, মাদককে না বলুন। অথচ আল কুর'আন আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই মাদককে না বলে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষ বিপথগামী হয়েছে। আল্লাহকে ভুলে নানা অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। তাইতো যুগেযুগে নবী-রাসূলদের আগমন হয়েছে মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে, আল্লাহর পথে নিয়ে আসতে। ইসলামের শুরুর দিকে খোদ আরব দেশেও আর দশটা অন্যায় অত্যাচারের ন্যায় মদ, জুয়া ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ মদ পানের কারণেই তখনকার সমাজে নানা অনাচার হতো। এক সময় কয়েকজন সাহাবি রাসূলে আকরাম (স.)-কে মদ, জুয়া ইত্যাদির খারাপ দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। পবিত্র কুর'আনের আয়াত নাযিল হলো, মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বললেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

"আপনার কাছে মানুষ শরাব এবং জুয়ার সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন। ঐ দু'টি জিনিসের মধ্যে খুবই খারাবি রয়েছে। যদিও এর মধ্যে মানুষের জন্যে কিছু কিছু উপকারও রয়েছে। তবে এর লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অনেক বেশী।"[৩৩৯] তাৎক্ষণিকভাবে মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়নি। মানুষ তাৎক্ষণিক মদ ও জুয়া পুরোপুরি বর্জন করেনি। পরবর্তী সময়ে আয়াত নাযিল হয়েছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

"হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছ কখনো নেশাগ্রস্থ হয়ে নামাজের ধারে কাছেও যেও না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এতুটুকু নিশ্চিত না হবে যে তোমরা যা কিছু বল তা ঠিক ঠিক জানতে ও বুঝতে পারছ। আবার অপবিত্র অবস্থায়ও নামাযের কাছে যেও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে, তবে সফর

---

৩৩৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, *মু'জামুল কুর'আন* (ঢাকা: ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১২), পৃ. ১১০৪

৩৩৮. অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুলণ্ঢাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য*, ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪০

৩৩৯. *আল কুর'আন*, ০২:২১৯

অবস্থায় থাকলে তা ভিন্ন কথা, আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড় অথবা প্রবাসে থাক, কিংবা কেউ যদি পায়খানা থেকে ফিরে আসে অথবা তোমরা যদি কামাসক্ত হয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ কর তাহলে পানি দিয়ে নিজেদের পরিস্কার করে নিবে। তবে এ অবস্থায় যদি পানি না পাও, পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নিবে এবং তার পদ্ধতি হচ্ছে: তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত মাসেহ করে নিবে। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা গুনাহ মার্জনাকারী-পরম ক্ষমাশীল।"[৩৪০] এভাবে ধীরে-ধীরে মানুষকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সব শেষে এ সম্পর্কিত নির্দেশ এসেছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা জেনে রেখো, মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণায়ক শর এর সবই হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করো। শয়তানতো চায় এ মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মাঝে একটা শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে এবং এভাবে মদ ও জুয়ার চক্করে ফেলে সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে, তোমরা কি একাজ থেকে ফিরে আসবে না ?"[৩৪১] যে মদ শুধু শরীরের জন্য এত ক্ষতিকর, আল কুর'আন কত আগেই না তা নিষিদ্ধ করেছে! আমরা যেন আল কুর'আনের বিধান মেনে মদ্যপান তথা সব নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থেকে স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপন পালন করতে পারি।

উপরোক্ত আয়াত তিনটিতে মদের ক্ষতিসমূহ সম্পর্কে পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। মদ তৈরীর প্রধান উপাদান এ্যালকোহল মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যা বিভিন্ন জটিল কাজে রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথম মুখ থেকেই শুরু হয়। মুখে সাধারণত লালা সদৃশ এক ধরনের পদার্থ থাকে। মদ পান করার কারণে মুখের লালা উৎপাদনের শক্তি ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে, ফলে মাড়িতে ক্ষত এবং ফোলা দেখা দেয়। সুতরাং মদপানে আসক্ত ব্যক্তিদের দাঁতগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এরপর কণ্ঠ ও খাদ্যনালিতে প্রভাব দেখা দেয়। উক্ত অঙ্গ দু'টি সংবেদনশীল নরম আবরণ দ্বারা গঠিত। মদ পান করার কারণে উক্ত আবরণটির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, ফলে অঙ্গদ্বয় ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে এবং ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। মদ পান করার কারণে পাকস্থলিতে এক প্রকার ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি হয়। রক্তে লিপিড (Lipid) নামক এক প্রকার চর্বি থাকে যা শরীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ করে। মদ পানের কারণে লিপিড (Lipid) গলে যায়। মদের বড় ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ডিওডেনামের উপর। ডিওডেনাম খুবই স্পর্শকাতর একটি অঙ্গ। তা হজমের জন্য এক প্রকার এনজাইম তৈরী করে। মদের প্রভাবে এ এনজাইম তৈরীর প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলে খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। মদ লিভারের কাজেও বাধা সৃষ্টি করে, ফলে লিভারের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও নিজ কাজ ঠিকমত করতে পারে না। মদে অভ্যস্ত ব্যক্তির কণ্ঠও খাদ্যনালী, পাকস্থলী, ডিওডেনিয়াম, লিভার, ইত্যাদি আক্রান্ত হওয়ার পর শরীর অভ্যন্তরে নানা প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে হজম শক্তি ধ্বংস হয়, মুখ, খাদ্যনালি, পাকস্থলী, ডিওডেনিয়াম, লিভারে ক্যান্সারের মত

---

৩৪০. *আল কুর'আন*, ০৪ : ৪৩

৩৪১. *আল কুর'আন*, ০৫:৯০-৯১

ঘাতক ব্যাধির সৃষ্টি হয়, শরীরে মেদ জমে। চর্বির আধিক্যের কারণে হৃদরোগ দেখা দেয় এবং সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিডনী। এর প্রভাবে কিডনীর বিপজ্জনক পরিণাম হলো কিডনী সংকুচিত হওয়া। নিয়মিত পানকারীর কিডনী তার জীবদ্দশাই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হৃদযন্ত্রের পেশীর উপর সরাসরি এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। এর প্রভাবে রক্তে (HDL)-এর মাত্রা কমে যায় এবং (LDL)-এর মাত্রা বেড়ে যায়। রক্তচাপের ভারসাম্যতা বিনষ্ট হয়। হৃদযন্ত্র এবং বাল্বের সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিয়মতান্ত্রিক রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে, দুর্বলতা ও অবসন্নতার সৃষ্টি হয়, মানসিক ভারসাম্যতা নষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত হার্টফেল করে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।[৩৪২]

আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, মদ পান করো না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের দরজাস্বরূপ।[৩৪৩] খাব্বাব (রা.)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবধান! মদ পরিহার কর। কারণ মদের পাপ অন্যান্য সমস্ত পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয়, যেমন তার গাছ (আঙ্গুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর ছড়িয়ে যায়।[৩৪৪]

আজকে দিকে দিকে শ্লোগাণ শুনা যায় 'মাদককে না বলুন'। শ্লোগাণ আছে ঠিকই কিন্তু মাদকতো বন্ধ হচ্ছে না। এখনো দেশে দেশে পাঁচ তারা, সাত তারা হোটেলগুলোতে নিয়মিত মদ্যপানের আড্ডা বসছে, প্রতিনিয়ত সেখানে মদের নতুন নতুন আইটেম যোগ হচ্ছে। সর্বত্রই যেন মদের ছড়াছড়ি। চিন্তা করার বিষয় যে, মহাগ্রন্থ আল কুর'আন এমন এক সমাজে নাযিল হয়েছিল যে সমাজের প্রতিটি ঘরে মদ তৈরী হত। সমাজের প্রায় প্রতিটি ব্যক্তি মাদকাসক্ত ছিল। কিন্তু কুর'আন যখন ঘোষণা দিল 'মদ হারাম করা হল' তখন দেখা গেলো সে সমাজের লোকেরা মদ এবং মদের পেয়ালাগুলো এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায় রাস্তায় 'মদের নহর' প্রবাহিত হল। চিরদিনের জন্য সে সমাজ থেকে মদ উঠে গেল। সুতরাং মাদককে না বলুন ইত্যাদি অনর্থক বড় বড় শ্লোগাণ না দিয়ে বরং কুর'আনের বাণীকে আবশ্যক করে দিলে সমাজে ও রাষ্ট্রে আর মদের প্রাদুর্ভাব থাকবে না।

সামাজিক ব্যাধি যৌতুকের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

বিবাহ শাদীতে দেনমোহর ছাড়া অন্য কোন শর্ত করা ইসলামী শরীয়াতে বৈধ নয়। আর দেনমোহর পাওনা হচ্ছে শুধু স্ত্রীর। মহান আল্লাহর দেয়া এ হক থেকে বঞ্চিত করার কোন প্রকার চেষ্টা ও কলা কৌশল কুর'আন সম্মত নয়। অবশ্য আমাদের সমাজে বর্তমানে অধিকাংশ নারী তাদের এ হক সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত নয়। তারা এর গুরুত্ব, কার্যকারিতা ও হিকমত উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণতঃ তাদের এ অজ্ঞতার সুযোগে অনেক পুরুষ প্রায় দেনমোহর না দেওয়ার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কলা কৌশল, জবরদস্তি ও চাপ প্রয়োগ করে মাপ নেয়। স্ত্রী এভাবে তাদের দেনমোহর থেকে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে স্বামী তার যৌতুকের দাবি আদায় করে ছাড়ে। এ দাবি আদায় না হলে স্ত্রীর উপর

---

৩৪২. অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুলণ্ঢাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য*, প্রাগুক্ত

৩৪৩. *ইমাম ইব্ন মাজাহ্*, প্রাগুক্ত, পানিয় ও পানপাত্র অধ্যায়, অনুচ্ছেদ শরাব সমস্ড় পাপ কাজের দরজা স্বরূপ, হাদিস নং. ৩৩৭১

৩৪৪. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৩৩৭২

যুল্‌ম-অত্যাচারও করে। অথচ আল্লাহর দেয়া হক স্ত্রীর দেনমোহর দেয়না। এ হক আদায় না করলে অপরের হক নষ্ট করার দায়ে দায়ী ও গুনাহগার হতে হবে। মোটকথা, স্ত্রীর দেনমোহর দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে ছেলের বিবাহ শাদীতে যৌতুকের দাবি ও শর্তটা যেন তার দেনমোহরের মত হয়ে গিয়েছে। তাই প্রথার মাধ্যমে এখন মেয়ের পরিবর্তে ছেলের দেনমোহর নির্ধারিত হয়। অবশ্য মেয়ের জন্য দেনমোহরের একটা পরিমাণ সামাজিক কারণে নির্ধারণ করা হয় বটে, কিন্তু তা আদায় করার সংকল্প খুবই কম থাকে। অথচ কুর'আনে যৌতুক দানের কোন কথা বলা হয়নি; বরং নারীদেরকে তাদের দেনমোহর দেয়ার হুকুম করা হয়েছে।[৩৪৫] বলা হয়েছে:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"তোমরা নারীদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে ওর কিয়দাংশ ছেড়ে দিলে স্বাচ্ছন্দে তা ভোগ করবে।"[৩৪৬] উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ বিবাহ সাদীর ক্ষেত্রে কাউকে কোন যৌতুক দানের হুকুম করেন নি। শুধু স্ত্রীকে মোহর দান করার জন্য স্বামীকে হুকুম করেছেন, এ হুকুম পালন করা ফরয। কিন্তু প্রচলিত যৌতুক প্রথানুযায়ী যৌতুকের দাবি ও শর্তটা এখন স্বামীর জন্য দেন মোহরের পর্যায়ে পৌছে যাওয়ায় কুর'আনের হুকুম কার্যকর হয় না। ইসলামে স্বামীর কোন দেনমোহর নেই এবং তার এরূপ কোন দাবি ও শর্ত করার অধিকারও নেই। কিন্তু যৌতুক প্রথার দরূণ এখন স্ত্রীর দেনমোহরের কোন গুরুত্ব নেই এবং এটা নিয়ে স্বামীর কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। কারণ আজকাল স্বামীরা স্ত্রীদের দেনমোহরের হক আদায় করা নিজেদের কর্তব্য মনে করে না। তাই নিজেদের যৌতুক ঠিকমত আদায় করে থাকে। আর বিবাহে স্ত্রীর জন্য যত ইচ্ছা দেনমোহর দেওয়ার ওয়াদা করে থাকে। অথচ দেনমোহর ছাড়া বিবাহ হয় না এবং তা আদায় করা ফরয।

যৌতুকের প্রতিক্রিয়া

ইসলামের পারিবারিক বিধানে পূরুষকে পরিবার পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য নারীগণের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার পূরুষকে দেয়া হয়েছে। পূরুষ তার অধিকার ও ক্ষমতা অনুযায়ী পরিচালনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করতে পারলে পারিবারিক জীবন সুন্দর, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখলিত হতে পারে না। এ জন্য পরিবারের নারীগণসহ সকলকেই পরিবারের প্রধানের আনুগত্য করতে হয়। আল্লাহ পূরুষকে এ কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়ে স্ত্রীলোকের উপর উচ্চতর মর্যাদা দান করেছেন। যাতে স্ত্রী ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ আনুগত্য করে। এছাড়া পুরুষকে পরিবারের সমস্ত খরচ বহন করতে হয় এবং স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এমন কি স্ত্রী ধনবতী হলেও ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপরই ন্যস্ত থাকে।[৩৪৭] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একজন কে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এবং এ (শ্রেষ্ঠত্ব) এ জন্য যে পুরুষ ধন ব্যয় করে। বিদুষীরা পুরুষের অনুগত লোক চক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইয্‌যত রক্ষাকারিণী! আল্লাহর হেফাযতে তারা তা হেফাযত করে। তোমরা স্ত্রীদের অবাধ্যতার আশংকা

---

৩৪৫. *অন্যায় ও অসত্যের বির—দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৩৪৬. *আল কুর'আন*, ০৪:০৪

৩৪৭. *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬

Dhaka University Institutional Repository

করলে তাদের সদুপদেশ দাও, পরে তাদের শয্যাবর্জণ কর ও মৃদু প্রহার কর। যদি তারা অনুগতা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।[৩৪৮]

এ আয়াতে পুরুষকে নারীদের কাওয়াম অর্থাৎ পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও প্রশাসক করার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি কারণ এ যে, স্বয়ং আল্লাহ পুরুষকে প্রকৃতিগতভাবেই সাধারণত নারীর উপর মর্যাদা দান করে সৃষ্টি করেছেন। এটা আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এ যে, পুরুষ নারীদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা ও অর্থ ব্যয়ের কারণে পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষমতা সীমিত, নিয়ন্ত্রিত ও শর্তসাপেক্ষ। স্বামীকে এ ক্ষমতাবলে যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার দেয়া হয়নি যা করলে আল্লাহর নিকট অপরাধী হতে হয়। নবী কারিম (স.) বলেছেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাফরমানি করে কারোরই আনুগত্য করা যায় না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা যেতে পারে ততক্ষণ এবং সে সব কাজে, যতক্ষণ এবং যেসব কাজে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানি হবে না। পারিবারিক জীবনে ইসলামের এ ভারসাম্যপূর্ণ মৌলিক নীতি প্রচলিত যৌতুক প্রথার কবলে পড়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। কারণ অনেক ব্যক্তিত্বহীন স্বামী অধিক যৌতুক পাওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর নিকট অযথা নত হয়ে থাকে এবং তার মর্জি অনুযায়ী সব কাজ করে থাকে। এরূপ স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রাধান্যই থাকে। অধিক যৌতুকের কারণে সাধারণত এরূপ হয়। অপরদিকে যৌতুক না পেলে অনেক স্বামী তার স্ত্রীর উপর অত্যাচারের মাধ্যমে তার পৌরষত্ব প্রদর্শন করে। সে ক্ষেত্রে স্বামী তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ফলে উল্লেখিত উভয় দিক দিয়ে যৌতুক প্রথার কারণে স্বামীর ও স্ত্রীর পারিবারিক জীবন ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে না এবং অপরদিকে কুর'আনের মহান নীতি লঙ্ঘিত হয়।[৩৪৯]

উপরোল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী স্ত্রীলোকদের জন্য ব্যয় করা পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক্ষেত্রে উল্টো পুরুষের দাবি ও শর্ত করা এবং তা আদায় করার জন্য চাপ প্রয়োগ ও অত্যাচার করা সম্পূর্ণ কুর'আন বিরোধী কাজ। কাজেই যে যৌতুক প্রথার এত কুফল বাস্তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তার হাত থেকে সমাজকে মুক্তি দানের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'সত্য সমাগত ও মিথ্যা অপসারিত। আর নিশ্চয় মিথ্যা অপসারিত হবেই।'[৩৫০]

হক ও বাতিল– সত্য ও মিথ্যা এর মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ স্বাভাবিক ও অনিবার্য। মানবজাতির সূচনালগ্ন থেকে এ দ্বন্দ-সংগ্রাম চলে আসছে এবং যতদিন মানবজাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, ততদিন এ সংঘাত অব্যাহত থাকবে। এ দু'টির একটি ভাল অপরটি মন্দ। একটি সত্য ও ন্যায়, অন্যটি অকল্যাণকর। একটি আলো অন্যটি অন্ধকার। একটি সৃজনশীল, অন্যটি ধ্বংসশীল। একটি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার মনোনিত পথ, অন্যটি অবাঞ্চিত ও নিষিদ্ধ পথ। এ দু'টি পথ ও মতবাদের প্রথমটি ইসলাম আর দ্বিতীয়টি জাহিলিয়াত। যা ইসলাম তা জাহিলিয়াত নয় এবং যা জাহিলিয়াত তা ইসলাম নয়। ইসলামের যাবতীয় পন্থা জ্ঞান ভিত্তিক। কারণ স্বয়ং আল্লাহ সে পন্থা পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি যাবতীয় গুঢ় রহস্যের জ্ঞান রাখেন। পক্ষান্তরে ইসলাম থেকে ভিন্নতর প্রত্যেক পন্থা পদ্ধতিই জাহিলিয়াতের পন্থা পদ্ধতি বলে গণ্য। আরবের ইসলাম পূর্ব যুগকে জাহিলিয়াতের যুগ বলা হত এ কারণে যে, সে যুগে জ্ঞান ছাড়াই নিছক কুসংস্কার, আন্দাজ-অনুমান ও কামনা বাসনার ভিত্তিতেই মানুষ তার জীবন পদ্ধতি নির্ধারণ করে নিয়েছিল। এ পদ্ধতি যেখানে, যে যুগেই মানুষ অবলম্বন করবে তাকে অবশ্যই জাহিলিয়াতের কর্মপদ্ধতি বলা হবে।[৩৫১] মোটকথা,

---

৩৪৮. *আল কুর'আন*, ০৪:৩৪

৩৪৯. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৩৫০. *আল কুর'আন*, ১৭:৮১

৩৫১. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের পরিভাষায় জাহিলিয়াত বলতে সে সব কর্মপদ্ধতি বুঝায় যা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মন-মানসিকতা পরিপন্থি। কুর'আন বলছে:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ অবিশ্বাসী এবং কেউ বিশ্বাসী। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।"[৩৫২]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক দান করে তাকে পরীক্ষা করার জন্য সাধারণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। তার জীবনের জন্য যে কোন পথ বেছে নেয়ার এবং তদনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। সে ইচ্ছা করলে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে তার সুফল লাভ করতে পারে অথবা এ পথ পরিত্যাগ করে তার মনগড়া কোন ভ্রান্ত পথেও চলতে পারে। সে আল্লাহকে তার একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, প্রভু ও শাসক মনে করে তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে পারে অথবা সে কল্পিত বহু ভ্রান্ত ইজমের পিছনে দৌড়াতে পারে– পারে উপাসনা করতে। এ দু'টি পথের যে কোন একটি পথ অবলম্বন করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ যুগে যুগে প্রত্যেক জাতির ও কওমের কাছে নবী রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে তার জীবনের সঠিক পথ সম্পর্কে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সঠিক পথে চলতে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তা খর্ব করতে চাননি। বরং সঠিক পথে চলার মঙ্গল বর্ণনা করে তাকে সম্মত করার ও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরদিকে ভ্রান্ত পথে চলার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে সে পথে চলা থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করা হয়েছে। মানব ইতিহাসের এমন কোন যুগ বা সময়কাল অতীত হয়নি যখন মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানানোর জন্য কোন নবী অথবা তার স্থলাভিষিক্ত বিদ্যমান থাকেননি। এ যে পরম্পরা ও আল্লাহর পথে মানুষকে আহবানের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা এরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল এখনও রয়েছে। তার কারণ এ যে, আল্লাহর পথ পরিহার করে অন্য কোন পথ অবলম্বন করলে তা হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই নামান্তর। এরই ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে নানান বিপর্যয় ও দুর্যোগ। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অসংখ্য অগণিত মানুষ গোলামির শৃংখলে আবদ্ধ হয়। নিষ্ঠুর ও অত্যাচারি শাসকের নির্যাতন নিস্পেষণে মানুষের আর্তনাদ হাহাকারে আকাশ-বাতাস ভরে যায়। মানুষের এসব নির্যাতন ও নিস্পেষণের অবসান ঘটিয়ে তাদের স্বাধীনতা, সূখ-শান্তি ও জান মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান জানাবার প্রয়োজন যেমন অতিতে ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এটাই আল্লাহ তা'আলার অটল নীতি।[৩৫৩]

উপরের আলাচনার সার নির্যাস এ যে, ঈমান ও কুফর যেমন বিপরীতমুখী, ইসলাম ও জাহিলিয়াতও তেমনি বিপরীতমুখী। ইসলাম আল্লাহ তা'আলার বলে দেয়া পথ ও পন্থা এবং জীবনের এক কল্যাণমুখী কর্মসূচী। আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত জ্ঞানই এর মূল উৎস। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেকও তাই সমর্থন করে এবং স্বভাব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল। অপরদিকে কুফর তথা অজ্ঞানতার অন্ধকার আন্দাজ অনুমান ও অলীক কল্পনা থেকে জাহিলিয়াত উৎসারিত। অতএব প্রথমটি সত্য ও সুন্দর, দ্বিতীয়টি মিথ্যা ও কুৎসিত। প্রথমটি আলোকোজ্জল, দ্বিতীয়টি অন্ধকার। এ দু'টির একটি অপরটিকে কখনেই বরদাশত করতে পারে না। তাই একটি অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি।

রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান

একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, বর্তমান পশ্চিমা রাজনীতির সাথে আল কুর'আন বর্ণিত রাজনীতির সাথে কোন সামঞ্জস্য বা মিল নেই। তবে রাজনীতির অর্থ যদি হয় কল্যাণময় জীবন-যাপন এবং একমাত্র

---

৩৫২. *আল কুর'আন*, ৬৪:০২

৩৫৩. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

আল্লাহর আরাধনা ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জীবনচর্চা তবে সে রাজনীতি আল কুর'আনের মূল বিষয়। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে চারটি স্তম্ভ যথা: সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ আল কুর'আনের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সৌহার্দ সৃষ্টি করে। ইসলামের এ স্তম্ভগুলোর উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধন নয় বরং এর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।[৩৫৪] এসব স্তম্ভসমূহ মানুষের আচরণ ও কার্যকলাপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্বাসীদের জন্য যে সালাত ফরজ করা হয়েছে[৩৫৫] জামায়াতের সাথে যা আদায় করা উচিৎ সে সালাতের মাধ্যমে একজন ঈমানদার বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদন করে যাতে রয়েছে চিন্তন, আবেগগত অনুপ্রেরণা ও শারীরিক সঞ্চালন।[৩৫৬] সালাতে বিশ্বাসী মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়, সালাত আদায়ের জন্য একজনকে ইমাম নির্বাচিত করা হয়, ইমামকে নিয়মানুযায়ী নির্বাচিত করা হয়, ইমামকে নিয়মানুযায়ী অনুসরণ করা হয়, তার কোন ত্রুটি হলে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, মহান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে সালাত আদায়কারীগণ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে প্রার্থনা করে 'হে প্রভু আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর।' সালাতের প্রার্থনার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে কল্যাণময় জীবনের নীতিমালা, সামাজিক সমতা ও ঐক্য, নেতৃত্ব ও আনুগত্য, দায়িত্ববোধ ও দায়িত্ব সচেতনতা এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। একই ধরনের গুণাবলী সম্বলিত নিয়মাবলী ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং সামাজিক জীবনে এ স্তম্ভগুলির পরিচর্যা এক ধরনের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রশিক্ষণ।[৩৫৭] রাজনীতিকে যদি সরকার পরিচালনার সীমাবদ্ধ সংজ্ঞায় ধরা হয় তবে রাজনীতি আল কুর'আনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়।

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দকাজে নিষেধ করবে।'[৩৫৮]

আল কুর'আনের এ আহবান; পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এক মহা বাণী হিসেবে চিরকাল অনন্য হয়ে থাকবে। আল কুর'আন নৈরাজ্য ও বিশৃংখলাকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছে[৩৫৯] এবং রাসূলুল্লাহ (স.)ও সমাজে সংগঠন এবং কর্তৃত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। একইভাবে দ্বিতীয় খলিফা 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) ঘোষণা করেছেন:

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ

'সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ব্যতিত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতিত নেতৃত্ব নেই।'[৩৬০] খুলাফায়ে রাশিদাহ ও তাঁদের সাথীগণ এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বাস্তবায়নের যে ঐশী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার দায়ভার যুগপৎ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে সম্পাদন করতে হবে। জীবনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় শুভবোধ দ্বারা এমনভাবে অভিষিক্ত ছিল যে তাঁরা রাজনীতি, আইন ও সমাজকে ধর্মের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি জড়িত হিসেবে দেখতেন। হযরত কা'ব (রা.)-র সূত্রে ইব্ন কুতাইবা বলেন: 'ইসলাম, সরকার ও জনগণ হচ্ছে তাবু, দন্ড, রজ্জু ও পেরেকেরে মত। ইসলাম হচ্ছে তাবু, সরকার হচ্ছে তাবু ধারণকারী দন্ড, আর জনগণ হচ্ছে রজ্জু ও পেরেক। একটি ছাড়া অন্যটির কোন

---

৩৫৪. আব্দুর রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত*, অনু. এ কে এম সালেহ উদ্দিন (ঢাকা, বিআইআইটি, এপ্রিল ২০০৮), পৃ. ৩০

৩৫৫. *আল কুর'আন*, ০৪:১০৩

৩৫৬. প্রাগুক্ত

৩৫৭. প্রাগুক্ত

৩৫৮. *আল কুর'আন*, ০৩:১১০

৩৫৯. *আল কুর'আন*, ০২:২০৫

৩৬০. *সুনানু আদ্‌দারেমী*, বাবু ফি যিহাবিল 'ইলমি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২৫৭

কার্যকারিতা নেই।[৩৬১]

ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে রাজনীতি আল কুর'আনের আরো মৌলিক বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তৌহিদ ঘোষণার জন্য প্রয়োজন সমস্ত তাগুতি শক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়া অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার গ্রহণ করতে হবে যাতে পৃথিবী থেকে সকল প্রকার যুল্‌ম, অন্যায় ও অবিচারের অপসারণ করা যায়। আল কুর'আনের কাংখিত তাওহিদি সমাজে কোন আপস বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ নেই। সকল মিথ্যা দেবতার পূজা অর্চনাকে বিতাড়ন করে দেয়ার জন্য আল কুর'আন উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। এসব মিথ্যা দেবতাদের ধারক বাহকদের সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ন্যায়পরায়ণ ধর্মানুরাগী ব্যক্তিবর্গের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে এবং মন্দের উপর ভালোকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। কুর'আনের নির্দেশেই নবী কারিম (স.) নির্জনতা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর রিসালাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মদীনায় হিজরতের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ঐশী ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। একইভাবে সকল পূর্ববর্তী নবীগণও ঐশী বাণী প্রচার করেছিলেন এবং সকল বিশ্বাসীদের তাগুতী শক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়ার আহবান জানিয়েছিলেন।[৩৬২] আল কুর'আন তাই ক্ষমতার সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত, যে ক্ষমতার সাহায্যে সমস্ত মানবতার কল্যাণের জন্য ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী জগতকে রূপান্তর করা যায়। তাই 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার এক অনন্য নাম। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ক্ষমতা দখলকে কুর'আনে এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, কুর'আন জিহাদকে ঈমানের কষ্টি পাথর হিসেবে অবিহিত করেছে।[৩৬৩] ব্যক্তিগত, সামষ্টিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্ষমতা দখল আল কুর'আনের উদ্দেশ্য নয়। আল কুর'আন ক্ষমতাকে একটি নৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেছে। এ ক্ষমতা দখল মহান আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম মাত্র, যাতে চির শান্তিময় অনন্ত জীবন লাভ করা যায় এবং মানবতার জন্য আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার উৎস হিসেবে যাতে এই রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের তত্ত্ব ও প্রায়োগিক রাজনৈতিক ক্ষমতার ধর্ম, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের রূপরেখাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাল্টে দেয়।[৩৬৪] ধর্ম ও রাজনীতির সবচেয়ে আদর্শিক সম্পৃক্ততার উদাহরণ হচ্ছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.), যাকে আল কুর'আন সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনীতে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।'[৩৬৫]

অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে তাঁর মদীনায় হিজরতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ক্ষমতা ও সম্পর্কের পুনর্গঠন করে ঐশী ইচ্ছার অনুবর্তী করা। এখানেই আল কুর'আনরে প্রথম রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রধান ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)। তিনি নামাজের ইমামতি করতেন, সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতেন, বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন এবং জননীতি

---

৩৬১. উদ্ধৃত, আব্দুল রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত* (ঢাকা: বিআইআইটি, এপ্রিল ২০০৮), পৃ. ৩১

৩৬২. *আল কুর'আন*, ১৬:৩৬

৩৬৩. আব্দুল রশিদ মতিন, প্রাগুক্ত

৩৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩৬৫. *আল কুর'আন*, ৩৩:২১

নির্ধারণ করতেন।'[৩৬৬]

রাজনীতির লক্ষ্য

দার্শনিক ইমাম গাজালী (র.)-র মতে রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ সাধন করা। ইসলামী আইনজ্ঞ আল মাওয়ার্দী, নসরুদ্দীন আল ফারাবী ও ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাজি (র.) প্রমুখের মতে আদর্শ রাষ্ট্র হচ্ছে যেখানে কল্যাণময় জীবন যাপনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে–আল্লাহ তা'আলা নির্দেশিত আধ্যাত্মিক সাধনা ও শরীয়ার বিধান মান্য করে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বস্তুগত জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের জন্য নিজেদের যেখানে গড়ে তুলতে পারবে। এমনকি ইব্ন খালদুন প্রাচ্যবিদরা যাকে ধর্মনিরপেক্ষ ধরনের পর্যালোচনার জন্য উর্ধ্বে স্থান প্রদান করেন, তিনিও আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পৃক্তিকরণের উপর সর্বশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নীতিগতভাবে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ধর্ম ও রাজনীতিতে কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি।[৩৬৭] সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। পবিত্র কুর'আনের বাণী :

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ

"নিশ্চয় সৃষ্টি তাঁর আইনও চলবে তাঁর।"[৩৬৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমিনের একমাত্র রাজত্ব আল্লাহর! আর আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারি নাই।"[৩৬৯]

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

"তিনি হলেন সেই সত্তা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের মালিক। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশিদার নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন।"[৩৭০]

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্যদান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩৭১]

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

৩৬৬. আব্দুল রশিদ মতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৩৬৮. *আল কুর'আন*, ০৭:৫৪

৩৬৯. *আল কুর'আন*, ০২:১০৭

৩৭০. *আল কুর'আন*, ২৫:০২

৩৭১. *আল কুর'আন*, ০৩:২৬

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"[৩৭২]

لِلَّهِ مَافِي السمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই।"[৩৭৩]

اللَّهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخرَ لَكُمُ الشمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

"তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন তা দিয়ে তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি নদীসমূহকে তোমাদের অধীন করেছেন। তিনি অধীন করেছেন আবর্তনশীল সূর্য ও চন্দ্রকে এবং তোমাদের অধীন করেছেন রাত ও দিনকে।"[৩৭৪]

উপরোক্ত আয়াতমালার আলোকে একথা বলিষ্ঠভাবে বলা যায় যে, রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান মূলত: এভাবে সম্ভব যে, সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ। সুতরাং রাজনীতি হলে সেটা তাঁর উদ্দেশ্যেই হতে হবে।

অর্থনৈতিক সমাধান

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَق مَعْلُومٌ. لِلسائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"আর তাদের ধন–সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক, যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের।"[৩৭৫] নিম্নে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আল কুর'আনের অবদান তুলে ধরা হল:

দারিদ্র্য দূরীকরণ

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

মানব জীবনে অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক ব্যাপারাদি মানুষের নিকট অত্যন্ত আবেগপূর্ণও বটে। কেননা মানব জীবনের চাকা তারই উপর আবর্তিত হয়। এ জন্যই আল কুর'আন তার উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে পারস্পরিক অর্থনৈতিক লেন-দেনের বিস্তারিত বিধানের খুঁটিনাটি অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই এ থেকে একথাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলাম দুনিয়ার অপরাপর ধর্মের ন্যায় কতগুলি হিতোপদেশ ও আরাধনা-উপাসনার ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হচ্ছে মানব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী, সমস্যার সমাধানকারী এক পূর্ণাংগ জীবন বিধান। ইসলাম নির্দেশিত জীবন-বিধানের কার্যাবলী প্রধানত ও মূলত পরকালে আল্লাহর কাছে সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে সুসম্পন্ন করা হয়। আর সে জন্য দৈহিক শক্তি

---

৩৭২. *আল কুর'আন*, ৪২:৪৯

৩৭৩. *আল কুর'আন*, ০২:২৮৪

৩৭৪. *আল কুর'আন*, ১৪:৩২

৩৭৫. *আল কুর'আন*, ৭০:২৪-২৫

ও সুস্থতা একান্তই জরুরী। দৈহিক সুস্থতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে অর্থনৈতিক প্রয়োজন যথাযথ পূরণ হওয়ার উপর। রাসূলে কারীম (স.) প্রায় সময়ই মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন এ বলে অর্থাৎ হে আমাদের আল্লাহ, তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায, রোযা পালন করতে পারব না, আমাদের মহান প্রতিপালক নির্দেশিত কর্তব্য সমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।[৩৭৬] শুধু তা-ই নয়, রাসূলে কারীম (স.) এতদূর বলেছেন যে, 'দারিদ্র মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।'[৩৭৭] এ সত্যও আমাদের সম্মুখে রাখতে হবে যে, মানুষ রূহ ও দেহের সমন্বয়। আর এ দু'টি দিকের মধ্যে মৌলিক দূরত্বও অনেক বেশী ও গভীর। এ কারণে আল কুর'আন এমন এক ব্যবস্থা চালু করেছে, যার ফলে রূহ ও দেহের মধ্যকার দূরত্ব দূর করে উভয়কে সংযুক্ত করে রাখা সহজ ও সম্ভব হয়। কেননা দেহ ও রূহের সম্পর্ক অটুট না রাখা হলে জীবনটারই শেষ হয়ে যাওয়া অবধারিত।

কিন্তু তা শুধু ধন-সম্পদ দ্বারাই সম্ভব হতে পারে না। কেননা অর্থনৈতিক দৈন্য ও দারিদ্র্য রক্তের শূন্যতা বিশেষ। আর রক্ত শূন্যতা দেহের জন্য মৃত্যুর আহবায়ক। অর্থ-সম্পদ মানুষের জন্য সে কাজ করে, যা রক্ত করে মানুষের গোটা দেহে। রক্ত মানুষের জীবন ও স্থিতির নিয়ামক। রক্তে স্বল্পতা দেখা দিলে মানুষের দেহে নানা রোগ দেখা দেয়। অনুরূপভাবে অর্থ-সম্পদ না থাকলে মানুষের জীবন অচল হয়ে যায় অনিবার্যভাবে। তা যেমন ব্যক্তি জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, তেমনি করে সামষ্টিক জীবনেও। এ কারণে মানুষের আর্থিক প্রয়োজন প্রকট হয়ে দেখা দেয়। অর্থ সম্পদহীন ব্যক্তির যেমন কোন শক্তি বা মান-মর্যাদা থাকে না, তেমনি দরিদ্র জাতিও বিশ্ব জাতিসমূহের দরবারে সমস্ত ইয্যত সম্মান থেকে বঞ্চিত হয় অনিবার্যভাবে। দুনিয়ার জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে ও স্থিতি লাভ করে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। সরকারসমূহের পরস্পরের যোগাযোগ ও সম্পর্ক-সম্বন্ধও অর্থনৈতিক ভিত্তি ছাড়া গড়ে উঠতে ও গভীর হতে পারে না।[৩৭৮]

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থা

আল কুর'আন দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থা চালু করেছে। ফলে সমাজে কোন মানুষ বঞ্চিত, পীড়িত ও হাহাকার ক্ষুব্ধ থাকবে না। এতে করে মানবাধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে। মানুষ পেয়েছে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাধীনতার অধিকার। ধর্মপালন, মতবাদ ও মতামত প্রকাশের অধিকার, ধোকা, প্রতারণা, মজুদদারী, সুদ-ঘুষ, চাঁদাবাজি প্রভৃতি ব্যাধি হতে সমাজ মুক্ত হয়েছে। পারস্যের সেনাপ্রধান রুস্তম যখন মুসলিম জাতির পরিচয় সম্পর্কে মুসলিম সেনাপতি রিবয়ি ইব্ন আমেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল তখন তার জবাবে রিবয়ি ইব্ন আমের বলেছিলেন:

نحن قوم أخرجنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة-

"আমরা এমন এক জাতি, আমাদেরকে আল্লাহ এজন্য প্রেরণ করেছেন যেন আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বাধীন করে দেই। ধর্মের শোষণ থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের সুশাসন দান করি। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে পরকালের প্রতি নিয়ে যেতে পারি।"[৩৭৯] পবিত্র কুর'আনের বক্তব্য:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

---

৩৭৬. *আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া*, পৃ: ৫৩০; উদ্ধৃত, *অন্যায় ও অসত্যের বির"দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩৭৭. *বাইহাকী*, বাবু আস্সালিসি ও আরবাঈনা মিন শুয়াবিন, আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৬৩৩৬, *মুসনাদুস সিহাবিল ক্বাদা'ঈ*, বাবু কাদাল ফাকর" আন ইয়াকূনা কুফরান, আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৫৫৫

৩৭৮. *অন্যায় ও অসত্যের বির"দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৩৭৯. প্রাগুক্ত

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে।"[৩৮০]

সুদ দূরীকরণ

সুদ হচ্ছে সামাজিক শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। এর উৎপত্তি অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের মাধ্যমে। এর বিরুদ্ধে আল কুর'আনের ভূমিকা নিম্নে তুলে ধরা হল:

সুদ -এর বিরুদ্ধে আল কুর'আন

সুদের আরবি রিবা। 'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন জিনিস বৃদ্ধি পাওয়া কিংবা বেশী হওয়া।[৩৮১] সুদ, সুদী কায়-কারবার এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণদান ও ঋণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম। সুদকে কুর'আনি পরিভাষায়ও বলা হয়েছে 'রিবা'। এর অর্থ: বাড়তি বা বৃদ্ধি অর্থাৎ মূল পরিমাণের উপর বাড়তি গ্রহণ। এ বাড়তিটাকেই কুর'আন মাজীদ বলেছে 'রিবা' এবং এ পর্যায়ে কুর'আন মাজিদের ঘোষণা হচ্ছে:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"মানুষের ধনে তোমাদের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না; কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিতে থাকে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়; ওরাই সমৃদ্ধশালী।"[৩৮২]

এ আয়াতটি সূরা 'আর-রুম' থেকে উদ্ধৃত। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তখনকার সময় সারা দুনিয়ায় সাধারণভাবে এবং আরবের আন্তর্জাতিক ব্যবসা কেন্দ্র মক্কাতেও সুদী কারবার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। বলতে গেলে তখনকার গোটা অর্থনীতিই ছিল সুদভিত্তিক। লোকেরা নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করত, কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ঋণ শোধ করা সম্ভব হত না বিধায় সময় বাড়িয়ে দিতে বলতো। এ সুযোগে মূল পরিশোধ্য ঋণের সাথে বাড়তি সুদ যোগ করে পরিমাণ বাড়িয়ে ধরা হত। কিন্তু তা মূলতই ছিল একটা শোষণ। কেননা ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয়া হলেও তাতে ঋণ গ্রহীতা কোন বাস্তব ফল পেত না। বাড়তি অর্থটা কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই সে দিতে বাধ্য হত। সে ঠেকায় পড়েই ঋণ গ্রহণ করেছিল। আর বাস্তব কারণেই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ এ ঠেকায় পড়া লোকটিকেই শুধু সময় বাড়িয়ে দেওয়ার বিনিময়ে মূল ঋণ পরিমাণের তুলনায় বাড়তি দিতে বাধ্য করা হতো। এটা যেমন নির্মমতা, পারস্পারিক সহানুভূতিহীন আচরণ, তেমনি কোনরূপ বস্তুগত বিনিময় ছাড়াই অতিরিক্ত দিতে বাধ্য করা। আর এটাই শোষণ। কুর'আন শোষণের সব পথ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তখন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনই ইসলামের সুদমুক্ত ও শোষণহীন অর্থব্যবস্থার কল্যাণ বোঝানো দুস্কর। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছিল যে, শুধু মূল ঋণের অতিরিক্ত একজনকে দিলেই প্রকৃত জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। কেননা তাতে অভাবগ্রস্থ লোকদের পকেট শূন্য করে শেষ কপর্দকটিও মূলধন মালিকের হাতে পৌঁছে সম্পদ এক স্থানে পুঞ্জীভূত হয়ে সম্পদের বিস্তৃতি বাধাগ্রস্ত করে। তার ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পায়। কিন্তু যাকাতের ফল এর বিপরীত। মক্কী পর্যায়ে যাকাত ব্যক্তিগতভাবে আদায় হতে থাকলেও তা রীতিমত আদায় ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়িত

---

৩৮০. *আল কুর'আন*, ০৩:১১০

৩৮১. মাওলানা হিফজুর রহমান, *সুদ ধ্বংস ও শোষণের হাতিয়ার* (ঢাকা: দারুল উলুম লাইব্রেরী, ২৭ শাওয়াল, ১৪২৬ হি.), পৃ. ৩১

৩৮২. *আল কুর'আন*, ৩০:৩৯

হওয়ার পর কার্যকর হতে পেরেছিল। এ পর্যায়ে শুধু এতটুকুই বলে দেয়া হল যে, ধনী যে যাকাত দরিদ্রকে দেয়, তাতে ধনীর আর্থিক সংগতি হ্রাস পায় না অথচ তার দ্বারা দরিদ্রের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় হার বেড়ে যায় এবং সাধারণভাবে সমাজে সচ্ছলতার প্রবাহ চলে। এরই ফলে জাতীয় ও সামষ্টিক সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উত্তরকালে মদীনায় অবতীর্ণ সূরা আল বাক্বারার আয়াতে বলা হয়েছে:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন এবং দানকে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।"[৩৮৩] প্রথোমক্ত আয়াতও মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতদ প্রসঙ্গে প্রথম আয়াত দ্বারা সুদি কারবারে মগ্ন সমাজে একটা নতুন চিন্তার তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে। চলমান শোষণমূলক অর্থনীতির মোহান্ধতা ত্যাগ করে মানুষ যাতে করে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিতে গোটা ব্যাপারটি চিন্তা ও বিবেচনা করতে পারে, অর্থলোলুপতা পরিহার করে মানবিক কল্যাণমূলক আচরণের দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, তারই জন্য ভূমিকা স্বরূপ অর্থনীতির এ নতুন দিগন্ত লোকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্য দৃষ্টিতে সুদে অর্থ বাড়ে আর যাকাতে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায় বলে মনে হয়। কিন্তু কুর'আন মাজীদ তা অস্বীকার করে উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা: সুদে অর্থ বাড়ে না, কমে। আর যাকাতে অর্থ কমে না বরং বাড়ে। এটি একটি চাঞ্চলকর ঘটনা। বস্তুত এ পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গির। দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গে রক্তের চলাচল হলে শরীর তাজা ও বলবান থাকে। কিন্তু সমস্ত দেহের রক্ত মুখ-মন্ডলে উঠে এলে চেহারাটা লাল টকটকে হলেও গোটা দেহ রক্ত শুণ্যতার কারণে মরে যাবে। সামাজিক জীবনে অর্থসম্পদের অবস্থাটাও ঠিক সেরূপ। তাই পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য: জাতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনি বা শাসকদের করায়ত্ত হয়ে থাকুক এবং তা মূলধন হিসাবে বিনিয়োগকৃত হয়ে নির্দিষ্ট হারে নিশ্চিতভাবে মুনাফা অর্জন করুক। কিন্তু আল কুর'আন তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। আল কুর'আনের দৃষ্টিকোন হচ্ছে: অর্থ-সম্পদের সর্বাত্মক আবর্তন, প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য ন্যায্য অংশ দানে সঞ্জীবিত রাখা এবং তা নির্দিষ্ট হারে লাভ না পেয়ে ব্যবসায়ের মুনাফার অংশিদার হবে মাত্র। তাই পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে সুদ শুধু সঙ্গতই নয়, মূলধন প্রবৃদ্ধির প্রধান ভিত্তিও। আর আল কুর'আনের দৃষ্টিতে এ বাড়তি বস্তুগত কোন বিনিময় না থাকার দরুন চূড়ান্ত মাত্রায় শোষণ সম্পূর্ণ হারাম। তাই এরপরই বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া ছেড়ে দাও, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"[৩৮৪] আয়াতটির শুরুতে ঈমানদার লোকদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। তার অর্থ, শুধু ঈমানই সুদের মত একটি লোভনীয় ও উপস্থিত লাভের জিনিস পরিহার করার জন্য যথেষ্ট নয়। সে জন্য আল্লাহর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তির ভয় মনে জেগে ওঠাও একান্ত আবশ্যক। এ ভয় থাকলেই সুদের অবশিষ্টাংশ প্রত্যাহার করার মত মনোবল লাভ করা যায়। আর যে ঈমান মানুষকে আল্লাহর অনুগত করায় তাই প্রকৃত ঈমান। এ ঈমানই মানুষকে অবভাগ্রস্থ ও দারিদ্র্য-পীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বানিয়ে দেয়। আর এ সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষই পারে সুদের লোভ পরিহার করতে এবং সুদের অবশিষ্ট পাওনা থেকে ঋণগ্রস্তদের নিস্কৃতি দিতে। এ পর্যায়েও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কুর'আন সুদি ঋণে জর্জরিত ব্যক্তিদের এ বলে উস্কানী দেয়নি: তোমরা সুদ দিতে অস্বীকার কর এবং জোট বেঁধে সুদি কারবারী ধনি লোকদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করে দাও। তার পরিবর্তে কুর'আন খোদ সুদি কারবারিদের নির্দেশ দিয়েছে: তোমরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবশিষ্ট সুদ প্রত্যাহার কর, আর সুদ বাবদ কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। সমাজকে শোষণমুক্ত করার এ কুর'আনী পন্থা যেমন স্বভাবসম্মত,

---

৩৮৩. *আল কুর'আন*, ০২:২৭৬

৩৮৪. *আল কুর'আন*, ০২:২৭৮

তেমনি অধিক কার্যকর। অবশিষ্ট সুদ প্রত্যাহার করার পর্যায়ে কুর'আন শুধু হালকা ভাষায় এ নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। কেননা সুদ অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের শোষণ ব্যবস্থা। এর ফলে কত মানুষ সর্বহারা হয়েছে, নিজেদের বিত্ত-সম্পত্তি হারিয়েছে, পৈতৃক বাসস্থান থেকে উৎখাত হতে বাধ্য হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তাই কুর'আন তা যে কোন মূল্যে বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। এ কারণে কুর'আন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হুমকি দেওয়ার এবং ভীতি প্রদর্শনেরও প্রয়োজন মনে করেছে:

فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

'তোমরা যদি তা প্রত্যাহার না কর তা হলে জেনে রাখো, এজন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।'[৩৮৫]

আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ। এতদিনে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামের যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তখন প্রশাসনের মাধ্যমে সুদি কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নবী কারিম (স.) ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সমগ্র ইসলামী রাজ্যে সুদ বন্ধের কড়া নির্দেশ জারি করেন। সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানিয়ে দেন: এখনও কেউ সুদি কারবার করলে তাকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে। কোন গোত্র বা সমাজ এ কাজ থেকে বিরত না হলে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণার কথাও জানিয়ে দেন। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের অপর কোন একটি আদেশ বা নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর বাণী শোনানো হয়নি। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কুর'আনের দৃষ্টিতে সুদ ও সুদী কারবার একটা কঠিন ফৌজদারী অপরাধ। তা প্রত্যক্ষ নরহত্যার চাইতেও বীভৎস। হত্যাকান্ডে এক বা একাধিক ব্যক্তি জীবন হারায়। আর সুদি কারবারে গোটা সমাজ তিল তিল করে শক্তিহীন, প্রাণহীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়। হত্যাকান্ড ইন্দ্রিয় গোচর, আর সুদি শোষণের ফলে গোটা লোক-সমষ্টির রক্তশূণ্যতা ও শেষে প্রাণহীনতা- যা সহজেই অনুভবনীয় হয় না। তাই এর প্রতি কুর'আন মাজিদের এ কঠোরতা কিছুমাত্র বিস্ময়োদ্দীপক নয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণ গ্রহণ এবং ব্যবসায়িক মূলধন হিসেবে ঋণ গ্রহণের মধ্যে কুর'আন কোন পার্থক্য করেনি। ফলে প্রথম ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণে সুদ হারাম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুদ জায়েয এরূপ বলার কোন সুযোগ নেই। কুর'আনের ভাষায়, এ উভয় প্রকার সুদই সম্পূর্ণ হারাম।[৩৮৬]

সুদ ও মুনাফার পার্থক্যের একটা নমুনা

ক্রম.	সুদ	মুনাফা
০১	ইসলামে সর্ব প্রকার সুদ হারাম	ইসলামে সর্ব প্রকার মুনাফা হালাল
০২	কাউকে ঋণ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর পূর্ব শর্তানুযায়ী যা কিছু অতিরিক্ত আদায় করা হয় তা-ই সুদ	ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তা-ই মুনাফা
০৩	সুদের ক্ষেত্রে টাকা ও মুদ্রাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়	মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে টাকাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় না
০৪	সুদ পূর্ব নির্ধারিত	মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত থাকে না
০৫	সুদ নিশ্চিত আয়	মুনাফা অনিশ্চিত আয়
০৬	সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন হয় না	মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল
০৭	সুদে লোকসানের ঝুঁকি নেই	মুনাফা অর্জনে লোকসানের যথেষ্ট ঝুঁকি আছে

৩৮৫. *আল কুর'আন*, ০২:২৭৯

৩৮৬. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

০৮	সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে	মুনাফার সম্পর্ক ক্রয় বিক্রয়ের সাথে
০৯	সুদের ব্যাপারে আল্লাহর লা'নত রয়েছে	মুনাফায় বরকত রয়েছে[৩৮৭]

সুদের দরুন ইয়াহুদীদের উপর হালাল বস্তুও নিষিদ্ধ ছিল

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"বস্তুত বহু পূত-পবিত্র জিনিস যা ইয়াহুদীদের জন্য বৈধ ছিল তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দানের কারণে। আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা অরোপ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করতো। আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[৩৮৮]

সুদখোর কবর থেকে মতিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে

কিয়ামতের দিন অন্যান্য মানুষ ও সুদখোরদের মাঝে একটা বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এজন্য যে তারা বলত, 'বেচাকেনা তো সুদের মত।' অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন।"[৩৮৯]

সুদখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী

এমনকি আল্লাহ তা'আলা সুদের নিষিদ্ধতা অমান্যকারীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। পবিত্র কুর'আনে তিনি বলেছেন:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"যদি সুদ না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তওবা কর, তবে মূলধন তোমাদেরই। অত্যাচার কর না এবং অত্যাচারিতও হয়ো না।"[৩৯০]

সুদে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না

যারা সুদখোর বা সুদি লেনদেন করে তাদের ধারণা সুদে সম্পদ বৃদ্ধি হয় কিন্তু বাস্তবতা হল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ যদি বৃদ্ধি না করেন তাহলে বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

---

৩৮৭. *সুদ ধ্বংস ও শোষণের হাতিয়ার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

৩৮৮. *আল কুর'আন*, ০৪:১৬১-১৬২

৩৮৯. *আল কুর'আন*, ০২:২৭৫

৩৯০. *আল কুর'আন*, ০২:২৭৯

"মানুষের ধনে তোমাদের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহ্ দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না; কিন্তু যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিতে থাকে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়; ওরাই সমৃদ্ধশালী।"[৩৯১]

শ্রম সমস্যার সমাধান

শ্রমই হল সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি ততবেশি উন্নত। শ্রম আল্লাহ প্রদত্ত মানব জাতির জন্য এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল কুর'আনে ঘোষণা করেছেন:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

"নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রম নির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।"[৩৯২] শ্রমের আভিধানিক অর্থ মেহনত, পরিশ্রম, খাটুনী ইত্যাদি। আর অর্থনীতির পরিভাষায়, "পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্ম-প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।"[৩৯৩] ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায়, "মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সেবা ও উৎপাদনে নিয়োজিত সকল কায়িক ও মানসিক শক্তি ব্যয়কে শ্রম বলে। বাহ্যত এ শ্রম উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হোক কিংবা পারিশ্রমিক না থাকুক অথবা সে পারিশ্রমিক নগদ অর্থ হোক কিংবা অন্য কিছু এবং শ্রমের পার্থিব মূল্য না থাকলেও পারলৌকিক মূল্য অবশ্যয়ই থাকবে।"[৩৯৪] মহাগ্রন্থ আল কুর'আন শ্রম সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রদান করেছে। রাসূলে আকরাম (স.) শ্রমিকের হাতকে আকাশের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে উত্তম হাত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি শ্রমের মর্যাদা বর্ণনা করে বলেছেন: "শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতম, যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।"[৩৯৫] একবার তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হয় "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ধনের উপার্জন শ্রেষ্ঠতর? তিনি উত্তর করলেন- নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন।"[৩৯৬] রাসূলে আকরাম (স.) আরো বলেছেন: "যে ব্যক্তি শ্রমের উপর নিজের জীবীকা নির্বাহ করে, তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রাখ, আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজের শ্রম লব্ধ উপার্জনে জীবীকা চালাতেন।"[৩৯৭] ইসলাম যেমনিভাবে মানুষকে শ্রমের প্রতি উৎসাহিত করেছে, শ্রমিককে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে ঠিক তেমনি কোন রকমের উপার্জন না করে সমাজের গলগ্রহ হয়ে থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য এক কাজ। বেকার থাকা ইসলাম কোনক্রমেই সহ্য করে না। আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনে বলেছেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল কাম হতে পার।"[৩৯৮] কোন রকমের উপার্জন না করে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়াকে নবী কারিম (স.) এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি

---

৩৯১. *আল কুর'আন*, ৩০:৩৯

৩৯২. *আল কুর'আন*, ৯০:০৪

৩৯৩. *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

৩৯৪. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, *মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অর্থনীতি*, অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী (কুষ্টিয়া, আগষ্ট ১৯৯৯), পৃ. ১২২

৩৯৫. *মুসনাদু আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৮৩৩৭

৩৯৬. প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৮৩৩৮

৩৯৭. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৯৩০

৩৯৮. *আল কুর'আন*, ৬২:১০

আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে কোন দিন ভিক্ষা করবে না। তার জান্নাতের দায়িত্ব আমি নিলাম।"[৩৯৯] তিনি আরো বলেছেন: "যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার চেহারায় এক টুকরা মাংসও থাকবে না।"[৪০০] উপরে বর্ণিত আল কুর'আন ও আল হাদিসের বাণীসমূহ হতে শ্রমের উচ্চ মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কী?

যে ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত আইন ও রাসূল (স.) কর্তৃক প্রদর্শিত নীতি অনুযায়ী ফায়সালা করা যায় তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা।[৪০১]

বিচার ব্যবস্থার আবশ্যকতা

বিচার ব্যবস্থা কতটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কুর'আন, সুন্নাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদিই তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। গোটা মুসলিম উম্মাহ এর আবশ্যকতা সম্পর্কে একমত। শরী'আতের দৃষ্টিতে বিচার কায়েম করা ফরযে কিফায়া।[৪০২]

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আল কুর'আনের ভাষ্য

সৃষ্টি যার আইন চলবে তাঁর। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু স্রষ্টা, সুতরাং সৃষ্টি তাঁর হুকুমেই চলবে। সৃষ্টি ও অন্যান্য কার্যক্রমে যেমন কেউ তাঁর শরিক নেই, তেমনি হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রেও কাউকে তিনি শরিক করেন না। পবিত্র কুর'আনে তিনি বলেছেন:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

"শুনে নাও, সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই। আর তিনিই একমাত্র হুকুম দেয়ার মালিক।"[৪০৩]

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ.

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলতে পারে না।"[৪০৪]

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.

"তিনি (আল্লাহ) তাঁর হুকুমে (কর্তৃত্বে ও ক্ষমতায়) অপর কাউকে শরীক করেন না।"[৪০৫]

অতীতেও নবী, আল্লাহওয়ালা ও 'আলিমদের (ধর্মীয় পণ্ডিত) নীতি ছিল আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মুতাবিক বিচার-ফায়সালা করা। কেননা তাঁরা ছিলেন আল্লাহর কিতাবের হিফাযাতকারি। পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا

---

৩৯৯. *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৪০০

৪০০. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৩৮১

৪০১. মাওলানা আতিকুর রহমান, *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মে ২০১২), পৃ. ০৯

৪০২. প্রাগুক্ত

৪০৩. *আল কুর'আন*, ০৭:৫৪

৪০৪. *আল কুর'আন*, ১২:৪০

৪০৫. *আল কুর'আন*, ১৮:২৬

اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ .

"নিঃসন্দেহে আমি (মূসার কাছে) তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে ছিলো পথ-নির্দেশ ও আলোকবর্তিকা। আল্লাহর অনুগত নবীগণ, অনুরূপভাবে (নবীর অবর্তমানে) আল্লাহওয়ালা ও 'আলিমগণ এরই ভিত্তিতে ইয়াহুদীদের যাবতীয় বিষয়ের বিচার-ফায়সালা করতেন। কেননা, (নবীর পর) আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষণের দায়িত্ব এদেরকেই দেয়া হয়েছিলো। তাঁরা (নিজেরাও) ছিলেন এর (প্রত্যক্ষ) সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, একান্তভাবে আমাকেই ভয় করো। এবং আমার আয়াতসমূহকে কম দামে বিক্রি করো না।"[৪০৬]

বিচারের ক্ষেত্রে কারো খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা যাবে না

হযরত দাউদ ('আ)-কে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে,

يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ.

"হে দাউদ, আমি তোমাকে যমিনের বুকে খলিফা নিযুক্ত করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফায়সালা করো এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।"[৪০৭] নবী কারিম (স.) এর প্রতিও নির্দেশ ছিলো, যেনো তিনি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী মানুষের যাবতীয় বিরোধপূর্ণ বিষয় মীমাংসা করেন। আল্লাহ বলেন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

"(হে মুহাম্মাদ স.) আমি তোমার প্রতি সত্যগ্রন্থ নাযিল করেছি– যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর সংরক্ষণকারী। সুতরাং তুমি তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতেই ফায়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য (দ্বীন) এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না।"[৪০৮] আরো বলা হলো, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে উপেক্ষা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটা অবাধ্যতার শামিল। আর আল্লাহর ফায়সালাই সর্বোত্তম। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ ـ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ.

"(অতএব, হে মুহাম্মাদ স.) তুমি তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে ফায়সালা কর। কখনো তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। এবং তাদের (ষড়যন্ত্র) থেকে সতর্ক থেকো যেনো তারা তোমাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। অতঃপর তারা যদি (তোমার ফায়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রেখো, তাদের কতক পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। আর মানুষের মধ্যে অধিকাংশই নাফরমান বা অবাধ্য। তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিচার-ফায়সালা কামনা করে? অথচ (আল্লাহতে) বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চাইতে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে?"[৪০৯]

---

৪০৬. *আল কুর'আন*, ০৫:৪৪

৪০৭. *আল কুর'আন*, ৩৮:২৬

৪০৮. *আল কুর'আন*, ০৫:৪৮

৪০৯. *আল কুর'আন*, ০৫:৪৯-৫০

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"আর তাদের জন্য ওতে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ' নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপ মোচন হবে। এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই অত্যাচারী।"[৪১০]

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

"এবং ইঞ্জিলধারীদের উচিত যে, ওতে উল্লেখিত আল্লাহর নির্দেশ মত বিধান দেয়া আর যারা আল্লাহর নির্দেশ মত বিধান দেয় না তারা শান্তি ভঙ্গকারী।"[৪১১]

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার মূলনীতি কি হবে ওহী নাযিলের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন। সূরা 'আলাকের প্রথম ৫ আয়াত এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানব জাতিকে ইসলামী জীবন বিধান শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী জীবন যাপনের বাস্তব প্রশিক্ষণ দান, জীবনকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করণই ছিল নবী-রাসূলগণের আগমনের আসল ও প্রকৃত লক্ষ্য। হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.) যখন কা'বা নির্মাণ করেছিলেন, তখন তাঁরা দু'জন একত্রিত হয়ে আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত ফরিয়াদ করেছিলেন:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমাদের রব! তাদের কাছে এক রাসূল পাঠাও যিনি তোমার আয়াত সমূহ পাঠ করবে। আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৪১২]

মহান প্রভূর নামে শিক্ষা

মানবতাকে নৈতিকতা শিখাতে হলে সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। এ বিষয়ের পূর্ণ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম নাযিল করলেন সূরা 'আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

"পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। পড় তোমার রব অতি দয়ালু। যিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"[৪১৩]

বস্তুত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান আল কুর'আনের দৃষ্টিতে সবার্ধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি চরিত্র গঠনোপযোগী শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যতিত কোন মানুষ মানুষ পদবাচ্য হতে পারে না। সামষ্টিকভাবে কোন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূলগণই এ ব্যাপারে বাস্তব

---

৪১০. *আল কুর'আন*, ০৫:৪৫

৪১১. *আল কুর'আন*, ০৫:৪৭

৪১২. *আল কুর'আন*, ০২:১২৯

৪১৩. *আল কুর'আন*, ৯৬:০১-০৫

Dhaka University Institutional Repository

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জনগণকে আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা দানে এবং তদনুরূপ জীবন যাপনে অভ্যস্থ করে তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের জন্য সে আদিকাল থেকেই প্রাণ-পণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ নবী এবং রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স.) সম্পর্কে আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"যেমন আমি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন ও তোমাদের পবিত্র করেন আর কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন। তোমরা যে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলে তা শিক্ষা দেন।"[৪১৪] অন্যত্র তিনি বলেছেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"আল্লাহ্ অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের নিজেদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করে। (নবী) তাঁর আয়াতগুলি তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।"[৪১৫] এরূপ কথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতটিতে:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য হতে একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে আল্লাহ্র আয়াত, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও প্রজ্ঞা; বস্তুত ইতিপূর্বে এরা তো ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"[৪১৬] লক্ষণীয় যে, এসব ক'টি আয়াতই রাসূলে আকরাম (স.) এর চারটি কাজের তালিকা পেশ করেছে। তা হচ্ছে লোকদের কাছে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা, তাদের পূত পবিত্র করা, তাদের কিতাবের তা'লীম দেয়া এবং হিকমাত শিক্ষা দান। কোন আয়াতে শিক্ষাদানের কথাটি পূত পবিত্র করণের আগে এসেছে, আবার কোথাও এসেছে পরে। কেননা ব্যাপক অর্থে শিক্ষা দানের ফলাফলই হচ্ছে পূত পবিত্রতা। আর পূত পবিত্রতা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দ্বারাই লাভ হতে পারে।[৪১৭] রাসূলে আকরাম (স.) মদিনায় আল কুর'আনের মাধ্যমেই ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করে উম্মী সমাজকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে দেখা গেল মাত্র অল্প সময়ের ব্যবধানে মদীনায় আর উম্মি তথা অশিক্ষিত লোক রইল না।[৪১৮]

তার আরো একটি কারণ এ যে, আল কুর'আনে ঈমান ও ইল্মকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানহীন ইল্ম বা ইল্মহীন ঈমান প্রাণহীন দেহ বা দেহহীন প্রাণ সমতুল্য। বাস্তবতার দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আল কুর'আনের ঘোষণা:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"আল্লাহ উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন সে সবকে যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও ইল্ম প্রাপ্ত লোক।"[৪১৯] আলোচ্য আয়াতখানা থেকে জানা যায় যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ এবং ইহকালিন ও পরকালিন মুক্তি নির্ভর করে ঈমান ও ইল্মের সমন্বয়ের উপর।

এ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না– এক বিষয়ে শিক্ষা দান করা হবে, আর অপর বিষয়ে শিক্ষা দান করা হবে না– ইসলামী রাষ্ট্রে এ নীতি অচল। বরং সকল জরুরী

---

৪১৪. *আল কুর'আন*, ০২:১৫১

৪১৫. *আল কুর'আন*, ০৩:১৬৪

৪১৬. *আল কুর'আন*, ৬২:০২

৪১৭. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *আল কুর'আনে রাষ্ট্র ও সরকার* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০৭), পৃ. ৩০১

৪১৮. প্রাগুক্ত

৪১৯. *আল কুর'আন*, ৫৮:১১

বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই কর্তব্য। শিক্ষার বিষয় বস্তুকে 'ধর্মীয় শিক্ষা' ও বৈষয়িক শিক্ষা– এ দুই ভাগে বিভক্ত করাও কুর'আনের দৃষ্টিতে চলতে পারে না। আল কুর'আনের আলোকে ও মানদন্ডে সর্বপ্রকারের জরুরী ও কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানই ইসলাম ও মুসলিমগণের চিরন্তন ঐতিহ্য।[৪২০]

শিক্ষার জন্য উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনের দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং তা ভঙ্গ করো না। কেননা তোমরা আল্লাহকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছো; আল্লাহ অবশ্যই তোমরা যা কর তা জানেন।"[৪২১]

শিক্ষার জন্য উপমা প্রদান

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"আল্লাহ মশা বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তুর উপমা দিতেও সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে এ সত্য তাদের রবের কাছ থেকে এসেছে কিন্তু কাফিররা বলে, আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এ উপমা পেশ করেছেন? এর দ্বারা অনেককে তিনি বিভ্রান্ত করেন। আর বহু লোককে হেদায়াত দান করেন। বস্তুতঃ ফাসিক ব্যতিত কাউকে তিনি বিভ্রান্ত করেন না। যারা আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি দৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[৪২২]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

"তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত, যে প্রত্যেক মৌসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। আর অসার বাক্যের তুলনা এক অসার বৃক্ষ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।"[৪২৩]

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে আল কুর'আন

---

৪২০. *আল কুর'আনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

৪২১. *আল কুর'আন*, ১৬:৯০-৯১

৪২২. *আল কুর'আন*, ০২:২৬-২৭

৪২৩. *আল কুর'আন*, ১৪:২৪-২৬

Dhaka University Institutional Repository

মহাগ্রন্থ আল কুর'আনই সুষ্ঠু বৈদিশিক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে

এ কথা চূড়ান্ত সত্য যে, মহাগ্রন্থ আল কুর'আনই সুষ্ঠু বৈদিশিক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের কোন কোন লিখক এ কথা লিখার ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছেন যে, বর্তমান পাশ্চাত্য দেশগুলিই নাকি সর্ব প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে এবং এ জন্য সুস্পষ্ট নীতিও নির্ধারণ করেছে! কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার সাথে প্রকৃত সত্যের লেশমাত্র নেই। ইতিহাস যারা অধ্যয়ন করেন তারা ভাল করেই জানেন যে, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মেরও বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই দুনিয়ার জাতি সমূহের পরস্পরে সুস্পষ্ট যোগাযোগ ছিল। এজন্য তাদের মধ্যে কতিপয় নিয়ম-নীতিও নির্ধারিত ছিল। সেগুলোর ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষিত হত। আর পৃথিবীতে আল কুর'আন আগমনের পর মদীনা যখন একটি ইসলামি রাষ্ট্রে রূপ লাভ করল তখন এ বৈদেশিক সম্পর্কের নীতি আরো অধিকতর সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিল। আর এজন্য উত্তম ও কল্যাণময় নিয়ম-কানুন ও রচিত হয়েছিল।[৪২৪]

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ওয়াদার প্রতি মর্যাদা দান

চুক্তি ও ওয়াদা পূরণ করা মানব প্রকৃতি নিহিত দাবি। মানুষ তার ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রাথমিক পাঠ শালায়ই তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে। এমনকি বয়স্করা যদি কখনো কোন ধরনের ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন তাহলে পরিবারের অল্প বয়স্করাই তার প্রতিবাদ করে উঠে। তাছাড়া সামষ্টিক জীবনের স্থিতি-স্থাপকতার জন্য যে কোন পর্যায়ের পারস্পরিক ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি শর্ত।[৪২৫] পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাস পরায়ণতা এ জীবনের মৌলিক ভিত্তি। ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ ব্যতিত এ ভিত্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাইতো আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

'এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো, কেননা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[৪২৬] আর মু'মিনগণের গুণ পরিচিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

'এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।'[৪২৭] আল কুর'আনে ওয়াদা পূরণকারীদের প্রশংসার লক্ষ্যে বলা হয়েছে:

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ

"জ্ঞানবানেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে, যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।"[৪২৮] আর এর বিপরীতে যারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

"যারা আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিদানের পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদেরই জন্য আছে অভিশাপ এবং আছে

---

৪২৪. *আল কুর'আনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

৪২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

৪২৬. *আল কুর'আন*, ১৭:৩৪

৪২৭. *আল কুর'আন*, ২৩:০৮

৪২৮. *আল কুর'আন*, ১৩:১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

নিকৃষ্ট আবাস।"[৪২৯] একটি আয়াতে ওয়াদা ভঙ্গকারীকে সে নারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে হাতে সূতা পরিপক্ক করার পর আবার নিজেই তা কেটে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। বলা হয়েছে:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

"তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গিকার করলে অঙ্গিকার পূর্ণ কর এবং ভঙ্গ করো না তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিন করে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করার পর। আল্লাহ অবশ্যই তোমরা যা কর তা জানেন। সে (উম্মাদিনী) নারীর মতো হয়ো না যে সুতা পাকিয়ে মজবুত করার পর তা খুলে ফেলে নষ্ট করে দেয়।"[৪৩০]

আল কুর'আন নির্দেশিত কুটনৈতিক সতর্কতা ও সংরক্ষণতা

আল কুর'আন নির্দেশিত ইসলামের একটা নিজস্ব সমর-নীতি ও সমর-কৌশল রয়েছে। শান্তি ও সন্ধির সময়ের জন্যও রয়েছে অনুসরণীয় বিশেষ নীতি ও আদর্শ। কুটনৈতিক রীতি-নীতিও এ পর্যায়ে গণ্য। ইসলামে কুটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রদূত ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের একটা বিশেষ স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ একটা সতর্কতা ও সংরক্ষণতা। ইসলামী রাষ্ট্রে বিদেশী রাষ্ট্রের কুটনীতিকদের পক্ষে এ রাষ্ট্রের আদর্শের পরিপন্থি মত প্রকাশেরও অধিকার রয়েছে। তা করলে এ জন্য তাদের কোন ক্ষতি সাধন কিংবা তার জন্য কোন অসুবিধার সম্মুখিন হতে হবে না। এ বিষয়ে নিম্নে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হল:

রাসূলে আকরাম (স.) এর সময় মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসায়লামা ইব্ন হুবাইব তাঁর কাছে লিখিত এক পত্রসহ দু'জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। তাতে লিখিত ছিল: "আমি নবুওয়াতের ব্যাপারে আপনার সাথে শরিক। তাই অর্ধেক দেশ আমার আর অর্ধেক দেশ কোরাইশদের জন্য। কিন্তু কোরাইশরা সীমালংঘনকারী লোক।" এ পত্রের বাহকদ্বয়কে রাসূলে আকরাম (স.) জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা দু'জন কী বল? তারা বলল 'আমাদের বক্তব্য ও তাই যা এ পত্রে রয়েছে।' তখন নবী কারিম (স.) তাদেরকে কিছু না বলে মুসায়লামাকে উদ্দেশ্য করে যে, পত্র লিখেছিলেন তাহচ্ছে এই:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ ، إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ : السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى . أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর পক্ষ থেকে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার কাছে প্রেরিত এ পত্র। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর যে হিদায়াতকে অনুসরণ করে। অতঃপর বক্তব্য এই যে, এ পৃথিবীর মালিকতো আল্লাহ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শুভ পরিণতি কেবলমাত্র মুত্তাকিদের জন্য।"[৪৩১] নবী কারিম (স.) মুসায়লামা প্রেরিত দূতদ্বয়ের প্রতি যে আচরণ গ্রহণ করলেন, তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্যণীয়। তারা দ্বীনে ইসলামের মূল আক্বীদাহ পরিপন্থি মত প্রকাশ করেছিল; কিন্তু রাসূলে কারিম (স.) সে জন্য তাদের প্রতি কোন আক্রমণাত্মক বা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। আর স্বয়ং মুসায়লামাকে রাসূলে কারিম (স.) যে জবাব লিখে পাঠিয়েছিলেন, তা আরো অধিক গুরুত্বের অধিকারি। দু'খানা পত্রের বক্তব্যের মধ্যে তুলনা করলেই উভয়ের মধ্যের মৌলিক পার্থক্যের আসল রহস্য উৎঘাটিত হতে পারে। রাসূলে কারিম (স.)-র পত্র থেকে নবুওয়াতের পবিত্র ভাবধারার সৌরভ মন-মগজকে আলোড়িত

৪২৯. *আল কুর'আন*, ১৩:২৫

৪৩০. *আল কুর'আন*, ১৬:৯১-৯২

৪৩১. ইব্ন হিশাম, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাতু*, (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), খ. ২, পৃ. ৬০০

Dhaka University Institutional Repository

করে। তাতে নিহিত প্রকৃত নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থপরতা, মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব মালিকত্বের অপূর্ব এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশ। আর অপরটি ভাষাহীন স্বার্থপরতা, লোভ, হিংসা ও অহংকারে পরিপূর্ণ।[৪৩২]

বিশ্ব শান্তির জন্য আল কুর'আনের ঐতিহাসিক ১৪ দফা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনের সূরা বানী ইসরাঈলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ১৪ দফা মূলনীতির অবতারণা করেছেন। ঘোষিত হচ্ছে:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا- رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا- **وَآتِ ذَا** الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا- إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا-وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًاوَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا- إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا- وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا-وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا- **وَلَا تَقْرَبُوا** مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا- وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا **كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ** الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًاوَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ **وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا** - كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا -ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'। তোমাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে তোমাদের রবই অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল। আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারিরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। আর যদি তুমি তাদের থেকে বিমুখ থাকতেই চাও তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমতের প্রত্যাশায় যা তুমি চাচ্ছ, তাহলে তাদের সাথে নম্র কথা বলবে। আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ রেখো না এবং তা পুরোপুরি প্রসারিত করো না।[৪৩৩] তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে। নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিয্ক প্রশস্ত করে দেন এবং সীমিত করে দেন। তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা। অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিয্ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয়

---

৪৩২. *আল কুর'আনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

৪৩৩. আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য– একেবারে কৃপণও হয়ো না, আবার একেবারে ধন–সম্পদ উজাড় করেও দিও না।

তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ। আর তোমরা সে নাফ্সকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয় সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত। আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা[৪৩৪] ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গিকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর মাপে পরিপূর্ণ দাও যখন তোমরা পরিমাপ কর এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন কর। এটা কল্যাণকর ও পরিণামে সুন্দরতম। আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আর যমিনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমিনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না। এ সবের যা মন্দ তা তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়। এগুলো সে হিকমতভুক্ত, যা তোমার রব তোমার নিকট ওহীরূপে পাঠিয়েছেন। আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য নির্ধারণ করো না, তাহলে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে।"[৪৩৫]

আল কুর'আন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঁধার

মহাগ্রন্থ আল কুর'আনুল কারিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্ভুল তথ্য উপাত্ত দিয়ে পরিপূর্ণ রয়েছে। পবিত্র কুর'আনের সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :

يس. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

'ইয়াসীন। বিজ্ঞানময় কুর'আনের শপথ।'[৪৩৬]

আল কুর'আনুল কারিম বিজ্ঞানের সকল শাখা ও উপশাখার উপর মৌলিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন : মহাকাশ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, গতি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, নক্ষত্র বিজ্ঞান, ভূগোল বিজ্ঞান ইত্যাদি। মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনুল কারিমের সূরা মুল্কে ঘোষণা করেছেন যে:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

'তিনি সে সত্ত্বা যিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন, দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার চোখ মেলে দেখ কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?'[৪৩৭]

অত্র সূরায় আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

'আর আমি নিকবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। আর ওদের জন্য প্রস্তুতি রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।'[৪৩৮]

বিশিষ্ট কুর'আন গবেষক মরহুম আবুল খায়ের বলেছেন: 'মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রায় ৭৫০টি আয়াত রয়েছে।'[৪৩৯] এছাড়াও কুর'আনের মধ্যে যত বিষয়ের আলোচনা হয়েছে তত বিষয়ের

৪৩৪. ইয়াতীমের দেখাশুনা করে সম্পদ বাড়ানো, তার নিজের খরচ এবং দরিদ্র হলে অভিভাবকের বেতন গ্রহণ বৈধ।

৪৩৫. *আল কুর'আন*, ১৭:২৫-৩৯

৪৩৬. *আল কুর'আন*, ৩৬:০১-০২

৪৩৭. *আল কুর'আন*, ৬৭:০৩

৪৩৮. *আল কুর'আন*, ৬৭:০৫

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান আল কুর'আনে আছে বলে মেনে নিতে হবে। যার মধ্যে বিজ্ঞানের কাছে নতুন পরিচিত কিছু আবশ্যকীয় শাখারও নাম আসতে পারে। যেমন: তাওহীদ বিজ্ঞান, রিসালাত বিজ্ঞান, পরকাল বিজ্ঞান, ঈমান বিল গায়েব বিজ্ঞান, স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিজ্ঞান, হিদায়াত বিজ্ঞান, কুফরি বিজ্ঞান, ফসল বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান, মধ্যাকর্ষণ বিজ্ঞান, সময় বিজ্ঞান সহ বহু বিজ্ঞান আল কুর'আনুল কারীমে বিদ্যমান রয়েছে।[৪৪০] মহাগ্রন্থ আল কুর'আন এক মহা বিস্ময়কর গ্রন্থ। পৃথিবী তার শুরু থেকে অদ্যাবধি এমন বিস্ময়কর গ্রন্থের সন্ধান পায়নি। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত এ মহাগ্রন্থের বিস্ময়কারিতার কোন সমাপ্তি ঘটবে না এবং এর মত কোন গ্রন্থ রচনাও সম্ভব হবে না। প্রায় দেড় হাজার বছরের এ প্রাচীন গ্রন্থকে আধুনিক বিজ্ঞানের মুখোমুখি করা হয়েছে। মজার এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কুর'আনের দাবি হচ্ছে বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের দাবি হচ্ছে প্রমাণ। অথচ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ দু'টো একে অন্যের চোখের গভীরে নিজেকেই স্বচ্ছভাবে দেখতে পাচ্ছে। মহাগ্রন্থ আল কুর'আন কোন বিজ্ঞানের গ্রন্থ না হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতিটি শব্দ, বাক্য এবং সূরা বিজ্ঞানভিত্তিক। যাতে বাস্তবতা ব্যতিত কোন অবাস্তবতা নেই। আর থাকার প্রশ্নই আসে না কারণ তা যে সুমহান বিজ্ঞানী আল্লাহর কালাম (কথা)।[৪৪১] বর্তমান বিশ্বের বিস্ময়কর বিজ্ঞান হচ্ছে সৌর বিজ্ঞান। দিন যত যাচ্ছে সৌর বিজ্ঞানীগণ ততই নব নব গ্রহ নক্ষত্রের সন্ধান পাচ্ছে। সুতরাং এর উপরই কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যাক।

আল কুর'আনে ব্ল্যাকহোল

মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের সূরা ওয়াকেয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

"আমি শপথ করছি নক্ষত্র সমূহের পতিত হওয়ার স্থানের। অবশ্যই এটা এক মহাশপথ যদি তোমরা জানতে পার। আর নিশ্চয় তা সম্মানিত কুর'আন।"[৪৪২]

বর্তমান মহাকাশ বিজ্ঞান একের পর এক অজানা তথ্য উদঘাটন করে চলেছে। আবিস্কার করছে মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা শ্বেত রামুন, নিউট্রন তারকা ও ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণ গহবরের মত মহা জাগতিক বিস্ময়গুলোকে। সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি 'টাইম মেশিন হাবল'-এর সহায়তায় মহাকাশের যে চমকপ্রদ তথ্য উদঘাটিত হচ্ছে সেগুলোর সাথে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে নাযিলকৃত আল কুর'আনে প্রদত্ত বিজ্ঞান বিষয়ক ঐশী তথ্যগুলোর যে অদ্ভূত মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা প্রতিটি জ্ঞানবান চিন্তাশীল মানুষকে ভাবিত ও অভিভূত না করে পারে না।

বর্তমান মহাকাশ বিজ্ঞানের সহায়তায় আমরা আরো অবগত হয়েছি যে, শেষ পর্যন্ত সূর্যের পারমানবিক জ্বালানী ফুরিয়ে যাবে এবং এর জন্য আরও প্রায় ৫০০ কোটি বছর সময় লাগবে। যে সমস্ত তারকার ভর সূর্যের ভরের চেয়ে অধিক, তারা তাদের জ্বালানী আরো দ্রুত জ্বালিয়ে শেষ করবে। তবে সূর্যের ভরের দ্বিগুণের চেয়ে কম ভর সম্পন্ন তারকাগুলো শেষে সংকোচিত হওয়া বন্ধ করবে এবং একটা সুস্থির অবস্থায় স্থিতি লাভ করবে। এরকম একটি অবস্থার নাম 'শ্বেত বামন' এবং আরেকটি অবস্থার নাম 'নিউট্রন তারকা'। আমাদের নিহারিকায় বহু শ্বেত বামন ও নিউট্রন তারকা পর্যবেক্ষণ করা যায়। এ নিউট্রন তারকাগুলো ১৯৬৭ সালের আগে কখনো দেখা যায়নি বলে মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ উল্লেখ করেছেন। যেহেতু সূর্যের জ্বালানী ক্রমান্বয়ে কমে আসছে, সুতরাং এর তাপ বিকিরণ তথা আলোক

---

৪৩৯. খন্দকার আবুল খায়ের, *কুর'আনই বিজ্ঞানের উৎস* (ঢাকা: খন্দকার প্রকাশনী, মার্চ ২০০৮), পৃ. ০২

৪৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪

৪৪১. ড. মরিস বুকাইলি, *আল কুর'আন এক মহা বিস্ময়*, অনু. খোন্দকার রোকনুজ্জামান (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জানু. ২০১১), পৃ.০৬

৪৪২. *আল কুর'আন*, ৫৬:৭৫-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

বিকিরণের পরিমাপও ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের সূর্যটা আস্তে আস্তে নিস্প্রভ হয়ে আসছে। কিন্তু সূর্যের আলোর ঔজ্জল্য এত বেশি যে, এ হ্রাসপ্রাপ্তি সুক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া খালি চোখে বা বাহ্যিকভাবে অনুভব করা যায় না। অথচ এ বিষয়টি ১৪০০ বছর আগেই মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের সূরা ওয়াকিয়াহর ছোট্ট একটি আয়াতে কত নিখুঁতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরা তাকভীরের ১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

"যখন সূর্য জ্যোতিহীন বা নিস্প্রভ হয়ে যাবে।"[৪৪৩]

তাছাড়া ধীরে ধীরে যে আকাশের নক্ষত্রগুলো স্তিমিত হবে ও নিভে যেতে থাকবে অর্থাৎ অসংখ্য শ্বেত বামন ও নিউট্রন তারকার সন্ধান পাওয়া যাবে তা আল কুর'আনের আলোচ্য দু'টো আয়াতের বক্তব্য দ্বারাই বুঝা যায়। সূরা মুরসালাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ

" অতঃপর যখন নক্ষত্ররাজি নিভে যাবে।"

বর্তমানে মহাকাশে ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণ গহবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত আবিস্কৃত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির আলোকে এ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু বিবরণ তুলে ধরা হল:

কৃষ্ণ গহবর, শিশু মহাবিশ্ব, কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আল কুর'আন এক মহাবিস্ময়কর বিজ্ঞানময় কুর'আন, ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্যানুসারে জানা যায় যে, ব্ল্যাকহোলের আবিস্কার বর্তমান সৌর বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বড় সাফল্যের দিক। অথচ এ ব্ল্যাকহোল সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের কয়েক জায়গায় শপথ করেছেন। এমনকি তিনি এও বলেছেন যে, 'এ এক মহা শপথ যদি তোমরা জানতে পার।'

গত ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ মে দৈনিক ইনকিলাব রয়টার্সের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি খবর ছেপেছিল যে, "হাবল মহাশূণ্য টেলিস্কোপ বিশাল সেন্টারাম তারকাপুঞ্জের মাঝখানে একটি ব্ল্যাকহোলের (অন্ধকার কূপ) ছবি তুলেছে। পৃথিবী থেকে এক কোটি আলোকবর্ষ দূরে এর অবস্থান।"[৪৪৪]

আরেকটি সংবাদ যা ঐ সনের ২০ জুনের দৈনিক ইনকিলাবেই প্রকাশিত হয়েছিল "সুদূর তারকাপুঞ্জের মাঝখানে এক ব্ল্যাকহোলকে ঘিরে মহাশূণ্যে বিরাট আকৃতির চক্রাকার টুপির মত একটি ধূলি চাকতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। গত ১৮ জুন হাবল মহাশূণ্য টেলিস্কোপ থেকে ছবিটি প্রেরণ করা হয়। ধূলির এ চাকতি ব্যাসার্ধে প্রায় ৩৭০০ আলোকবর্ষ বিস্তৃত। এটি অতি প্রাচীনকালের তারকাপুঞ্জের সংঘর্ষজনিত ফলশ্রুতি হতে পারে। মহাশূণ্য বিজ্ঞান টেলিস্কোপ ইন্সটিটিউট হাবল ছবি বিশ্লেষণ করে। তাদের মতে এ চাকতিটি গঠিত হবার পর কয়েক কোটি বছরে এ বিস্ময়কর ব্ল্যাকহোল তাকে গ্রাস করে। এ ব্ল্যাকহোল ৩০০ সূর্যের সমাহার। এটি তারকাপুঞ্জ এন জি সি ৭০৫২ এর মাঝখানে। এটি পৃথিবী থেকে ১৯ কোটি ১০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, কোন নক্ষত্র যখন এর আওতায় এসে যায় তখন তা এর মধ্যে তার অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে।"[৪৪৫] সুতরাং এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, ব্ল্যাকহোল হচ্ছে তারকাসমূহের পতিত হওয়ার স্থান, যে স্থানের শপথ করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনের সম্মানের স্বীকৃতি দিয়েছেন এখন থেকেও ১৪০০ বছর পূর্বে। আল কুর'আনে মোট ৩৮টি আয়াতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান চর্চার নির্দেশ রয়েছে।[৪৪৬] এছাড়াও এক সমীক্ষায় দেখা গেছে আল কুর'আনে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর তথ্য সমৃদ্ধ আয়াত রয়েছে প্রায় সহস্রাধিক। আর বিজ্ঞান চর্চার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলাই পবিত্র কুর'আনে দিয়ে রেখেছেন:

---

৪৪৩. *আল কুর'আন*, ৭৭:০৮

৪৪৪. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ জুন ১৯৯৮

৪৪৫. প্রাগুক্ত, ১৪ মে ১৯৯৮

৪৪৬. খন্দকার আবুল খায়ের, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"সুতরাং হে দৃষ্টিবান ব্যক্তিগণ তোমরা বিশেষ জ্ঞান লাভ কর।"[৪৪৭] বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

"তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে যথাযথভাবে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সৃষ্টি করেছেন! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন।"[৪৪৮] আল্লাহ তা'আলা নিম্মোক্ত আয়াতমালায়ও বিজ্ঞান চর্চার পরোক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"নিশ্চয় আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা–ভাবনা করে এবং বলে, 'হে আমদের রব! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"[৪৪৯]

সাত আসমান

আমরা আমাদের চতুর্দিকে যে অসীম বিস্তৃতি অবলোকন করি অথবা বিজ্ঞানীগণ শক্তিশালী দূরবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঊর্ধাকাশে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম, সে দূরত্বই কি সাত আসমানের শেষ সীমা? নাকি আল্লাহ তা'আলা থরে থরে যে সাতটি আসমান সাজিয়ে রেখেছেন তার প্রথমটি? এ প্রশ্নটি নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। এর যথার্থ জবাব বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। এমনকি প্রথম আসমানের অস্তিত্বই আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করতে পারেনি। তবে আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনুল কারিমে প্রথম আসমানের পরিচয় দিয়ে রেখেছেন এভাবে:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

"আর অবশ্যই আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়েছি।"[৪৫০]

এ আয়াতই প্রমাণ দিচ্ছে যে আমাদের বিজ্ঞানীগণ সৌর জগত ও এর বাইরের যত আবিস্কার করছেন তা সবই প্রথম আসমানের নিচের। তবে বিজ্ঞানীগণ কুর'আনের তথ্যের আলোকে গবেষণাকর্ম চালিয়ে গেলে সত্যান্বেষী বিজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাবেন। এর ফলে সকল দ্বিধা-দ্বন্দের ঊর্ধে উঠে মানুষ সত্যকে আরো নিবিড়ভাবে জানতে ও বুঝতে পারবে।

এছাড়াও বৈজ্ঞানিক অসংখ্য তত্ত্ব-উপাত্ত মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে রয়েছে।

আলোচ্যাংশে কুর'আনের জ্ঞান-বিজ্ঞানজগৎ সম্পর্কে সামান্য কিছু বিবরণ দেয়া হল উদ্দেশ্য এতটুকুই যে, যে কুর'আন এমনসব নিখুঁত সত্য বিষয়কে লালন করে সে কুর'আনই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র মাধ্যম হতে পারে; অন্য কোন গ্রন্থ কিংবা তন্ত্র-মন্ত্র নয়। এ সত্য কথাটি যেন আমাদের সকলের সহজে বোধগম্য হয়।

আল কুর'আন ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

৪৪৭. *আল কুর'আন*, ৫৯:০২

৪৪৮. *আল কুর'আন*, ১৪:১৯

৪৪৯. *আল কুর'আন*, ০৩:১৯০-১৯১

৪৫০. *আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এ প্রবাদটি সকলেরই জানা। আল কুর'আন মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান । আল কুর'আনে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল কুর'আনের দৃষ্টিতে মানব জাতিকে দেয়া মহান রাব্বুল 'আলামিনের অন্যতম নিয়ামত এবং আমানত হচ্ছে স্বাস্থ্য। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে আল্লাহর ইবাদত এবং অন্যান্য কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঈমানের পরেই স্বাস্থ্যের স্থান। স্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। স্বাস্থ্য ভাল রাখা উচিত। সুতরাং স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম যত্ন নেয়া উচিত। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। সুস্থ থাকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও নিতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া আমাদের এ দেহ ও স্বাস্থ্যের দেখভাল আমরা কেমন করেছি, এগুলোর ব্যবহার আমরা কেমন করেছি, এর জন্য কাল কিয়ামতের দিন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"আমি আজ তাদের মুখের উপর মহর মেরে দেব, এদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং এদের পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।"[৪৫১] অতএব আমাদের এ দেহ ও স্বাস্থ্যের সঠিক দেখভাল করতে হবে। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন কুর'আনি জীবন-ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আল কুর'আন এরূপ জীবন-ধারার সূচনা করেছে। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সবকিছুই এতে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য এবং শরীর-স্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের বিস্তর দিক নির্দেশনা রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতে। বস্তুত কুর'আনি জীবনাচারণের মধ্যেই নিহিত আছে সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। অযু, গোসল, সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাতসহ কুর'আনের প্রতিটি বিধানই স্বাস্থ্যকর। এছাড়া মুসলিমদের খাওয়া-দাওয়া, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি সব কিছুই সুস্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক। অযু, গোসল, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। অযু এবং গোসল পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম। সালাতের পূর্বে অযু করতে হয়। সালাত জান্নাতের চাবি, আর সালাতের চাবি হলো অযু। মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে সালাতের আগে অযু করার নির্দেশ দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলাবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে, যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে (প্রবাসে) থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটি দিয়া তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে, আল্লাহ্

৪৫১. *আল কুর'আন*, ৩৬:৬৫

তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।"[৪৫২]

অযুর ফরজ এগুলো। অযু করার সময় শরীরের এ সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াও তিনবার করে হাত ধুতে হয়, কুলি করতে হয়, মুখমন্ডল ধুতে হয়, নাক পরিস্কার করতে হয়, এগুলো অযুর সুন্নাত। অযু যেমন আমাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র করে, তেমনি এর প্রতিটি ধাপ আমাদের শরীরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে সহায়তা করে, রোগ-ব্যাধি মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসলেরও নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুর'আনে। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের জন্য যে সব নিয়ম মেনে চলা জরুরী, যেগুলো মেনে চললে স্বাস্থ্য সুন্দর থাকে, রোগ ব্যাধি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা। এগুলোর মধ্যে শারিরীক পরিচ্ছন্নতা, কাপড়-চোপড়ের পরিচ্ছন্নতা, হাত, মুখ, দাঁত, নখ, পা, ইত্যাদির যত্ন, খাওয়া-দাওয়ার সময় সতর্কতা, হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় সতর্কতা, থুথু ফেলায় সাবধানতা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, ইত্যাদি। পরিস্কার পচ্ছিন্নতা বা ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চার মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। আল কুর'আনে মুসলিমদের সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্নতা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নামাজের পূর্বে অযু করতে হয়। অযু কিভাবে করতে হবে, শরীরের কোন কোন অঙ্গ ধৌত করতে হবে। অযু করার সময় শরীরের এসব অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াও তিনবার করে হাত ধুতে হয়। কুলি করে মুখ ধুতে হয়, নাক পরিষ্কার করতে হয় এ নিয়মগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে এর প্রতিটি পর্ব আমাদের শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে এবং রোগ-ব্যাধি মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য তিনি বলেন:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ

"(হে রাসূল!) আপনি তাদের বলুন, বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতিত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে তা এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে।"[৪৫৩]

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

"যখন আপনার পালনকর্তা ফিরিস্তাগণকে বললেন, আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তাঁর সম্মুখে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো।"[৪৫৪] অতএব একথা বলিষ্ঠভাবে বলা যায় যে, মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মধ্যেই রয়েছে সকল প্রকার পবিত্রতা, চিকিৎসা এবং প্রশান্তি।

---

৪৫২. *আল কুর'আন*, ০৫:০৬

৪৫৩. *আল কুর'আন*, ০৬:৪৬

৪৫৪. *আল কুর'আন*, ৩৮:৭১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

শান্তির পথে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে আল কুর'আন

পিতা-মাতার হক আদায় না করার বিরুদ্ধে আল কুর'আন

মানুষের উপর মহান আল্লাহর হক সর্ব প্রথম। তার পরই তার নিজের উপর নিজের হক। আল্লাহর হক সর্বপ্রথম এ জন্যে যে, তিনিই বিশ্বজাহানের এবং এ পৃথিবীর মহান সৃষ্টিকারী। মানুষ তাঁরই এক বিশেষ সৃষ্টি। এ বিশ্বলোক, পৃথিবী ও মানুষকে দয়া করে তিনি সৃষ্টি না করলে মানুষের জীবনই সম্ভব হত না, হক-হুকুমের কোন প্রশ্নই উঠত না। অতঃপর মানুষের নিজের উপর নিজের হক। কেননা মানুষ যদি নিজের উপর নিজের হক আদায় না করে, তাহলে তার দ্বারা অন্য কারো হক আদায় হবে এমন আশা কিছুতেই করা যায় না। নিজের উপর নিজের হক আদায় করার পরই অন্য লোকদের হক আদায় করা সম্ভব হতে পারে। এ পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই, মানুষের উপর অন্যান্য মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যাদের হক ধার্য ও আরোপিত হচ্ছে তারা হচ্ছেন পিতা ও মাতা। কুর'আন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতে বান্দার উপর আল্লাহর হক আল্লাহর প্রতি বান্দার করণীয় উল্লেখের পরই উল্লিখিত হয়েছে পিতা-মাতার হকের কথা। কেননা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি না করলে মানুষের পক্ষে এ জীবন লাভ করা সম্ভব হত না এটা যেমন পরম সত্য, ঠিক তেমনি এও পরম সত্য যে, আল্লাহ মানুষকে পিতা-মাতার মাধ্যমেই সৃষ্টি করেছেন। পিতা-মাতার ঔরস ও গর্ভে না হলে এ দুনিয়ায় মানুষের আগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে থাকত। এ দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টির যে ধারা মহান আল্লাহ শুরু করেছেন, তার সূচনায় সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে একজন পুরুষ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁরই অংশ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন একজন স্ত্রীলোক। পরবর্তীতে এ পুরুষ ও স্ত্রীলোক স্বামী-স্ত্রী হিসাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করলে মানুষের বংশের ধারা শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে বাবার ঔরস ও মায়ের জরায়ুর মাধ্যমে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন, আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা পরস্পর যাঞ্চা কর, জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৪৫৫]

الذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

"যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেন। পরে তিনি ওকে সুঠাম করেছেন এবং তাঁর নিকট হতে ওতে জীবন সঞ্চার করেছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ। তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[৪৫৬]

'তুচ্ছ তরল পদার্থ' বলতে পিতার শুক্রকীট বুঝিয়েছেন, যা মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করার পর বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করে মাতৃগর্ভে অবস্থান করে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি লাভ করে। অতঃপর ভূমিষ্ট হয়। দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টির এটাই হচ্ছে একমাত্র ধারা। এ ধারা অনুসরণ ব্যতিত এ দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর পর পরই মানুষের উপর সবচাইতে বেশী অনুগ্রহ হচ্ছে এ মানুষ দু'টির- যাদের মধ্যে পুরুষ তার পিতা এবং নারী তার মাতা। তাই আল্লাহর পর পরই মানুষের উপর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক হক এ পিতা ও মাতার বলে বলা হয়েছে।[৪৫৭]

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বান্দার উপর সর্বপ্রথম হক হচ্ছে মহান রব-এর এবং তা হচ্ছে, বান্দা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব অধীনতা কবুল করবে না, অন্য কারোরই সার্বভৌমত্ব মেনে নেবে না। তার পরই হক হচ্ছে পিতা-মাতার। উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা বান্দার উপর আল্লাহর হক-এর কথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। বলা যায়, যতটা সংক্ষিপ্তভাবেই কথাটি বলা হোক, পূর্ণ কথাই বলা হয়েছে। বলার কিছুই বাকি রাখা হয়নি। আর তার পরই বলা হয়েছে বান্দার উপর পিতা-মাতার হকের কথা। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের কথা এখানে যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে সর্বপ্রথম বলা হয়েছে উভয়ের প্রতি 'ইহসান' করতে। আভিধানিকদের মতে 'ইহসান'-এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক অর্থে অন্য লোকদের সাথে শুভ ও মঙ্গলময় আচরণ ও তাদের কল্যাণ সাধন বুঝায়। আর দ্বিতীয় অর্থে কোন ভাল কথা জানা ও নেক কাজ সম্পন্ন করা বুঝায়। এক অর্থে দয়া-অনুগ্রহও বুঝায়। অর্থাৎ পিতা মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের অক্ষমতা প্রকট হয়ে উঠে। তখন তাদের নানামুখি প্রয়োজন পূরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে, যা করা তাদের নিজেদের পক্ষে সম্ভব হয় না, অন্য কারো করে দেয়ার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়। সে 'অন্য' বলতেই প্রথমে আসে তাদের ঔরসজাত ও গর্ভজাত সন্তানেরা। তাদেরই কর্তব্য হয়ে পড়ে পিতা-মাতার সেই প্রয়োজন সমূহ পূরণ করে দেয়া। তারা বয়োবৃদ্ধ, নানাভাবে অক্ষম। এ অক্ষমতা যেমন উঠা-বসায় ও চলাফেরায় প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তেমনি কামাই রোজগারেও অক্ষমতা দেখা দেয়। সর্বোপরি তাদের বার্ধক্য ভারাক্রান্ত মন ও দেহ চায় নিকটবর্তীদের সহযোগিতা। যখন তারা উঠতে পারে না তখন তাদের উঠতে সাহায্য করা, যখন চলতে পারে না তখন চলার সাহায্য করা, যখন আর উপার্জন করতে পারে না বলে অন্ন-বস্ত্রের অভাব দেখা দেয়, তখন তাদের অন্ন-বস্ত্র প্রয়োজন মতো

৪৫৫. *আল কুর'আন*, ০৪:০১

৪৫৬. *আল কুর'আন*, ৩২:০৭-০৯

৪৫৭. *আল কুর'আন*, ১৭:২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

যুগিয়ে দেয়া সন্তানদেরই অতি বড় কর্তব্য। বাহ্যিক কথাবার্তায় শালীনতা-ভদ্রতা দেখানো বিশেষ করে পিতা-মাতার সহিত ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং সম্মানজনক সম্বোধন ও কথোপকথনের গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তান যদি পিতা-মাতার মনে আঘাত দেয় বা অপমানজনক কথাবার্তা বলে, তা হলে তাদের মনে আঘাতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সহসাই তাদের মুখে মর্মভেদী 'উহ' শব্দটি ধ্বনিত হবে। বস্তুত 'উহ' শব্দটি দীর্ন-বিদীর্ন কলিজার অভিব্যক্তি। এই ধ্বনি পিতা-মাতার কণ্ঠে উচ্চারিত হলে বোঝাই যাবে যে, মনে বড় দুঃখ পেয়েছেন, কলিজায় আঘাত লেগেছে। তখন তাদের মনোভাব এ-ও হতে পারে যে, 'কেন বিয়ে করলাম আর কেন এমন সন্তান জন্ম দিলাম, যার অপমানজনক কথায় আজ দুঃখ পেতে হচ্ছে, অপমানিত হতে হচ্ছে।' মনে এ ভাব জাগ্রত হতে পারে যে, 'কেন এমন কুসন্তান গর্ভে দশ মাস ধরে ধারণ করলাম, কেন প্রানান্তকর প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করলাম এবং কেন কষ্ট স্বীকার করে এ সন্তানকে শৈশবকালে লালন-পালন করে বড় করে তুললাম। আহ এমন সন্তান যদি জন্ম না নিত' তাদের মনে এজন্য কঠিন অনুতাপও জাগতে পারে। এমন সন্তানের প্রতি প্রবল অসন্তোষ এবং বদ দু'আ, যা সন্তানের জন্য কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না, বরং সর্বাংশে চরম অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে তাদের জীবনে, অভিশাপ হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হতে পারে অশুভ বৃষ্টি। শুধু তাই নয়, পিতা-মাতার এ মনোভাব সংক্রমিত হতে পারে গোটা সমাজের লক্ষ লক্ষ বিবাহেচ্ছুক যুবক-যুবতীর মধ্যে। তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি, তার ফলশ্রুতিতে সন্তান জন্মদানের প্রতি কঠিন অনিহা জেগে উঠতে পারে। আর তা হলে তা হবে গোটা সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার ফলে মানব বংশের অগ্রগতি, বিস্তৃতি ও ধারাবাহিকতা সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু মানব স্রষ্টা আল্লাহ তো মানব বংশের অগ্রগতি, বিস্তৃতি ও অব্যাহত ধারাবাহিকতা চান। তাই তিনি সন্তানের প্রতি আদেশ করেছেন পিতা-মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার করতে, ভাল আচরণ করতে, সম্মান রক্ষা করে কথাবার্তা বলতে। পক্ষান্তরে এমন আচরণ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন, যার ফলে তাঁরা মনে কষ্ট পেতে পারেন, নিষেধ করেছেন তাদেরকে গালাগাল দিতে, মন্দ কথা বলতে ও ভর্ৎসনা করতে। বরং তার বিপরীতে পিতা-মাতার খেদমতে দুই বিনয়ী বাহু বিছিয়ে রাখতে বলেছেন সর্বক্ষণ এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কি ভাষায় দু'আ করা উচিত, তাও শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর শেখানো এ দু'আটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বলেছেন:

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"আর বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার শিশুকালে আমার পিতা-মাতা দু'জনে মিলে যেমন করে আমাকে লালন-পালন করেছেন, তুমি তেমনিভাবে তাদের প্রতি রহম (অনুগ্রহ) কর'(তোমার রহমতের কোলে লালন পালন কর)।[৪৫৮]

অর্থাৎ আমি এক সময় শিশু ছিলাম, আমার কোন কর্মক্ষমতা ছিল না, খাদ্য প্রস্তুত করা তো দূরের কথা, কোন কিছু করা বা উপার্জন করারও কোন সাধ্য আমার ছিল না। ধরে খাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। সে সময় পিতা-মাতা আমার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, প্রয়োজনীয় কাপড়- চোপড় যোগাড় করে দিয়েছেন। আমি ভেজা বা ময়লার মধ্যে পড়ে থাকলে অনতিবিলম্বে আমাকে ময়লামুক্ত করে গরম শয্যায় স্থান দিয়েছেন, যা করার কোন সাধ্যই আমার ছিল না। আর পিতা-মাতা আমার জন্য যাই করেছেন, অন্তরের অকৃত্রিম দরদ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে করেছেন। তখন তাঁরা সক্ষম ছিলেন কিন্তু এখন তারা অক্ষম হয়ে পড়েছেন। সেদিন আমি যেমন পিতা-মাতার অন্তরের দরদ ও স্নেহ-ভালবাসার মুখাপেক্ষী

৪৫৮. *আল কুর'আন*, ১৭:২৪

ছিলাম, আজ তাঁরা এ বার্ধক্য বয়সে তেমনি আন্তরিক দরদ ও স্নেহ-ভালোবাসার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন। অতএব, হে আমার রব আজ তুমি তাদের প্রতি তেমনি রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহম তারা আমার প্রতি বর্ষণ করেছেন আমার শৈশবকালীন অক্ষমতার সময় আমার লালন-পালনে। সে দিন আমি যেমন সে রহমতপূর্ণ লালন-পালনের মুখাপেক্ষী ছিলাম, আজ তাঁরা তেমনি দয়া অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন বার্ধক্যের অক্ষমতাকালে।[৪৫৯]

বস্তুত, কুর'আন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক-এর কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। বর্ণিত হচ্ছে:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"আমি মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন, তাকে স্তন্যপান করাতে দু'বছর লাগে। তাই আমার ও পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন।"[৪৬০]

আলোচ্য আয়াতটিতে প্রথমে মানুষকে পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। তার পরই বিশেষভাবে তার মা যে তাকে নিয়ে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার কথা বলা হয়েছে। সন্তান নিয়ে মার কষ্ট যে মর্মস্পর্শী তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মা তাঁর সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও বহন করেন সাত মাস থেকে দশ মাস পর্যন্ত। এ গর্ভ বহন করা যে কতখানি কষ্টকর, তা গর্ভবতী মা ই মর্মে মর্মে বুঝেন। অন্যের পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ গর্ভ বহনের কষ্ট স্বীকারের পর আসে তাকে ভূমিষ্ট করার কঠিন মুহূর্ত। প্রসব যন্ত্রনা যে কতখানি কষ্টদায়ক, তা অন্যেরা কি বুঝবে? সন্তান প্রসব করার কষ্ট স্বীকার করার পর অক্ষম সন্তানকে লালন পালন করার প্রশ্ন দেখা দেয়। এ গর্ভকাল, সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনের সময় বেশী দীর্ঘ-এ দীর্ঘ সময় মাকে অত্যন্ত দূর্বলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। দেহ যেমন দূর্বল, মনও তেমনি নাজুক। সন্তান প্রসবকালে অনেক মাকে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়। এ প্রেক্ষিতে মার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কতখানি বড় হয়ে দাড়ায়, তা সহজে বুঝা উচিত। মা যদি সন্তানের জন্য এতখানি কষ্ট স্বীকার করতে রাজি না হতেন, তা হলে দুনিয়ায় মানুষের আগমন সম্ভবপর হত না। কাজেই সন্তান গর্ভে ধারণ করা, তাকে জীবন্ত প্রসব করতে রাজি হওয়া এবং শৈশবের এ অক্ষম শিশুকে লালন-পালন করতে, তার হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে প্রস্তুত হওয়া মার দিক থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সন্তানের কর্তব্য মায়ের শোকর আদায় করা, আদায় করতে প্রস্তুত থাকা। আর আল্লাহ তা ফরয করে দিয়েছেন।[৪৬১] আর যেহেতু আল্লাহ মা'কে উত্তমরূপে কষ্ট স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন এবং মায়ের এ কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে তিনি দুনিয়ার মানব বংশের ধারা অব্যাহত রেখেছেন, এ জন্য সব চাইতে বেশি শোকর করা কর্তব্য মহান আল্লাহর। এ দিক দিয়ে মানুষের উপর যেমন হক রয়েছে মহান স্রষ্টার, তেমনি হক রয়েছে মায়ের আর সে সাথে পিতারও। কেননা পিতা যদি জন্ম দিতে এবং মাতা যদি গর্ভ গ্রহণ, বহন ও প্রসব যন্ত্রনা ভোগ করতে এবং সর্বশেষ বাচ্চার অক্ষম অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করতে রাজী না হতেন, তাহলে দুনিয়ায় মানুষ পাওয়ার আর কোন উপায়ই থাকত না। পিতা-মাতা কেবল নিজেদের জীবদ্দশাতেই সন্তানের সঠিক কল্যাণের ব্যবস্থা করেন না, ইন্তেকালের সময়ও সন্তানের জন্য সহায়-সম্পত্তি রেখে যান যা সন্তানের প্রভূত কল্যাণের মাধ্যম

---

৪৫৯. হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি' (র), *কোরআনুল কারিম (মূল:তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন)*, অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সৌদি আরব: খাদেমুল-হারমাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরি), পৃ. ৭৭৩

৪৬০. *আল কুর'আন*, ৩১:১৪

৪৬১. *কোরআনুল কারিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৬

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সে জন্যে আল্লাহ পিতা-মাতার রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ-সম্পত্তিকে সন্তানের জন্য মীরাস ঘোষণা করেছেন। তিনি কুর'আনে বলেছেন:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, তাদের জন্য এক নির্ধারিত অংশ।"[৪৬২] আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার হক সন্তানের উপর ধার্য করেছেন, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের বিরাট কর্তব্যের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সন্তানের বড় কর্তব্য হচ্ছে পিতা-মাতার হক আদায় করা। বার্ধক্যে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আচরণ যা-ই হোক, সন্তানের নিকট ভালো আচরণ পাওয়ার অধিকার কখনই ক্ষুন্ন হতে পারে না। এ পর্যায়ে কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"তোমার পিতা-মাতা আমার শরীক করাতে চাইলে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তুমি তাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সৎ ভাবে বসবাস কর এবং আমার প্রতি বিনীতদের পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমাদের কৃতকর্ম আমি জানাবো।"[৪৬৩]

পিতা-মাতা সন্তানের নিকট সর্বাবস্থায়ই সম্মানার্হ, ভালো আচার-আচরণ পাওয়ার অধিকারী, এ কথা সকল সন্দেহ এবং আপত্তি-বিতর্কের উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষের দাসত্ব আনুগত্য পাওয়ার নিরংকুশ অধিকার যেহেতু একমাত্র আল্লাহর, তাই তারা যদি সেই এক, একক ও অনন্য আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, তা হলে সে চাপের কাছে কিছুতেই মাথা নত করা যাবে না। এ ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তাই বলে তাদের সঙ্গে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করবে এ অধিকারও সন্তানদের থাকতে পারে না। পিতা-মাতা সন্তানকে শির্ক করার জন্য নিরংকুশভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে যদি বিরত রাখতে চায়, তা হলে তা কিছুতেই গ্রাহ্য করা যাবে না, কেননা শিরক সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যাত, ভিত্তিহীন, জঘন্য মিথ্যা এবং হারাম।[৪৬৪] পিতা-মাতার অযৌক্তিক, জঘন্য ও বীভৎস এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা এ অযৌক্তিক চাপ অগ্রাহ্য করতে হবে। কিন্তু তারা মুশরিক হলেও তাদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করা যাবে না, তাদেরকে মন্দ বলা যাবে না, সন্তানদের উপর তাদের যে মানবিক অধিকার রয়েছে তা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা যাবে না। বরং শুভ আচার-ব্যবহার ও খিদমত পাওয়ার যে অধিকার তাদের রয়েছে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে, তারা অমুসলিম হলেও।

নিকট আত্মীয়দের হক আদায় না করার বিরুদ্ধে

আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মাজিদে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন, সুতরাং

৪৬২. *আল কুর'আন*, ০৪:০৭

৪৬৩. *আল কুর'আন*, ৩১:১৫

৪৬৪. *কোরআনুল কারিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৬

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা পরস্পর দাবি কর, জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৪৬৫]

আরবি আরহাম শব্দটি বহুবচন, একবচনে রেহেম। 'রেহেম' শব্দের অর্থ নৈকট্য, রক্ত সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয়, একই মা'র গর্ভে জন্ম হওয়া। এ সব দিক দিয়ে যাদের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তা রয়েছে, তাদের সঙ্গে পারস্পারিক সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তা ছিন্ন করার মর্মান্তিক পরিণতিকে ভয় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন এবং তাঁকে স্বয়ং আল্লাহকে ভয় করার সমতুল্য করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহকে তো ভয় করতেই হবে, সে সাথে নিকট আত্মীয়তা রক্ষা করেও চলতে হবে। রাসূলে আকরাম (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।'[৪৬৬] নিকট আত্মীয়তা যথাযভাবে রক্ষা না করা আল্লাহর সুস্পষ্ট নাফরমানী। তা আল্লাহকে ভয় না করার সমতুল্য অপরাধ।[৪৬৭] এ নিকট আত্মীয়দের মধ্য গণ্য হয় ভাই, বোন, তাদের সন্তান, চাচা, ফুফু ও তাদের সন্তান, মামা ও তাদের সন্তান। লোকদের মধ্যে 'রেহেম' সম্পর্ক মালার সূতার মত। একই সূতা দিয়ে বিভিন্ন ফুল গেঁথে যেমন একটি মালা রচনা করা হয়, তেমনি 'রেহেম' সম্পর্ক বহু সংখ্যক মানুষকে একই সুত্রে গ্রথিত করে, পরস্পরকে পরস্পরের গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে তারা বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয় তারা। এরা একই পরিবারের লোক। প্রত্যেকেই অনুভব করে ও মেনে নেয় যে, অপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে তার উপর। আর এ ধরনের বহু সংখ্যক পরিবারের সংযুক্তিতে গড়ে উঠে উম্মাহ। পরিবারে বিভিন্ন লোক যখন পরস্পর সম্পর্কিত ও সংযুক্ত হয়, পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা ও স্নেহ-বাৎসল্যর সম্পর্ক গভীরতর হয়ে উঠে, পরস্পরের প্রয়োজন, অভাব-অনটন ও সুখ-দুঃখের ব্যাপারে তারা সচেতন ও আন্তরিক হয়ে উঠে, তখন তাদের সমন্বয়ে সঠিক পরিবার সমূহের দৃঢ়তার ফলে গোটা উম্মাহ হয়ে উঠে অত্যন্ত শক্তিশালী। এ উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ও পরিবার কোন অবস্থায়ই নিজেদের অসহায় বোধ করে না। প্রত্যেকেরই কল্যাণ সাধিত হওয়া তখনই সম্ভবপর হয়। ব্যক্তির কল্যাণে পরিবারের কল্যাণ আর পরিবার সমূহের কল্যাণে গোটা উম্মাহর কল্যাণ অবধারিত হয়ে উঠে। এ উম্মাহই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে।[৪৬৮]

আল কুর'আনে সাধারণভাবে মানুষের প্রতি কল্যাণ কামনার নির্দেশ রয়েছে যেখানে, সেখানে এ ব্যক্তিগণের, পরিবারসমূহের ও উম্মাহর বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি কল্যাণ সাধন অবশ্যই হবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব, মানুষ মাত্রেরই উচিত এ দায়িত্ব পালনে পূর্ণ সতর্কতার সহিত ব্রতী হওয়া। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারিকেও তবে কিছুতেই অপব্যয় করো না।"[৪৬৯]

নিকট আত্মীয়ের যে হক রয়েছে তা নিশ্চিত, অবধারিত, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই, তা নিয়ে কোন আপত্তি বা বিতর্কের অবকাশ নেই। অতএব, সে হক যথাযথ আদায় করা উচিত। তা আদায় করতে কোনরূপ টালবাহানা করা উচিত না। পবিত্র কুর'আনে আরো বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

৪৬৫. *আল কুর'আন*, ০৪:০১

৪৬৬. *কোরআনুল কারিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

৪৬৭. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রব, *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৪৬৯. *আল কুর'আন*, ১৭:২৬

"আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৪৭০]

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, নিকট আত্মীয়ের হক দিয়ে দেয়া ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের কাজ এবং তাতেই কল্যাণ নিহিত। তা না দিলে অবিচার হবে, যুল্‌ম হবে এবং হবে নিতান্তই নির্যাতন ও অধিকার হরণের মত কঠিন অন্যায়। নিকট আত্মীয়ের পরস্পরে যে সম্পর্ক তা আল্লাহরই স্থাপিত এবং তা স্বয়ং আল্লাহরই ওয়াদা ও চুক্তি বিশেষ। আল্লাহর সে ওয়াদা ও চুক্তি অবশ্যই সংরক্ষিত হতে হবে। তা সংরক্ষিত না হলে আল্লাহর বিধানকেই লঙ্ঘন করা হবে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

"যারা আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিদানের পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদেরই জন্য আছে অভিশাপ এবং আছে নিকৃষ্ট আবাস।"[৪৭১]

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিকট আত্মীয়দের সম্পর্ক সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছেন এবং তা-ই তাঁর চুক্তি ও ওয়াদা। তা ভঙ্গ করা এবং নিকট আত্মীয়ের হক আদায় না করা কঠিন বিপর্যয়ের নিশ্চিত কারণ। এ বিপর্যয়ের দু'টি পরিণতি ঃ ইহকালে ও পরকালে। ইহকালে হবে লা'নত। লা'নত অর্থ, আল্লাহর রহমত থেকে দুরে সরিয়ে দেয়া, আর আল্লাহর রহমত থেকে সরে পড়ার মত দূর্ভাগ্য আর নেই। আর পরকালে তো জাহান্নাম অনিবার্য হয়ে পড়বে। হযরত রাসূলে কারিম (স.) বলেছেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

'সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।'[৪৭২]

ইয়াতিমের মাল-সম্পদ আত্মসাতের বিরূদ্ধে

আরবি 'ইয়াতিম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয় তখন একে 'দুররে ইয়াতিম' বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে। ইসলামি পরিভাষায় যে বালক বালিকার পিতা মরে যায়, তারাই ইয়াতিম, তারা অপূর্ণবয়স্ক বলেই তাদেরকে ইয়াতিম বলা হয়।[৪৭৩]

ইয়াতিমের মাল-সম্পদ অসহায়ত্ব বা নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে মানুষ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে থাকে। আল কুর'আনে তা করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

"এবং পিতৃহীনকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করবে না, আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না ; এ মহাপাপ।"[৪৭৪]

ইয়াতিমদের ধন সম্পত্তির বুঝ-ব্যবস্থার জন্য সাধারণত চাচা মামা অথবা নিকটআত্মীয় কোন ব্যক্তিকেই দায়িত্ব দেয়া হয়। অন্যথায় তাদের শুধু ধন-সম্পত্তি নয় গোটা সংসারই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম

---

৪৭০. *আল কুর'আন*, ১৬:৯০

৪৭১. *আল কুর'আন*, ১৩:২৫

৪৭২. *সহীহ বুখারী*, বাবু ইসমুল কাতে', প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৫৫২৫; *সহীহ মুসলিম*, বাবু সিলাতুররিহমি ওয়া কাতী'আতিহা, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৪৬৩৬ ও ৪৬৩৭

৪৭৩. *কোরআনুল কারিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৪৭৪. *আল কুর'আন*, ০২:০২

হয়। এটা সামাজিক ক্ষেত্রে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। আর এ সুযোগে বুঝ-ব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সাধারণত দুই-তিন ভাবে ইয়াতিমদের মাল-সম্পদ অপহরণ করার সুযোগ পায়।

১. নানা অজুহাতে তাদের মাল-সম্পত্তি তাদের হাতে ফিরিয়ে না দেয়ার চেষ্টা করা। দিলেও তার অংশ বিশেষ অপহরণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করা হয় না।
২. নিজের খারাপ সম্পত্তি বা মালের পরিবর্তে ওদের ভালো মাল-সম্পত্তি নিয়ে নেয়া এবং খারাপটাকেই ওদের সম্পত্তিরূপে দেয়া।
৩. নিজের খারাপ মাল ওদের ভাল মালের সাথে মিলিয়ে দিয়ে একাকার করে ভালো মালের স্বাদ আস্বাদন করতে চেষ্টা করা।

আল কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতে এ ধরণের সকল প্রকার কারসাজিই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা এও এক প্রকারের বাতিল পন্থায় ধন-সম্পদ ভক্ষণ এবং তা প্রতক্ষ্যভাবে ইয়াতিমদের জন্য এবং পরোক্ষভাবে গোটা সমাজের জন্য অতিশয় ক্ষতিকর। এ সব উপায়ে পারস্পারিক ধন-সম্পদ অপহরণ চলতে থাকলে অসহায় ইয়াতিমদের অসহায়ত্ব যেমন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, তেমনি জাতীয় চরিত্রও বিনষ্ট হয়। জাতীয় চরিত্র বিনষ্ট হলে সামাজিক শান্তি-সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা হয় সূদুর পরাহত। এ কারণে আল কুর'আনুল কারিমে বলা হয়েছে:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

"পিতৃহীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়; তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের ধন-সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৪৭৫] ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ অপহরণ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বিশদ বিধান দিয়েছেন।

প্রথমত:

ইয়াতিমদের ধন-সম্পত্তির ভারপ্রাপ্তকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের নিকট তা যথাযথভাবে প্রত্যার্পণ করার। অবশ্য সে জন্য দু'টি শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি তাদের সাবালকত্ব লাভ। আর দ্বিতীয়, তাদের মধ্যে সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণ যোগ্যতার উন্মেষ হওয়া, তা না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধন-সম্পদের দায়িত্ব তাদের নিকট ফিরিয়ে দিলে তা বিনষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা থেকে যায়। তাই উপরোক্ত শর্ত পূরণ হলেই তা ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ।

দ্বিতীয়ত:

ওরা বড় হয়ে উঠলেই ওদের সম্পদ-সম্পতির দায়িত্ব ওরাই নিয়ে নেবে এ ভয়ে অপ্রয়োজনে বেশী বেশী ব্যয় করে কিংবা খুব তাড়াহুড়ো করে ব্যয় করে ওদের সম্পদ-সম্পত্তি বিনষ্ট করে দিও না।

তৃতীয়ত:

ওদের সম্পদ-সম্পত্তির দেখাশুনা ও বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে তোমাদের যে সময় দিতে ও পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সে জন্য কিছু ভাতা গ্রহণের প্রয়োজন না থাকলে তোমরা নেবে না। আর যদি তোমাদের দারিদ্রবস্থা থাকে ও সে জন্য কিছু গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তা হলে তা নিতে পারবে দু'টি

৪৭৫. *আল কুর'আন*, ০৪:০৬

Dhaka University Institutional Repository

শর্তে। একটি, যতটা নেয়া প্রচলিত নিয়মে ন্যায়সঙ্গত হবে, ততটাই নিতে পারবে, এবং দ্বিতীয়, তা গোপনে ও লোকদের না জানিয়ে নিতে পারবে না। সামাজিকভাবে তা জানিয়ে শুনিয়ে নিতে হবে। কেননা এ ভাতা গ্রহণের নামে ইয়াতিমদের ধন-সম্পদের বিরাট অংশ সাবাড় করে দেয়ার ঘটনা মোটেও বিরল নয়। বস্তুত, ইয়াতিমদের ব্যাপারে এত বিস্তারিত আইন-বিধান ও হিদায়াত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-মানবের প্রতি যে কত বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, ভাষায় বলে শেষ করা যাবে না। এ থেকে অকাট্যভাবে ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পিতার মৃত্যুর কারণে নাবালিগ সন্তানেরা যেন কোনরূপ অসহায় অবস্থায় না পড়ে, তাদের ধন-সম্পত্তি থাকলে তাও যেন কোনভাবে বিনষ্ট হয়ে না যায়, আর তা না থাকলেও যেন তারা অসহায়, অভুক্ত ও আশ্রয়হীন হয়ে মানবিক মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও সে জন্য প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সামাজিকভাবে ঈমানদার লোকের একান্ত কর্তব্য। কেননা ওরা সমাজের অঙ্গ। ওদের অসুবিধায় পড়া সামাজিক বিপর্যয়ের নামান্তর। আর সমাজকে বিপর্যয়ে ফেলার অধিকার কারুরই থাকতে পারে না।[৪৭৬] এরই প্রতিরোধক হিসাবে আল্লাহ তা'আলা এ সাবধান বাণী ঘোষণা করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"[৪৭৭]

প্রতিবেশীর হক আদায় না করার বিরুদ্ধে

রাসূলে আকরাম (স.) বলেছেন: 'কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক মাত্র একটি, কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে তাদের হক দু'টি এবং কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল এমন মুসলিম যাদের সাথে কোন আত্মীয়তা নেই। দুই হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমও বটে। আর তিন হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল তারা, যারা প্রতিবেশী ও মুসলিম এবং সেই সাথে নিকট আত্মীয়ও বটে।'[৪৭৮] মানুষ পরিবার কেন্দ্রিক জীবন যাপন করতে বাধ্য। পরিবারহীন মানবজীবন অকল্পনীয়। বরং তা নিতান্ত পাশবিক জীবনধারা। পশুরা পরিবার নির্ভর নয়। মানুষের পরিবার পরস্পর বিছিন্ন নয়। একটি পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের নৈকট্য ভিত্তিক সম্পর্ক অনিবার্য। এ নিকটবর্তীতার কারণেই পাড়া-প্রতিবেশীর উদ্ভব হয়। কয়েকটি পরিবারের পারস্পারিক নিকটবর্তী জীবনই মানুষের সামাজিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। ঘরের পাশে ঘর বাড়ির পাশে বাড়ি একটি পরিবারের পাশে আর একটি পরিবার অবস্থিতির মাধ্যমেই পাড়া বা মহল্লা গড়ে উঠে। আর এভাবে যারা কাছাকাছি বাস করে তারা পরস্পরে প্রতিবেশী। মানুষের সামাজিক জীবনের অনিবার্যতার ফলশ্রুতিই হচ্ছে প্রতিবেশীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ তত্ত্বটি মানুষকে মানুষ হিসাবে আল্লাহর স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্পন্ন এক সৃষ্টি হওয়া তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু মানুষকে যদি পশুর অধঃস্তন ধারণা করা হয়, তাহলে উক্ত তত্ত্বের কোন স্থান থাকে না, মানুষের জীবনে পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশীরও কোন প্রশ্ন উঠে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে মানুষকে পশুর বংশধর মনে করা হয় বলে তথায় না পরিবার ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব স্বীকৃত, না পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা বিদ্যমান। সেখানে ব্যক্তির ঘরের প্রাচীরের ওপাশে কে বাস করে, তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও হয়ত একটি প্রাচীরের দুই দিকে বসবাসকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন সাক্ষাতও ঘটে না। আস্তে আস্তে উক্ত অবস্থা আমাদের দেশের রাজধানী শহরেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা কোন দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ইসলাম তো মানবিক জীবন বিধান। 'মানুষ' শব্দটির

৪৭৬. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৪৭৭. *আল কুর'আন*, ০৪:১০

৪৭৮. *কোরআনুল কারিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্নিহিত অর্থেই রয়েছে অন্য মানুষের প্রতি আন্তরিকতা পোষণ। ফলে একটি পরিবার পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থানকারী মানুষের মধ্যে যেমন পারস্পারিক সহৃদয়তা, মহানুভবতা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তেমনি এ পাড়া-মহল্লার অধিবাসীদের মধ্যেও অনুরূপ সহৃদয়তা-আন্তরিকতা গড়ে তোলা মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। এ কারণে মানুষের জন্য তাঁর রচিত বিধানে এক আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করার নির্দেশ দানের পরপরই পিতা-মাতা ও নিকটবর্তীদের, পাড়া-প্রবিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। আল কুর'আন ঘোষণা করছে:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"আর তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ আত্মম্বরী ও দাম্ভিককে ভালবাসেন না।"[৪৭৯] উল্লেখিত প্রতিবেশীর তিনটি দিক দিয়ে হক রয়েছে। তা হলো: নিকটাত্মীয়তার হক, প্রতিবেশী হওয়ার হক এবং মুসলিম হওয়ার হক। অন্যান্য প্রতিবেশীর তুলনায় আত্মীয় প্রতিবেশীর হক বেশী। এ জন্য তার কথা সর্বাগ্রে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর হক দু'টি দিক দিয়ে। একটি প্রতিবেশী হওয়ার হক আর অপরটি মুসলিম হওয়ার হক। তৃতীয় পর্যায়ে পার্শ্বসাথী, চাই সে মুসলিম হোক কিবা অমুসলিম। সে হয়ত সফর সঙ্গী, কিংবা ঘরের সংগে ঘর হওয়ার দিক দিয়ে অতি নিকটস্থ ও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। অথবা লেখা-পড়া বা কামাই রোজগারের ক্ষেত্রে সে সঙ্গী, পাশাপাশি থাকা লোক। রাস্তা-ঘাটে চলার পথের পাশাপাশি চলা লোক বা মসজিদে সালাতে পাশাপাশি দাঁড়ানো বা কোন মজলিশে বসা লোক সেও প্রতিবেশী হিসাবে একটি হক রাখে এবং সে হকও অবশ্যই আদায় করতে হবে।

উপরোদ্ধৃত আয়াতে এ সব লোকের হক থাকার কথা ঘোষিত হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রথম কথা, আয়াতের শুরুতে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার ও তাঁর সঙ্গে এক বিন্দু শিরক না করতে বলার পর এ হকের কথা বলা হয়েছে। তার অর্থ, কেবল মাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার ও তাঁর সঙ্গে শিরক না করার নীতি গ্রহণ করলেই বান্দার উপর এ হকসমূহ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী কবুল করা ও তাঁর সঙ্গে একবিন্দু শিরক না করা আল্লাহর হক। আল্লাহ তাঁর নিজের বান্দাদের পারস্পারিক যে হক ধার্য হয় তা-ও বলেছেন। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যেমন নিজের হক বান্দাদের নিকট থেকে যথারীতি ও পুরোপুরি আদায় করতে চান, তেমনি চান বান্দাদের পারস্পারিক হকও যথারীতি আদায় হতে থাক। উক্ত আয়াতে পারস্পারিক সংস্পর্শে আসা লোকদের পরস্পরের উপর যে হক ধার্য হয়, তার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।[৪৮০] এ পর্যায়ে হযরত রাসূলে আকরাম (স.) বিভিন্নভাবে এ পারস্পারিক হকের কথা বলিষ্ঠ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। রাসূলে আকরাম (স.) বলেছেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

'যে লোকই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তারই কর্তব্য প্রতিবেশীর সহিত ভাল ব্যবহার করা ও তার কল্যাণ করা।'[৪৮১]

প্রতিবেশীর প্রতি ভালো আচরণ এবং তার কল্যাণ করার কাজটিকে মৌলিক ঈমানের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে এ হাদিসটিতে। তার অর্থ, ঈমান থাকলে প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই

---

৪৭৯. *আল কুর'আন*, ০৪:৩৬

৪৮০. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

৪৮১. *সহীহ বুখারী*, বাবু মান কানা ইউ'মিন বিলণ্ডাহি ওয়াল ইয়াওমি (আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৫৫৬০

করা হবে। আর যদি ভালো ব্যবহার করা না হয় তাহলে ঈমান যথাযথভাবে আছে, তা মনে করা যাবে না। অনুরূপ আর একটি হাদিস হল:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট বা পীড়া-জ্বালা যন্ত্রনা না দেয়।'[৪৮২] এ দু'টি হাদিস ইতিবাচক ভংগীতে বলা। নেতিবাচক ভঙ্গিতে বলা একটি হাদিস হলো: রাসূলে আকরাম (স.) পরপর তিনবার বললেন:

وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

'আল্লাহর কসম সে ঈমানদার নয়' তিনবার বলা এ কথাটি শুনে সাহাবায়ে কিরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি কার কথা বলছেন?' জওয়াবে তিনি বললেন, 'আমি সে ব্যক্তির কথা বলছি, যার নিপীড়ন ও জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপত্তা পায় না।'[৪৮৩] আল কুর'আনে প্রতিবেশীর হকের উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূলে আকরাম (স.) নিজে বলেছেন:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

'জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে বার বার নিরন্তর অসিয়ত করছিলেন এমনভাবে যে, আমি ধারণা করতে লাগলাম সম্ভবত তাকে উত্তরাধিকারি বানিয়ে দেয়া হবে।'[৪৮৪]

বস্তুত প্রতিবেশীর হকের উপর কত বেশী গুরুত্বারোপ করা হলে তাকে উত্তরাধিকারী বানানো হতে পারে বলে ধারণা হতে পারে, তা অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। উত্তরাধিকারী হয় সাধারণত রক্ত সম্পর্কের ও বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সেরূপ কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তার হককে এতখানি বড় করে দেখার পশ্চাতে নিশ্চয় কোন কারণ নিহিত থাকবে। এ হক আদায় না করলে তা ঈমান না থাকার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং সে কারণে রাসূলে কারিম (স.) বলেছেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

'প্রতিবেশীর হক যে আদায় করবে না সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৪৮৫] প্রতিবেশীদের পারস্পারিক কি কি হক রয়েছে, তার ব্যাখ্যাও রাসূলে কারিম (স.) দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

'প্রতিবেশী তার 'শুফয়া' পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী।'[৪৮৬] 'শুফয়া' হলো জমি বা ক্ষেত। অর্থাৎ কেউ যদি তার জমি বা ক্ষেত বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে তা ক্রয় করার ব্যাপারে তার প্রতিবেশীই তুলনামূলকভাবে বেশী অধিকারী। কেননা সে জমি কোন দুরবর্তী লোক ক্রয় করলে নিকট প্রতিবেশীর পক্ষে অনেক কষ্টের কারণ হতে পারে। অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে: 'প্রতিবেশীর হক হলো, সে যদি রোগাক্রান্ত হয় তা হলে তুমি তার সেবা শুশ্রুষা করবে। সে ইন্তেকাল করলে তার লাশের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে। সে যদি অর্থাভাবে পড়ে, তা হলে তুমি তাকে ঋণ দেবে। সে যদি নগ্নতা-উলঙ্গতায় পড়ে তা হলে তুমি তার লজ্জা আবৃত করবে। তার যদি কোন কল্যাণ হয়, তা হলে তুমি তাকে মুবারকবাদ দিবে। সে যদি কোন বিপদে পতিত হয় তাহলে তুমি তার দুঃখের ভাগ নেবে, সহানুভূতি জানাবে। তোমার ঘরকে তার ঘর থেকে উঁচু বানিয়ে তাকে মুক্ত বায়ু থেকে বঞ্চিত করবে না, তোমার রান্নার পাত্রের বাতাস দিয়েও তাকে কষ্ট দিবে না। যদি তেমন অবস্থা হয়-ই তা হলে তাকে এক চামচ খাবার পাঠিয়ে দিবে।'[৪৮৭] প্রতিবেশীর যে হকসমূহ নবী কারিম (স.)

---

৪৮২. *সহীহ বুখারী*, বাবু মান কানা ইউ'মিন বিলণ্ডাহি ওয়াল ইয়াওমি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৫৫৫৯

৪৮৩. প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৫৫৫৭

৪৮৪. প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৫৫৫৬

৪৮৫. *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাহরীমি ই'জাইল জার, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৬৬

৪৮৬. *সহীহ বুখারী*, বাবু ফিল হিবাতি ওয়াশশুফয়াতি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৬৪৬৩

৪৮৭. *আত-তাবারানী*, হাদিস নং. ২৩৭৩

চিহ্নিত করেছেন, তা শুধু পুরুষদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়, মহিলারাও প্রতিবেশী মহিলাদের সে সব হক আদায় করতে বাধ্য। তিনি মহিলাদের সম্বোধন করে বলেছেন:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

'হে মুসলিম নারী সমাজ! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়িতে সামান্য বস্তু পাঠানোকে তুচ্ছ মনে করো না। এমনকি তা যদি বকরির পায়ের সামান্য অংশও হয়।'[৪৮৮] রাসূল (স.) আরো বলেছেন:

إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

'যখন তুমি তরকারি পাকাবে, তখন তাতে অতিরিক্ত কিছু পানি দিবে, যাতে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খোঁজখবর নিতে পার।'[৪৮৯]

মানুষ তারই মত মানুষকে হীন নগণ্য মনে করবে, ঘৃণা করবে, তা আল্লাহ তা'আলার কিছুমাত্র পছন্দনীয় নয়। সে পুরুষই হোক, কিংবা নারী। বিশেষ করে মানুষের প্রাথমিক সাধারণ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে পেট ভরা খাবার পাওয়া। কোন লোক এ খাবার থেকে বঞ্চিত থাকবে, আর তারই প্রতিবেশী পেট ভরে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাবে আল্লাহ এবং রাসূল তা আদৌ পছন্দ করতে পারেন না। হযরত রাসূলে কারিম (স.) অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه

"যে লোক পেট ভরে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করল অথচ তার প্রতিবেশী না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমানদার নয়।"[৪৯০] অর্থাৎ, একই বসতির পাশাপাশি অবস্থানকারী দু'জন লোকের একজন ক্ষুধায় কাতর হয়ে রাত্রি যাপন করবে আর অপরজন পেট ভরে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করবে, তা ঈমানদার লোকদের কাজ হাতে পারে না। না জানতে পারলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যে জানবে প্রতিবেশীর ঘরে খাবার নেই, আর এ অবস্থায়ও বিশেষ করে রাত্রি বেলা যখন কোনখান হতে খাবার যোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, অপরজন খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, তার অংশ প্রতিবেশীকে দেবে না বা নিজের খাবার তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাবে না, ঈমানদার লোকদের ব্যাপারে একথা চিন্তাই করা যায় না।

অবৈধভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

কুর'আন সমাজের লোকদের পারস্পারিক শোষণ, কারোর ধন-মাল অন্যায়ভাবে লুটেপুটে নেয়া ও বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ কারো হাতে জাতীয় সম্পদের কোন অংশ আটকে পড়ে যাওয়ার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এ পর্যায়ে কুর'আন মাজিদের সাধারণ নির্দেশ হচ্ছে:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা হাকিমগণের নিকট পেশ করো না।"[৪৯১]

প্রথমত, এ আয়াতে যে কোন বাতিল পন্থায় বা অন্যায়, অসংগত কিংবা অবৈধ উপায়ে পরস্পরের ধনমাল অপরহণ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শাসন কর্তৃপক্ষের সাহায্যে অথবা ভুল বিচারে রায়ের ভিত্তিতে অপরের ধনমাল আয়ত্ত ও আত্মসাৎ করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, শাসন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার ভয় দেখিয়ে লোকদেরকে ঘুষ দিতে বাধ্য করে কারোর টাকা-পয়সা অপহরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে, সমাজের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত

---

৪৮৮. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২৩৭৮

৪৮৯. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৪৭৫৮

৪৯০. *আল বাযযার;* প্রাগুক্ত

৪৯১. *আল কুর'আন*, ০২:১৮৮

ব্যক্তিদের নিকট এ আয়াতের বাস্তবতা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। কত মানুষ যে কতভাবে অন্য লোকদের ধন-সম্পদ লুটে-পুটে নিচ্ছে, কত লোককে তাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ঘুষ বাবদ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না। এরই ফলে বহু মানুষ তার ধন-সম্পদ হারিয়ে সচ্ছলতা বঞ্চিত হচ্ছে। প্রথমে অভাবগ্রস্থ এবং পরে কঠিনভাবে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ার পর সর্বহারা হয়ে পৈতৃক ভিটেমাটি ও জমি-জায়গা থেকেও উৎখাত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজে সেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া কল্পনাতীত। সেখানে যে কোন লোকই স্বীয় বৈধ সহায় সম্পদ নিয়ে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। চাই সে মুসলিম হোক কিবা অমুসলিম। কুর'আন মাজিদের অনুরূপ আরও একটি ঘোষণা হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ এবং নিজেরাই নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[৪৯২] সূরা আল বাক্বারার পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যেভাবে পারস্পারিক ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ ও আত্মসাৎ করতে নিষেধ করা হয়েছে, শেষোক্ত আয়াতটির প্রথম কথাও তাই। এ আয়াতটির বলিষ্ঠতা এখানে যে, তাতে লোকদেরকে ঈমানদার বলে সম্মোধন করে কথাটি বলা হয়েছে। তার অর্থ এই যে-

প্রতমত ঃ বাতিল পন্থায় অন্য লোকদের ধন-সম্পত্তি আয়ত্ত করা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কোন ঈমানদার লোকই এ কাজ করতে পারে না। যদি করে তা হলে তার ঈমানদার হওয়ার কোন প্রমাণ বা লক্ষণই থাকবে না এবং তার ঈমানদার হওয়ার দাবিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হবে। কেননা যে ঈমান মানুষকে বাতিল ও অবৈধ পন্থায় ধন-মাল আত্মসাৎ করা থেকে বিরত রাখে না, আল্লাহ তা'আলার নিকট সে ঈমান গ্রহণীয় নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ ব্যবসা ধন-মাল হস্তান্তরিত হওয়ার একটা বড় কার্যকর পন্থা, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে শর্ত হচ্ছে তা পারস্পারিক সম্মতি সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হতে হবে। এক বিন্দু অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও বা জোর প্রয়োগের মাধ্যমে ধন-মালের হস্তান্তর সম্পূর্ণ অবৈধ অর্থাৎ ধন-সম্পদ হস্তান্তর করতে বাধ্য করা যাবে না।

তৃতীয়ত ঃ আত্মহত্যা অথবা একে অপরকে হত্যা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রসঙ্গে এ কথাটির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। কুর'আন মাজিদের ঘোষণানুযায়ী সমাজের সমষ্টিগত ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি সমাজের সকল মানুষের সমান অধিকারের বস্তু। তা থেকে প্রত্যেকেই তাঁর অংশ গ্রহণের অধিকারী। কিন্তু সে অধিকার কার্যকর করতে হবে বৈধ পন্থায়, অবৈধ বা বাতিল পন্থায় নয়। যদি বাতিল পন্থায় অর্থ-সম্পদ, সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ঘটনা ঘটে, তা হলে সার্বিকভাবে তা আত্মহত্যা বা আত্মনিধনের শামিল। যে ব্যক্তির সম্পদ বা সম্পত্তি সেভাবে নিয়ে নেয়া হবে, কার্যত তাকে হত্যা করার মত ব্যাপারই সংঘটিত হবে। কেননা পরিণামে তাকে সর্বহারা হয়ে না খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তো তা চান না। তিনি তো বান্দার প্রতি অতিব দয়াময়। সে জন্যই তো তিনি সকলের জন্য ধন-সম্পদের সৃষ্টি করেছেন, বৈধ উপায়ে তা থেকে স্বীয় অংশ পাওয়ার পন্থাও দেখিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কেন অবৈধ পন্থায় আশ্রয় নেবে? অবৈধ পন্থায় ধন-মাল আত্মসাৎ করতে নিষেধ করেছেন তিনি।[৪৯৩]

এ পর্যায়ে সর্বশেষ কথা হচ্ছে, স্বর্ণ-রৌপ্য, ধন-দৌলত ব্যক্তির সম্পত্তি না, সমাজের সম্পত্তি অর্থাৎ সাধারণ জনগণই হচ্ছে তার প্রকৃত অধিকারী, যদিও তা ব্যক্তির নিকট পড়ে থাকে। কিন্তু ব্যক্তির হাতে থাকা সম্পদ মূলত সমষ্টির অধিকারের সম্পদ, ব্যক্তির হাতে তা থাকে নিতান্তই আমানত স্বরূপ।

---

৪৯২. *আল কুর'আন*, ০৪:২৯

৪৯৩. *অন্যায় ও অসত্যের বির"দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

অতএব তা সমষ্টির মধ্যে সব সময় আবর্তিত হতে থাকবে, এটাই তার প্রবণতা ও প্রকৃতি। আর এভাবেইস্ম্পদ বৃদ্ধি পায়।[৪৯৪]

মুনাফাখুরীর বিরুদ্ধে আল কুর'আন

জাতীয় জরুরী পণ্য দ্রব্য ন্যায্য দামের বেশী মূল্যে বিক্রয় করা এবং মুনাফার পর মুনাফা লুটে সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করা কোন সুস্থ মানুষের কাজ হতে পারে না। এ ধরনের কাজের মূলে প্রথমতঃ থাকে শুধু মুনাফা করার উদ্দেশ্য, কিন্তু পরিণামে তা-ই হয় মারাত্মক ধরনের অর্থলোলূপতা এবং সহজে ও অল্পকালের মধ্যে অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদের মালিক হয়ে বসার উগ্র কামনা। এ কামনা যখন একজন মানুষকে পেয়ে বসে, তখন সে ব্যক্তি হয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে অর্থের দাস। ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারাম নির্বিচারে অর্থ লুণ্ঠনই হয় তার নিত্যকার সদা ব্যস্ততার একমাত্র উদ্বোধক। অর্থই হয় তার পূজ্য, উপাস্য। অর্থোপার্জনই হয় তার জীবনের সকল তৎপরতার চরম লক্ষ্য। কিন্তু এ মানসিকতা কি কোন মানুষের পক্ষে শোভনীয় হতে পারে? এ হলো একটি দিক। এর পরের দিকটি হলো এ যে, এর ফলে সাধারণ জন-জীবনে এক দুঃসহ অচলাবস্থার উদ্ভব হয়। অধিক মুনাফার দুস্প্রবৃত্তি যখন একজন ব্যবসায়ীর মাথায় চড়ে বসে, তখন সে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য বেশী বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করে গুদামজাত করে দেয়। কোন পরিস্থিতিতে কোন পণ্যের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে এবং সে সুযোগে অপরিসীম মুনাফা লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার দিকে থাকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ফলে সমাজে দেখা দেয় এক প্রকার কৃত্রিম দুস্প্রাপ্যতার প্রচন্ডতা, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের জন্যে এ হয় ভরা পৌষ মাস। তখন তারা গোপনে গোপনে পিছন দুয়ার দিয়ে পণ্যের চালান শুরু করে এবং এক টাকার দামের বদলে আদায় করে দশ টাকা।[৪৯৫] এ অবস্থায় বেশী বেশী দামে পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য হয়ে জনগণ হয় সর্বস্বান্ত, এরূপ কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীরা তা লুটেপুটে নিয়ে নিজেদের পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, জনগণের ক্রয় ক্ষমতাকে হরণ করে নিয়ে বন্দী করে রাখে নিজেদের লোহার সিন্দুকে কিংবা বাড়িয়ে দেয় ব্যাংকের হিসাবে জমার অংক।[৪৯৬] এভাবে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে পণ্য দ্রব্যের অবিক্রিত থেকে যাওয়া। এর পরিণামে কেবল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় অর্থনীতিতেও দেখা দেয় চরম বিপর্যয়। তখন সাধারণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে বসে। এরূপ অবস্থা দেখা দেয় যে জাতির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে জাতির ধ্বংস আসন্ন হয়ে উঠে। কুর'আন মানুষের জন্য যে অর্থব্যবস্থা উপস্থিত করেছে, তাতে এসব কারণেই সর্বপ্রকার বাতিল পন্থা ও উপায়ে ক্রয়-বিক্রয়কে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৪৯৭] এ পর্যায়ে কুর'আন মাজিদে একটি মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

৪৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৪৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৪৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৪৯৭. প্রাগুক্ত

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ এবং নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[৪৯৮]

উল্লেখিত আয়াতে সব রকমের বাতিল উপায়ে লেন-দেন করাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। বাতিল পন্থায় ধন-সম্পদের লেন-দেন করতে নিষেধ করা ধোঁকা-প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ ইত্যাদি সবই হারাম ও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সে সঙ্গে কম জিনিস দিয়ে বেশী জিনিসের মূল্য আদায় কিংবা খারাপ জিনিস দিয়ে ভালো জিনিসের দাম গ্রহণ, আর কাজ করিয়ে মজুরী এবং জিনিস নিয়ে তার দাম না দেওয়াও সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। এক কথায় ন্যায়পরায়ণতা, শরীয়াতের আইন ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে লেন-দেন ও অর্থোপার্জনের যে উপায় ও পন্থা সমর্থিত নয়, তা সবই হারাম ও নিষিদ্ধ। শুধু তা-ই নয়, এসব উপায়ে ব্যবসায় ও সম্পদের লেন-দেন হচ্ছে জাতি ধ্বংসকারী কাজ। আয়াতে 'তোমরা নিজেদের হত্যা করো না' বলে এ কথাই বুঝিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

আয়াতে 'আন তারাধীন' 'পারস্পারিক সহজাত সন্তোষ' এ শর্ত উল্লিখিত হওয়ায় যে কোন কারবারের সংশ্লিষ্ট দু'পক্ষেরই স্বাভাবিক সম্মতি ও সন্তোষের বা আইনের অনুমোদনও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয় বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।[৪৯৯]

আয়াত অনুযায়ী লেনদেন হতে হবে পরস্পরের মধ্যে। তাই যে কারবারে একজনই শুধু পেয়ে যায়, অপরজন কিছুই পায় না কিংবা এক পক্ষের নিশ্চিত লাভ আর অপর পক্ষের নিশ্চিত বা অনিশ্চিত ক্ষতি, তা-ও এ নিষিদ্ধ কারবারের মধ্যেই গণ্য। অতএব জরুরী পণ্য মওজুদ করে রেখে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি ও দাম বৃদ্ধি করে চোরা কারবার আর অধিক মুনাফা লুণ্ঠন যে কেবল অর্থনৈতিক মৃত্যু আর ধ্বংসই টেনে আনে শুধু তা-ই নয়, আল কুর'আনের দৃষ্টিতে এ হচ্ছে রীতিমত অপরাধ। হযরত রাসূলে কারিম (স.) বলেছেন:

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ

'যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত্রিকাল খাদ্যপণ্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল এবং আল্লাহও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলেন তার থেকে।'[৫০০] নবী কারিম (স.) আরো বলেছেন:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ 'অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ পণ্য মজুদ করে রাখার কাজ করে না।'[৫০১]

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

'বাজারে পণ্য আমদানি কারক রিযিক প্রাপ্ত হয়। আর পণ্য মজুদকারী হয় অভিশপ্ত।'[৫০২]

মুনাফাখুরীর আর একটি উপায় হচ্ছে পণ্য বিক্রয়ে ওযনে কম দেয়ার বেশী জিনিসের দাম নেওয়া এবং খারাপ জিনিস দিয়ে ভাল জিনিসের মূল্য গ্রহণ করা। এ সম্পর্কে কুর'আন ঘোষণা করেছে:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"মাপ দেয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করবে, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।"[৫০৩] ব্যবসায়ে কোন প্রকারে ধোঁকাবাজি করা, ধোঁকাবাজি করে খরিদ্দারকে ঠকানো এবং ঠকিয়ে

---

৪৯৮. *আল কুর'আন*, ০৪:২৯

৪৯৯. *তাফসীরে মা'আরিফুল ক্বোর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৫০০. *মুসনাদু আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৪৬৪৮

৫০১. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৩০১৩

৫০২. *সুনান ইব্ন মাযাহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২১৪৪

৫০৩. *আল কুর'আন*, ১৭:৩৫

বেশী বেশী মুনাফা লুঠবার কোন অবকাশই নেই ইসলামি সমাজ ও অর্থনীতিতে। রাসূলে কারিম (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রে এ ধরনের ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয়কে কার্যকরভাবে বন্ধ করা হয়েছিল। এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিরোধের জন্য তিনি হাট বাজারে গিয়ে তা হতে দেখলে বা সংবাদ পেলে অনতিবিলম্বে সে ব্যবসা বন্ধ করে দিতেন। হাদিসে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক শস্য ব্যবসায়ীর দোকানে খাদ্যশস্যের স্তূপ এমনভাবে সাজানো ছিল যে, তার উপরিভাগ ছিল শুষ্ক, আর তার নীচের দিকের শস্য ছিল ভেজা। নবী কারিম (স.) এর সামনে ব্যাপারটি ধরা পড়ে যায়। তখন তিনি দোকানিকে লক্ষ্য করে বলেন:

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

'তোমার খাদ্যশস্যের নীচের ভেজা অংশ স্তূপের উপরে রাখলে না কেন? তা হলে ক্রেতারা তা দেখতে পেত এবং বুঝে শুনে ক্রয় করত। জেনে রাখো, যে লোক ধোঁকা দিয়ে ব্যবসা করবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয় এবং সে থাকতে পারবে না আমার এ সমাজে।'[৫০৪]

এ হাদিসের অপর এক বর্ণনা থেকে জানা গেছে যে, অতঃপর রাসূলে কারিম (স.) সে দোকানির দোকানই বাজার থেকে তুলে দিয়েছিলেন। বস্তুত ব্যবসা বাণিজ্য হলো জাতির স্বাচ্ছন্দ জীবন যাত্রার বাহন। মানবদেহে রক্তের আবর্তন যেমন জরুরী, সমাজদেহেও ততোধিক জরুরী অবাধ অর্থ ও পণ্যদ্রব্যের চলাচল এবং পারস্পারিক লেন-দেন ও বিনিময়। এ ব্যাপারে কোনরূপ অচলাবস্থার সৃষ্টিকরা কিংবা সমাজদেহের কোন অঙ্গকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে তার ভাগের অংশকে লুটে-পুটে নেয়া গোটা সমাজের সাথে চরম শত্রুতারই শামিল। চোরাকারবার আর মুনাফাখুরী মানব সমাজের অর্থ সম্পদ এবং জরুরী পণ্যের চলাচল ও সহজ লভ্যতাকে ব্যাহত করে দেয় সম্পূর্ণভাবে। এ জন্যে রাসূলে কারিম (স.) এর নির্দেশ হলো:

بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

'লোকদের জীবনে সহজতা ও স্বাচ্ছন্দ আনয়ন কর, তাদের কোনরূপ সংকট আর অসুবিধায় ফেলো না, তাদের প্রতি সব সময় সুসংবাদ বহন করে নিয়ে আসো, হতাশাব্যঞ্জক কোনো কথাই বলো না তাদের।'[৫০৫] আর স্বয়ং আল্লাহও মানুষের এ সহজ স্বাচ্ছন্দ জীবনই পছন্দ করেন। তিনি চান না কোন মানুষকে অসুবিধায় ফেলতে। এ কথাই কুর'আন মাজিদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান, কঠোরতা ও কষ্টের নয়।"[৫০৬]

উপরোল্লিখিত কুর'আন ও হাদিসের আলোচনার সারনির্যাস হচ্ছে, মুনাফাখুরী আর চোরাকারবার ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে মারাত্মক অপরাধের কাজ। এর ফলে শুধু অর্থনৈতিক জটিলতারই সৃষ্টি হয় না, জাতীয় চরিত্রেরও পতন ঘটে।

জুয়া খেলার বিরুদ্ধে আল কুর'আন

সুদী কারবারের ন্যায় জুয়া খেলাও অর্থনৈতিক শোষণ, দুর্নীতি ও পরিশ্রম ব্যতিত বিপুল টাকার মালিক হওয়া এবং অন্যদের সর্বহারা হয়ে যাওয়ার একটা অতীব মারাত্মক ব্যবস্থা। জুয়া খেলতে গিয়ে কত মানুষ যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে এবং কত মানুষ হঠাৎ করে বিনা পরিশ্রমে বিপুল টাকার মালিক হয়ে পড়ার দরুন চরম বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতার কাজে অর্থ ব্যয় করে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি

---

৫০৪. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ১৪৭

৫০৫. *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফিল আমরি বিত্তাইসীরি, হাদিস নং. ৩২৬২, *সুনানু আবু দাউদ*, বাবু ফি কারাহিয়াতিল মারঈ, হাদিস নং. ৪১৯৫, *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস নং. ১৮৮৬৮, *মুস্‌নাদু আবু ই'য়ালা*, বাবু বাশশিরু অলা তুনাফফিরু, হাদিস নং. ৭১৫৭, আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ, প্রাগুক্ত।

৫০৬. *আল কুর'আন*, ০২:১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। তাই আল কুর'আন এ পন্থাটিকে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

"লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলুন, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ। আর তাতে মানুষের যদিও কিছু উপকার থাকেও কিন্তু তাতে উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক। লোকে আরও আপনাকে প্রশ্ন করবে কি তারা ব্যয় করবে? বলুন, যা উদ্বৃত্ত। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা গবেষণা কর।"[৫০৭]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৫০৮]

দ্বীন গ্রহণে জোর খাটানোর বিরুদ্ধে আল কুর'আন

ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা। তার অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ মত একটা বিশ্বাস গ্রহণের স্বাধীনতা পাবে। যার চিন্তা গবেষণার যোগ্যতা আছে, সে স্বাধীনভাবে তা করতে পারবে। তাকে অপর কারোর চিন্তা গ্রহণ করতে জোরপূর্বক বাধ্য করা হবে না। আল কুর'আন এ দিকেই ইঙ্গিত করেছে নিম্মোক্ত আয়াতখানা দ্বারা:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

'দ্বীন গ্রহণে কোন জোর খাটানো যাবে না। প্রকৃত হেদায়াত ও প্রকৃত গুমরাহী এক্ষণে সুস্পষ্ট, পরিস্ফুট ও প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।'[৫০৯] আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন মানুষকে হিদায়াত করার লক্ষ্যে। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব কতখানি? এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন এভাবে:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ

"সে যা-ই হোক, হে নবী! আপনি উপদেশ দিতে ও নসীহত করতে থাকুন। কেননা আপনি তো একজন উপদেশ দানকারীরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি মাত্র। আপনি কারুর উপর জোর প্রয়োগকারীরূপে নিযুক্ত নন।"[৫১০]

অতএব আল কুর'আন কারোর উপর ইসলামি আকীদা গ্রহণের জন্য জোর চালায় না, শক্তি প্রয়োগ করে না। তা চালাবার অধিকারও কাউকে দেয় না। কাউকে অন্য ধর্মমত থেকে ফিরিয়ে আনবার বা তা গ্রহণে বাধাদানের পক্ষপাতী নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, আল কুর'আন কোন মুসলিমকে ইসলাম ত্যাগ করার ও অন্য ধর্মমত গ্রহণ করার অনুমতি দেয় না। কেননা তা গ্রহণ করা হলে তো দ্বীন ইসলামের চরম অবমাননা হবে, ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এ জন্য ইসলামি রাষ্ট্রে ইসলাম ত্যাগকারী ব্যক্তি 'মুরতাদ' বলে অভিহিত এবং মৃত্যুদন্ডই তার জন্য স্থিরকৃত। কেননা তার এ কাজ দ্বীন ইসলাম, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে চরম শত্রুতামূলক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তা করার সুযোগ কাউকেই দেয়া যেতে পারে না। দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে কারোর মনে প্রশ্ন থাকলে বা সন্দেহ সংশয় জাগলে তার জওয়াব দেয়ার, তাকে শান্ত করার দায়িত্ব ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের। এ জন্য দ্বীন ইসলামের শিক্ষা ব্যাপক করার, নাগরিকদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও ইসলামি

---

৫০৭. *আল কুর'আন*, ০২:২১৯

৫০৮. *আল কুর'আন*, ০৫:৯০

৫০৯. *আল কুর'আন*, ০২:২৫৬

৫১০. *আল কুর'আন*, ৮৮:২১-২২

সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হয়েছে। মানুষকে অশিক্ষিত রাখা, অশিক্ষিত হয়ে থাকতে দেয়া মানবতার অপমান, মানবতার বিরুদ্ধে পরম শত্রুতারূপে বিবেচিত।[৫১১]

তাই ইসলামি রাষ্ট্রে অসুস্থ চিন্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ পরিপন্থী এবং তার সহিত সাংঘর্ষিক চিন্তার কোন অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু সুস্থ চিন্তা, কল্যাণময় গবেষণা পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে চলতে পারে, তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে না, শুধু তাই নয়, সে জন্য বিপুলভাবে উৎসাহ প্রদান করা হবে, তার সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা করা হবে। এমনকি মুশরিকদের আল্লাহর কালাম শুনাবার পন্থাও গ্রহণ করা হবে। যাতে তারা শুনে তার মধ্যে নিহিত যৌক্তিক ভাবধারা অনুধাবন করার সুযোগ পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

"আর মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থী হলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে, আর এটা এ কারণে যে তারা প্রকৃত ব্যাপারে কিছুই জানে না।"[৫১২]

'প্রকৃত ব্যাপারে কিছুই জানে না'–অথবা আল্লাহর কালাম যে কত তাৎপর্য মাহাত্বপূর্ণ তা ওরা জানতেই পারেনি। অতএব কেউ যদি ইসলামী রাষ্ট্রে ওদেরই প্রয়োজনে আশ্রয় চায়, তা হলে তা দেবে। কেননা এ সুযোগে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পাবে। আর তা শুনতে পেয়ে আল্লাহর কালামের মাহাত্ব অনুধাবন করে ইসলাম কবুলও করতে পারে। কেননা মুশরিকদেরও আল্লাহর কালাম শুনিয়ে ইসলাম কবুলের সুযোগ করে দেয়া ইসলামি রাষ্ট্রের একটা অতিবড় দায়িত্ব।[৫১৩]

ইয়াহুদীবাদের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণ যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা মূলত দ্বীন-ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নবী রাসূলগণের মধ্যে কেউ ইয়াহুদী ছিলেন না। ইয়াহুদীবাদ বলতেও তাঁদের সময়ে কোন মতবাদের অস্তিত্ব ছিল না। এ নামের একটা ধর্ম বহু পরবর্তীকালের ফসল। হযরত ইয়াকুব (আ.) এর চতুর্থপুত্র ইয়াহুদার বংশের প্রতি সম্পর্ক দেখিয়ে এ বংশের নাম ইয়াহুদা বা ইয়াহুদী রাখা হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ.) এর পর রাষ্ট্র যখন দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল, তখন এ বংশের লোকেরা 'ইয়াহুদীয়া' নামক রাষ্ট্রের মালিক বা অধিপতি হয়েছিল। আর বনী ইসরাঈলের অপর গোত্রসমূহ নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করে নিয়েছিল। সে রাষ্ট্রটি 'সামেরিয়া' নামে প্রখ্যাত হয়েছিল। উত্তরকালে আসিরিয়রা শুধু সামেরিয়াকেই ধবংস করেনি, এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইসরাঈলী গোত্রের নাম চিহ্ন পর্যন্ত নিঃশেষ করে ফেলল। অতঃপর কেবল মাত্র ইয়াহুদা ও তার সঙ্গে বিন ইয়ামীর-এর বংশই অবশিষ্ট থেকে গেল। এটার উপর ইয়াহুদা বংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি থাকার কারণে তার জন্য শেষকালে ইয়াহুদ শব্দটিই ব্যবহৃত হতে থাকে। এ বংশে পাদ্রী পুরোহিত, রিব্বী ও আহবাররা নিজেদের চিন্তা মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস, রসম রেওয়াজ ও ধর্মীয় নিয়ম প্রণালীর যে খোলস শত শত বৎসরকাল ধরে তৈরী করেছিল তারই নাম 'ইয়াহুদিয়াত' বা ইয়াহুদী ধর্ম। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে এটা গঠন হতে শুরু হয় এবং খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এটা গঠন হতে থাকে।[৫১৪] মূলত আল্লাহর নবী রাসূলগণের নিয়ে আসা আল্লাহর হিদায়াতের খুব অল্প উপকরণই এতে শামিল হয়েছে। তার মূল প্রকৃতিই অনেকখানি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে আল কুর'আনের বহু স্থানে তাদেরকে

---

৫১১. *অন্যায় ও অসত্যের বির"দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৫১২. *আল কুর'আন*, ০৯:০৬

৫১৩. *অন্যায় ও অসত্যের বির"দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৫১৪. প্রাগুক্ত

'আল্লাজীনা হাদু' – 'যারা ইয়াহুদী হয়েছে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত সব লোকই ইসরাঈলী ছিল না। যে সব অ-ইসরাঈলী ইয়াহুদী ধর্মমত গ্রহণ করেছিল, তারাও এতে গণ্য হতে লাগলো। আল কুর'আনে যেখানে বণী-ইসরাঈলীদের সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে 'হে বণী-ইসরাঈল' বলা হয়েছে। আর যেখানে ইয়াহুদী ধর্মের অনুসারীদের সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে 'আল্লাজীনা হাদু' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ 'হে ইয়াহুদীরা বলা হয় নাই, বলা হয়েছে, হে লোকেরা যারা ইয়াহুদী হয়ে গিয়েছ' কিংবা যারা ইয়াহুদীবাদ গ্রহণ করেছ।[৫১৫]

ইয়াহুদী জাতি জাতীয়ভাবেই আল্লাহদ্রোহী। সকল প্রকার অনিষ্ট সাধনে সিদ্ধহস্ত। হিংসা-বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস ঘাতকতা, সুদীপ্রথার প্রচলন এবং মহাজনী পুঁজিবাদ এ জাতীর রক্ত-মাংসে মিশ্রিত। দুনিয়ার যেখানেই কোন গন্ডগোল হয়েছে বুঝতে হবে তার পিছনে অবশ্যই ইয়াহুদীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ্য হাত রয়েছে। অতীতের কথা বাদ দিলেও বর্তমান দুনিয়ায় এ জাতির ধবংসের বিবরণ প্রচুর। আজকের মাযলূম ফিলিস্তিনিদের উপর এদের যে বর্বর হামলা তা পৃথিবীর অতিতের বর্বরতার সকল ইতিহাসকে ভঙ্গ করছে।

ইসরাঈলি সেনা কর্তৃক নিরীহ ফিলিস্তিনির উপর চরম মানবাধিকার লংঘন এবং বর্বর হামলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের একাংশের দৃশ্য।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

যখন কোন একক ব্যক্তি সামরিক বিপ্লব কিংবা অস্ত্রশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোন দেশের কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং তারপরই নিজেকে দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের ধারক ও জনগণের রাজা বা বাদশাহ বলে ঘোষণা দেয়, তখন সে সেই দেশের রাজা বা নিরংকুশ বাদশাহ হয়ে বসেছে বলে প্রতিপন্ন হয়। তখন তার বিরোধীতাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে কঠিন এবং কঠোর শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সে কেবল নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয় না বরং সে সর্বসাধারণকে জানিয়ে দেয় যে, দেশে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকবে এবং তার মৃত্যুর পর তার সন্তানরাই এ রাজক্ষমতার অধিকারী হবে, বংশানুক্রমিকভাবে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তা-ই চলতে থাকবে। এসব রাজা-বাদশাহ ক্ষমতার তুঙ্গে পৌঁছে যায় এবং ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে নিজেকে 'যিল্লুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ছায়া' নামে অভিহিত করতেও সংকোচবোধ করে না। অন্য কথায় সে ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে এককভাবে আসীন হয় ও নিরঙ্কুশভাবে তা কার্যকর করার সুযোগ পায় বলে নিজেকে ঠিক আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত ধারণা করে (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করেছেন:

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

৫১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

"ফিরাউন সকলকে সমবেত করে ঘোষণা করল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক'।"[৫১৬]

রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাসমূহে ইতিহাসের প্রায় সকল অধ্যায়েই এরূপ দেখা গেছে। বস্তুত, রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যক্তি শাসনেরই একটি বিশেষ রূপ। সে ব্যক্তিই হয় তথায় সর্বেসর্বা। রাজা বা বাদশাহ তথায় সার্বভৌমত্বের ধারক, শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র উৎস। রাষ্ট্র ও রাজ্য পরিচালনার নীতি নির্ধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ সে নিজ দায়িত্বে করে থাকে। দেশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সে নিজেই দেয়। অবশ্য এ সব ব্যাপারে তার সন্তানরাও কোন কোন সময় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে থাকে। উত্তরাধিকারসূত্রে তারাই হয় বিরাট রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের বিভিন্ন দিকের কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এক কথায়, এ গোটা শাসন ব্যবস্থাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত এবং স্বৈরতান্ত্রিক।

এরূপ শাসন ব্যবস্থায় বাদশাহ বা রাজা নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হয় বিধায় তা যেমন স্বৈরতান্ত্রিক, তেমনি অহংকারমূলক। স্বৈরতান্ত্রিক হওয়ার দরুন এ ব্যবস্থাধীনে সাধারণ মানুষের কোন মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয় না, থাকেও না। আর অহংকারমূলক হওয়ার কারণে রাজপরিবার সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, রাজপরিবারের ব্যক্তিরাও অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক শরাফাতের অধিকারী বিবেচিত হয়। আর তাদের ছাড়া অন্যান্য মানুষ হীন, নীচ ও পশুবৎ গন্য হয়। আর এর পরিণামে বাহ্যিকভাবে দেশে যতই চাকচিক্য বৃদ্ধি পাক না কেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপর্যয় সমগ্র দেশটিকে গ্রাস করে নেয়। ঠিক, এ কারণে আল কুর'আনে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোকদের অগ্রাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"এ পরলোকের শান্তির ঘর তো সে লোকদের জন্য বানাবো যারা দুনিয়ার সর্বোচ্চতা, সর্বশ্রেষ্ঠতা দখল করার জন্য ইচ্ছুক বা সচেষ্ট নয় এবং যারা পৃথিবীতে কোনরূপ বিপর্যয় সৃষ্টির পক্ষপাতি নয়।"[৫১৭]

পবিত্র কুর'আনের দৃষ্টিতে মুল্‌কিয়াত- রাজতন্ত্র বা বাদশাহী শাসন পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে স্বভাবতই ব্যাপক ও মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তথায় ব্যক্তির ইচ্ছাকে সমগ্র জনগণের উপর শক্তি বলে চাপিয়ে দেয়া হয়। লোকেরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত না হলে তাদেরকে তা মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। ব্যক্তির কামনা-বাসনা-লালসা চরিতার্থ করার জন্য জাতীয় সম্পদকে বেহিসাব ব্যয় ও প্রয়োগ করা হয়। কেননা দেশের সকল নৈসর্গিক সম্পদ ও শক্তির একচ্ছত্র মালিক হয়ে থাকে সে রাজা বা বাদশাহ। এ ব্যাপারে কারোরই কোন আপত্তি জানাবার অধিকার থাকতে পারে না। তার সমালোচন করা, দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ানো বা সেজন্য কোনরূপ কটুক্তি করতে যাওয়াও নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে রাজতান্ত্রিক তথা বাদশাহী শাসন ব্যবস্থায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। আল কুর'আন এ সত্যই ঘোষণা করেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায়। বলা হয়েছে:

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

"স্বৈরতান্ত্রিক ও রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনবসতির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে তখন তারা সে জনবসতিটিকে ধ্বংস করে এবং তার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে বানায় সর্বাধিক লাঞ্ছিত-অপমানিত। তাদের এরূপ কাজ চিরন্তন।"[৫১৮]

আল্লাহর কালামে উদ্ধৃত এ কথাটি মানবজীবনে কার্যকর ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্যশীল। ইতিহাসে এর ব্যক্তিক্রম কখনই দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যাবে না। আজকের পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা এ ঘোষণার পরম সত্যতা ও বাস্তবতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে। বস্তুত, আল কুর'আন বিভিন্ন প্রসঙ্গে রাজা বাদশাহ স্বৈরশাসকদের মানবতা বিরোধী

---

৫১৬. *আল কুর'আন*, ৭৯:২৩-২৪

৫১৭. *আল কুর'আন*, ২৮:৮৩

৫১৮. *আল কুর'আন*, ২৭:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকলাপের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তারা সাধারণ মানুষের উপর নিজেদের শান-শওকত ও শক্তির দাপট চালায়, জনগণের ধন-সম্পদ নির্মম ও নির্লজ্জভাবে লুটে-পুটে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা না কোন নিয়ম নীতি মেনে চলে, না কোন সীমায় গিয়ে থেমে যেতে রাজি হয়। দুর্বল, অক্ষম ও মিসকিন লোকদের সামান্য সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নিতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। নিপীড়িত জনগণের মর্মবিদারী ফরিয়াদ তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না।[৫১৯]

আল কুর'আনে অন্য একটি প্রসঙ্গে একজন স্বৈরাশাসকের চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, একজন দরিদ্র ব্যক্তি নিজের নৌকায় লোক পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করত। এক সময় এ আশংকা প্রবল হয়ে দেখা দিল যে, বাদশাহ স্বৈরশাসক তার সেই নৌকাটি পর্যন্ত কেড়ে নেবে। প্রসঙ্গটি হযরত খিজির ও হযরত মূসা (আ) এর জ্ঞানান্বেষণ মুলক সফর কাহিনীর। হযরত খিজির একটি নৌকায় নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছে সে নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিয়েছিলেন। তার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

أَما السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

'নৌকাটির ব্যাপারে - এ ছিল কতিপয় গরীবের; ওরা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; চাইলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে, কারণ, ওদের সম্মুখে ছিল এক রাজা সে বলপ্রয়োগে ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিত।'[৫২০]

উল্লেখিত আয়াতে যে নৌকাটির কথা বলা হয়েছে, আল কুর'আনের কথানুযায়ী সেটি ছিল কয়েকজন মিসকিন দরিদ্র ব্যক্তির জীবিকার্জনের মাধ্যম বা উপায়। এ নৌকাটিকে চড়িয়ে তারা নদী পথে নিজেদের শ্রম বিনিয়োগ করতে পারছিল। নৌকাটি ব্যতিত তাদের শ্রম বিনিয়োগ করার উপায় ছিল না। সে নৌকাটি কেড়ে নেয়া কোন ন্যায়পরায়ণ আদর্শবাদী প্রশাসকের কাজ হতে পারে না। কিন্তু তথাকার বাদশাহ তাই কেড়ে নিত। অন্য কথায়, দরিদ্র জনগণের জীবিকা নির্বাহের উপার্জন উপায় থেকে বঞ্চিত করে দিয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে মরে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়াই রাজা-বাদশাহ ও স্বৈরশাসকদের নীতি এবং চরিত্র। অর্থাৎ স্বৈরশাসন শুধু রাজনৈতিক শক্তিকে করায়ত্ব করা নয়, অর্থনৈতিক শক্তি ও উপায়গুলিকেও নিজের একক দখলে নিয়ে আসা। রাজতন্ত্র বাদশাহী তথা যে কোন প্রকারের শাসন ঠিক এ কারণেই আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মিসরের ফিরাউনি শাসনের ইতিহাসেও এ অবস্থারই বাস্তব চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ফিরাউন দেশের আপামর জনগণের উপর নিরংকুশ শাসন চাপিয়ে সারাদেশের যাবতীয় ধন-মালের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসার ঘোষণা দিয়েছিল। ফিরাউন উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছিল:

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"ফেরাউন তার কওমকে সম্বোধন করে বলেছিল, 'হে আমার কওম! আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এ নদী গুলি আমার নিয়ন্ত্রণে প্রবাহিত তোমরা কি এ দেখ না ?"[৫২১]

এ নিরংকুশ রাজতন্ত্র, স্বৈরশাসন আল্লাহর দেয়া বিধান পালন করে নয়, কোন বিশেষ স্থির রীতি-নীতিরও অনুসারী নয়, বরং তা এক ব্যক্তির স্বাধীন বিমুক্ত ইচ্ছার অন্ধ অনুসারী। তাই সে ব্যক্তির ইচ্ছা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাই হয় সে শাসনের একমাত্র লক্ষ্য। সারাদেশের যাবতীয় ধন-সম্পদ ও সম্পদ উৎপাদনের উৎস সব কিছুরই নিরংকুশ মালিক হয়ে বসা এবং তার কোন কিছুর উপর জনগণের কোন অধিকার স্বীকার না করাই হচ্ছে তার প্রকৃতি ও স্বভাব। সাধারণ মানুষের দখলে কোথাও কিছু থাকলেও

---

৫১৯. *তাফহীমুল কুর'আন*, সাইয়্যেদ আবুল আলা মাওদূদী, সূরা আন-নামল, টীকা নং. ৩৯ (তাফহীমুল কুর'আন সফ্টওয়্যার, তা. বি.)

৫২০. *আল কুর'আন*, ১৮:৭৯

৫২১. *আল কুর'আন*, ৪৩:৫১

তা কোন না কোন সময়ে কেড়ে নেয়াই তার নীতি। রাজতন্ত্র বাদশাহী ও স্বৈরশাসনের এ-ই যখন স্বভাব, তখন শরীয়াতের বিধানের কথা তো অনেক দূরের, সাধারণ বিবেক বুদ্ধি কি করে তা সমর্থন করতে পারে? কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ এরূপ শাসন ব্যবস্থার হাতে কি করে সপে দেয়া যেতে পারে? এ সব স্বার্থপর অহংকারী শাসন ব্যবস্থা কোনক্রমেই সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। ওরা মানুষের জীবন, ইয্যত-আবরু ও রুটি-রুজী নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে থাকবে আর সাধারণ মানুষ তা চুপচাপ সহ্য করে যাবে, এটাই বা ধারণা করা যেতে পারে কিভাবে?

রাজতন্ত্র, বাদশাহী ও স্বৈরশাসনে ব্যক্তির ইচ্ছা সমষ্টির উপর বিজয়ী ও প্রবল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তা হয়ে দাঁড়ায় কোটি কোটি মানুষের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, সেখানে সকল মানবিক মর্যাদা, মূল্যমান পদদলিত হয় অনিবার্যভাবে। মানুষের নৈতিকতা হয় চরমভাবে বিপর্যস্ত। দূর অতীত-নিকট অতীতের এবং বর্তমান সময়ের সকল রাজা-বাদশাহ স্বৈরশাসনের এ-ই হচ্ছে অভিন্নরূপ। একথা কাল্পনিক নয়, ঐতিহাসিকভাবে সত্য। দূর অতীতের ইতিহাসে যেমন এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু থাকার কথা উল্লিখিত হয়েছে, নিকট অতীতের বরং বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা ইতিহাসেও এ ধরনের শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নয়।[৫২২]

মিসরিয় ইতিহাসের ফিরাউনি শাসন, রোমান ইতিহাসে কাইজারের শাসন এবং পারস্য ইতিহাসের কিসরা শাসন তো এমন ঐতিহাসিক ব্যাপার, যা অস্বীকার করা কোন শিক্ষিত লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এ শাসন ব্যবস্থাসমূহে শাসক নিজ ইচ্ছা ও খাহেশ অনুযায়ী শাসনকার্য চালিয়েছেন। কেননা এ সব কটি শাসনই ছিল নিরংকুশ কর্তৃত্বের শাসন। তরবারির জোরেই এ শাসন ব্যবস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠার দিন থেকে যত কাল-ই তা অক্ষুণ্ন রয়েছে, তরবারিই তার বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাধারণ মানুষ ছিল চরমভাবে অসহায়, মানবিক অধিকার থেকেও নির্মমভাবে বঞ্চিত, দাসানুদাস। রাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের তা ছিল নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। এসব শাসন কিভাবে মানুষের অধিকার হরণ করেছে, কিভাবে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে তাদের জোরপূর্বক বহিস্কৃত করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে, তাদের জমি-ক্ষেত থেকে তাদের উৎখাত করে এমন এক স্থানে নির্বাসিত করেছে, যেখানে ঘাস ও পানির নাম চিহ্নও নেই, যেখানে জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং চরম প্রাণান্তকর অবস্থায় পড়ে থাকতে হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাধ্য করেছে, সে সবের মর্মবিদারী কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখন জ্বলজ্বল করছে। মোটকথা, রাজকীয় শাসন মূলত ও কার্যত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। আর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের নির্মম ও মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপের বিবরণ দেয়া খুব একটা সহজসাধ্য কাজ নয়। স্বৈরশাসনের মারাত্মক বিপর্যয় অবর্ণনীয়।[৫২৩]

ইবলিসি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

ইসালামি জীবন বিধান যখন মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকে না, তখন প্রতিষ্ঠিত থাকে ইবলিসি জীবন বিধান। সে অবস্থায় অধিকতর শক্তিশালী কোন মানুষ অথবা মানবগোষ্ঠী সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রভু সেজে বসে। এসব শক্তিধর ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছা বাসনা বা খেয়ালখুশি মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়। অচিরেই সমাজ যুল্‌ম নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে শুরু করে। এসব মানুষের পক্ষে যেহেতু সত্য ও ন্যায় এর সঠিক মানদন্ড নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই অসত্য সত্যে এবং অন্যায় ন্যায়ে পরিণত হয়ে যায়। পাপ-পুন্যের তারতম্য মনের গভীরে অবস্থান করলেও বাস্তব জীবনে তা আর বড্ড একটা দেখা যায় না। ফলে যিনা, নারী ধর্ষণ, মদ্যপান, নরহত্যা ও সম্পদ হরণের মতো বড় বড় পাপকাজগুলিও সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়।[৫২৪] পরিণতিতে সমাজে বেহায়াপনা ও

---

৫২২. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৫২৩. প্রাগুক্ত

৫২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

উলঙ্গপনা বেড়ে যায়। সংস্কৃতির নামে নাচ ও অশ্লীল গান প্রচলিত হয়। সমাজের শিল্প-সাহিত্য ও গণমাধ্যমগুলি যৌন শুরশুরি দেয়ার হাতিয়ারে পরিণত হয়।[৫২৫] দেশের শিক্ষা হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন। মানুষেরা হয়ে ওঠে চরমভাবে আত্মপূজারী। শোষণের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পেয়ে বসে। এমতাবস্থায় অপরাপর জন্তু-জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য তেমন একটা থাকে না। এ অবস্থারই নাম আইয়ামে জাহিলিয়াহ। মানব সমাজে যখনই আইয়ামে জাহিলিয়াহ জেকে বসেছে তখনই আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি ঈসায়ী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পুঞ্জিভূত জাহিলিয়াত দূর করার জন্য সাইয়্যেদুল মুরসালিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। তিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছর সংগ্রাম করে গোটা আরবের বুক থেকে জাহিলিয়াত অপসারণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটান। মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্রের সুন্দরতম পরিবেশ দুনিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের মানবিক চেতনা নতুনভাবে জাগিয়ে তোলে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনটি মহাদেশের বিশাল এলাকার অধিবাসীগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ইসলামি জীবন বিধান গ্রহণ করে।[৫২৬]

এ অবস্থা দেখে ইবলিস তার চক্রান্ত চালাতে থাকে। মানুষের মনে নানাবিধ সন্দেহ-সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং খটকা সৃষ্টি করে সে ধীরে ধীরে মানুষকে আল কুর'আন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়। মানুষের মনে সে এমন সব ধারণা সৃষ্টি করে যার ফলে মানুষ নাস্তিক্যতাবাদ, সংশয়বাদ, সর্বেশ্বরবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতির গোলকধাঁধাঁয় পড়ে যায়। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতি কেউ দেখায় উদাসীনতা, কেউবা ঘোষণা করে বিদ্রোহ। সমাজ জীবন থেকে ইসলাম দূরে সরে যায়। এরই পরিণতিতে সমাজ আজকের চেহারা লাভ করে। পৃথিবীর সর্বত্র আজ সামগ্রীকভাবে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব চলছে। বিভিন্ন ইজমের ষ্টীম রোলার মানুষকে নিষ্পেষিত করছে। মানুষের কোন মূল্যই যেন আজ নেই।[৫২৭]

আর খুন-খারাবীতো চলছেই ধারাবাহিকভাবে তার আর নতুন করে বিবরণ দেয়ার দরকার আছে বলে মনে করি না। মদের ব্যবসা আজ জম-জমাট। মাতালের অভাব নেই। অবৈধ যৌনাচার সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌনতাই আজকের সাহিত্য ও সাংস্কৃতির প্রধান বিষয়। আজকের সংগীতগুলিতে যৌনতারই প্রাধান্য। গান বাদ্য সব কিছুতেই যৌনতারই উন্মাদনা। শিক্ষাঙ্গনে চলছে নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষার দৌরাত্ম্য। আজকের চিন্তাবিদদের অনেকেই মানুষকে বাদরের সন্তান প্রমাণ করতে ব্যস্ত। 'মাইট ইজ রাইট' জোর যার মুল্লুক তার নীতি চলছে সবখানে। চারদিকে আজ অশান্তি, অস্বস্তি, অসাম্য, অনিয়ম, অনৈতিকতা, ভাঙ্গন আর ধ্বংসযজ্ঞ। আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাখির মত গুলি করে করে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। কোথাও বা বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে শত সহস্র নিষ্পাপ বনি আদমকে। যেখানে আল্লাহ একজন মানবকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা গোটা পৃথিবীর সকল মানুষ হত্যার শামিল বলেছেন সেখানে আজ নিজেদের অন্যায় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য হাজার হাজার নিরপরাধ বনি আদমকে হত্যা করা হচ্ছে। পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে ঘোর জাহিলিয়াহ। এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ বিশ্ব-মানবতাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। তিনি তার সর্বশেষ কিতাব আল কুর'আনকে হিফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তদুপরি শেষ নবীর শিক্ষাকেও অবিকৃতভাবে মওজুদ রেখেছেন।[৫২৮]

নবীর অবর্তমানে আল-কুর'আন এবং নবীর শিক্ষাকে অবলম্বন করে এ নতুন জাহিলিয়াহর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে নবীর অনুসারীদেরকে। জাহিলিয়াহর সয়লাবে ডুবে যাওয়ার পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সাবধান করা এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য যে আল-কুর'আনের সাথে পরিচিত হয়েছে। সংগ্রাম ছাড়া ইবলিসের দুশমনির হাত থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ইবলিসি চিন্তা মন-মানসিকতা এবং ইবলিসী কার্যকলাপ থেকে নিজকে এবং

---

৫২৫. প্রাগুক্ত

৫২৬. প্রাগুক্ত

৫২৭. প্রাগুক্ত

৫২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

সমাজের অপরাপর মানুষকে পবিত্র করার সংগ্রাম চালানোই মুক্তির পথ। আল্লাহ চান প্রত্যেক মু'মিন এ ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করুক। যে মু'মিন আল্লাহর দিকে লোকদেরকে আহবান জানানোর কাজে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। যে কথাগুলি দ্বারা একজন মু'মিন সমাজের মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে সে কথাগুলিকে আল্লাহ আল-কুর'আনের সর্বোত্তম কথা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিলেছেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"সে ব্যক্তির কথা থেকে কার কথা উত্তম যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা করলো নিশ্চয় আমি মুসলিমগণের অন্তর্ভুক্ত।"[৫২৯]

মানব রচিত মতবাদের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো:

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে বস্তুতান্ত্রিক জীবন দর্শনে একটা আদর্শ মনে করা হয়। বস্তুত এটা কোন ইতিবাচক আদর্শ নয় এবং এটাকে আদর্শের অনুপস্থিতি বলা যায়। ইউরোপের নবজাগরণের প্রথম দিকে চার্চ ও পাদ্রীদের অন্যায় যুল্মের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এর জন্ম। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ অসমাঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই মানতে হবে, সামষ্টিক জীবনের হিদায়াত দানে তিনি অসমর্থ- এরূপ ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এ মতবাদের জন্ম। মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের দৃষ্টিতে তা হাস্যস্পদ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এ ধরনের চিন্তা করতে বাধ্য। কেননা তাদের ধর্মগ্রন্থ মানবীয় বিষয়সমূহে হিদায়াত দানে যথেষ্ট নয়। ইসলামি পন্ডিতদের চিন্তাধারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ ব্যাপারে আস্থাশীল যে, কুর'আন ও সুন্নাহ মানব জীবনের সকল দিকের সমস্ত সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ সক্ষম আর এটাই বাস্তব। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা অজ্ঞানতাহেতু মনে করতে পারে যে, ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্ম বা ধর্মের নাম। কিন্তু একজন সচেতন মুসলিমের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব এবং এটাই চূড়ান্ত সত্য ও ঐতিহাসিক বক্তব্য যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্মের নাম নয় বরং ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে ঈমানদারগণ তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৫৩০]

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।"[৫৩১]

সুতরাং তথাকথিত অকৃত্রিম মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জন্য এটাই একমাত্র সম্মানজনক বিকল্প যে, তারা তাদের অমুসলিম ঘোষণা করুক, কেননা 'মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী' হলো একটি হাস্যস্পদ ভ্রান্তি এবং ধোঁকা।[৫৩২]

---

৫২৯. *আল কুর'আন*, ৪১:৩৩

৫৩০. *আল কুর'আন*, ০২:২০৮

৫৩১. *আল কুর'আন*, ০৫:০৩

৫৩২. *অন্যায় ও অসত্যের বির"দ্ধে আল কুর'আন*, পৃ. ৭৫

জাতীয়তাবাদ

ইসলামি রাষ্ট্র তা ছোট হোক আর বড় হোক একটি বিশেষ ভূখন্ডেই প্রতিষ্ঠিত হবে তবুও ভৌগোলিক এককের উপর ভিত্তি করে কোন জাতীয়তার ধারণা সম্পূর্ণ অনৈসলামী-কুর'আন পরিপন্থী। কুর'আন তার আদর্শ ব্যতিত সকল সীমানাকে উঠিয়ে দেয়। কুর'আন অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও অন্য কোন ধাঁধাঁর ভিত্তিতে মানবতার শ্রেণীবিন্যাসে বিশ্বাস করে না। জাতীয়তা হলো একটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যকার ঐক্যের অনুভূতি। মনস্তাত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বলতে গেলে ঐক্যের বাস্তব ভিত্তি হলো চিন্তার ঐক্য ও জীবনোদ্দেশ্যের ঐক্য। কাজেই কুর'আন মানবতাকে কেবলমাত্র দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে- (ক) কুর'আন ভিত্তিক জীবন ধারার প্রতি বিশ্বাসী ও (খ) অবিশ্বাসী জনসমাজ।[৫৩৩]

পুঁজিবাদ

মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রধান অভিশাপ হলো পুঁজিবাদ। এটা ব্যক্তির 'অধিকার তত্ত্বের' উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যক্তিবাদের চরমরূপ, যা রাষ্ট্রের পুলিশী কার্যাবলী ব্যতিত সকল কার্যাবলী ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বন্ধ করে দেয়। একটি পুঁজিবাদী সমাজই সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের প্রসারের জন্য সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র। যারা তথাকথিত 'মুক্ত অর্থনীতির' সমর্থনে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার উদাহরণ পেশ করেন তারা এটা ভুলে যান যে, এ দু'টো দেশই সারা বিশ্বের সম্পদ লুটে নেবার সুযোগ করে নিয়েছিলো। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক শোষকদের জন্যই উপযোগী হতে পারে। এ অর্থব্যবস্থা এমনকি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও যে উপযোগী নয় তা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।[৫৩৪]

সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম

কার্ল মার্কসের মূল থিওরীকে সমাজতন্ত্রই বলা হতো এবং পরে তা কম্যুনিজম বলে পরিচিত লাভ করে। কতিপয় কারণে কম্যুনিজম পরিভাষাটি বদনাম অর্জন করে এবং বর্তমানে আবার সে পুরনো নাম সমাজতন্ত্রই ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য এ দু'এর মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সে পার্থক্য কেবলমাত্র মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে- দর্শন ও নীতির দিক থেকে নয়। পুঁজিবাদের প্রতি যে ঘৃণা তা সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। কেননা আমাদের বুদ্ধিজীবিদের নিকট অন্য কোন মৌল বিকল্প অর্থব্যবস্থা জানা নেই। বর্তমান পর্যায়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থা কেবল তার হারানো ঐতিহ্যকে লালন করে অগ্রযাত্রা শুরু করেছে মাত্র এবং বিশ্ববাসির সামনে নিজের গৌরবোজ্জল আগমণের জানান দিচ্ছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী অর্থব্যবস্থাই চালু রয়েছে বলা চলে।[৫৩৫]

আর রাজনীতির ব্যক্তিতান্ত্রিক দর্শন ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে পুঁজিবাদী ধরনের অর্থনৈতিক গোলামিই সৃষ্টি করে এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শন অর্থনৈতিক মুক্তির অভিনয়ে রাজনৈতিক দাসত্বেরই সৃষ্টি করেছে। সমাজতন্ত্র হলো রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এক নায়কত্ব সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একই সংস্থার হাতে একীভূত করে। কে এ সত্য অস্বীকার করতে পারে যে, ক্ষমতা সর্বদাই দুর্নীতির সৃষ্টি করে এবং সর্বময় ক্ষমতা সার্বিকভাবেই দুর্নীতির সৃষ্টি করে? মৌলিক অধিকারের যুক্তিযুক্ততার নীতি, সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি এবং সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অপব্যবহারকে রোধ করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৩৬]

---

৫৩৩. প্রাগুক্ত

৫৩৪. প্রাগুক্ত

৫৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৫৩৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে ব্যক্তি স্বতন্ত্রের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যাপারে বলা যায় যে, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের কোনই সুযোগ হতে পারে না। এটা অস্বাভাবিক নয়, কেননা এ ব্যবস্থা দেশের সকল নাগরিককে সরকারি কর্মচারীতে পরিণত করে। যেখানে উৎপাদন ও বণ্টনের উপায় উপকরণ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন এবং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেখানে নাগরিকবৃন্দ স্বাভাবিকভাবেই সরকারী চাকরে পরিণত হয়।[৫৩৭]

সর্বাধিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তার সরকারি কর্মচারিদেরকে খোলাখুলিভাবে সরকারি নীতির সমালোচনা করার এবং জনগণকে একটি বিকল্প সরকার গঠনের জন্য সংগঠিত হওয়ার অনুমতি দেয় না। কাজেই সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনে খাপ খায় না। গণতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্র চলতে পারে না এবং অর্থনৈতিক মুক্তি ও পুঁজিবাদ একত্রে থাকতে পারে না। মানুষ কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক জীবই নয়। সে তার স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে না খেয়ে থাকতে পারে। কাজেই সমাজতন্ত্র যদিও তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পুরা করতে পারে কিন্তু সে রাজনৈতিক মুক্তি ব্যতিত সন্তুষ্ট হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।

অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। এটা সুস্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী ধারার কল্যাণ রাষ্ট্র বা উৎপাদন উপায় ও বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক কারণ কোনটাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির যে লক্ষ্যমাত্রা তা অর্জনে সক্ষম হতে পারে না।[৫৩৮]

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক পরিভাষা মাত্র। জনগণের অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠনের পদ্ধতিকেই গনতন্ত্র বলা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে এক কথায় জনগণের শাসন, জনগণের উপর, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য শাসন বলা হয়। এ শাসন ব্যবস্থা জনগণের সমর্থণ (রায়) বা ভোটের উপর নির্ভরশীল।[৫৩৯] জনগণের ভোটেই এ শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং জনগণের মর্জি মাফিক শাসনকার্য চালিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কার্যত মানুষের নিরংকুশ শাসন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় সার্বভৌমত্ব মানুষের করায়ত্ত। মানুষের হাতে ব্যবহৃত। এ সার্বভৌমত্বের বলেই মানুষ মানুষের উপর নিরংকুশ ক্ষমতাও কর্তৃত্বের অধিকারী। পক্ষান্তরে কুর'আনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। সার্বভৌম আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়, তাঁর মুকাবেলায় মানুষের স্থান ও মর্যাদা শুধু সার্বভৌম সত্ত্বার দাসত্ব করা, একান্ত অনুগত দাস হয়ে জীবন যাপন করা।[৫৪০] কুর'আন মাজীদে একথা অত্যন্ত বলিষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে:

قُلْ إِنِي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

"বলুন, 'আমি আমার রবের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, অথচ তোমরা ঐটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, তোমরা যা চাচ্ছ তা আমার নিকট নেই, কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।"[৫৪১]

মোদ্দাকথা, আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি যেসব মূলনীতির উপর তা হলো: ১. ধর্মনিরপেক্ষতা, ২. জাতীয়তাবাদ, ৩. জনগণের সার্বভৌমত্ব। সেক্ষেত্রে ইসলামি ব্যবস্থার ভিত্তি হলো: ১. রাজনৈতিক

---

৫৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৫৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৫৩৯. *বিশ্বসেরাদের নির্বাচিত ভাষণ*, সম্পাদনা, তালহা বিন জসিম (ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২), পৃ. ২০১

৫৪০. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৫৪১. *আল কুর'আন*, ০৬:৫৭

বিষয়সহ জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, ২. মানবতাবাদ, ৩. সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং খিলাফত জনগণের।

গীবতের বিরূদ্ধে আল কুর'আন

মানুষের মান-সম্মান যথাযথভাবে রক্ষা করা ইসলামি শরী'আতের একটি প্রধান লক্ষ্য। আর সে জন্য সমাজের লোকদের পারস্পারিক সম্পর্ক খুবই ভাল, হৃদ্যতাপূর্ণ ও আন্তরিক থাকা একান্তই প্রয়োজন। কাজেই যে সব চরিত্রহীন কাজে পারস্পারিক সম্পর্ক খারাপ হয়, সেগুলো শরীয়াতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ পর্যায়ে পারস্পারিক সম্পর্ক খারাপকারী ও সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও ভাঙ্গন সৃষ্টিকারি সবকটি কাজের কথা আল্লাহ তা'আলা একটি স্থানে বলে দিয়েছেন।[৫৪২] আল কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.

"হে বিশ্বাসীগণ! কোনও পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে ঠাট্টা না করে কেননা, সে ঠাট্টাকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন ঠাট্টা না করে; কেননা, সে ঠাট্টাকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; বিশ্বাস স্থাপন করার পর মন্দ নামে ডাকা অন্যায়। আর যারা নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় তথ্য খুঁজ না ও পশ্চাতে নিন্দা করো না। কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃণা করবে। আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, দয়ালু।"[৫৪৩]

আল কুর'আনের এ নৈতিক আদর্শসমূহের উল্লেখ এক সাথে করে দেয়ায় এর গুরুত্বই অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, মানুষের একবিন্দু অপমান, মানুষের প্রতি অকারণ খারাপ ধারণা পোষণ এবং কারো দোষের ব্যাপক চর্চা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গীবত এ পর্যায়ের দোষসমূহের মধ্যে খুব মারাত্মক, তা আল্লাহর কথার ধরন বুঝলে স্পষ্ট বুঝা যায়। গীবত হচ্ছে এক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দোষ অন্যদের নিকট প্রকাশ করা। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন:

أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغِيبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"হে রাসূল! সে দোষ যদি সে ব্যক্তির মধ্যে আসলেও থাকে তাহলেও কি তা গীবত হবে'? রাসূল (স.) বললেন: 'হ্যা সে দোষ তার মধ্যে থাকলেও তা বলা গীবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না ই থাকে তাহলে তা বলা বুহতান- (মিথ্যা দোষারোপ) হবে।"[৫৪৪]

উল্লেখিত আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত কাজ বলা হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে তা সব মানুষের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। মানুষের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার কারণেই এ গোশত খাওয়া হারাম। কাজেই তার সম্মান ও মর্যাদার হানিকর যে কোন কাজ হারাম হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। উপস্থিত বিবাদমান দু'পক্ষের লোকেরা পরস্পরের দেহের গোশত ছিড়ে নিতে পারে– এটা খারাপ কাজ হলেও এতে এক প্রকারের বীরত্বের লক্ষণ থাকে। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তির গোশত ছিড়ে

---

৫৪২. প্রাগুক্ত

৫৪৩. *আল কুর'আন*, ৪৯:১১-১২

৫৪৪. *আবু দাউদ*, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৪২৩১

নিলে তা খারাপ কাজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুবই কাপুরুষতারও লক্ষণ। কেননা যার গোশত ছিড়ে নেওয়া হচ্ছে, সে তো মৃত- সে তো নিজেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা রাখেনা। অনুরূপভাবে সামনা সামনি কেউ কারো খারাপ বলার মধ্যেও তা যদি অপছন্দনীয় হয় তাতে এক প্রকারের সাহসিকতা ও স্পষ্টবাদিতা দেখা যায়। কিন্তু কারো অনুপস্থিতে তার দোষ বলা হবে সে তো তার প্রতিবাদ করার বা স্বীয় নির্দোষিতা প্রমাণ করার সুযোগ পায় না। ফলে গীবত বহুগুণ খারাপ ও নিকৃষ্ট হয়ে দাড়ায় স্বাভাবিকভাবেই। ভালোবাসার আতিশয্যে 'মৃত ভাই'র লাশ দেখাও অনেকের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে উঠে কিন্তু তাঁর গোশত ছিড়ে খাওয়া কঠিন নির্মমতার বিষয়। তাতে পাশবিক হিংসতা তীব্র হয়ে উঠে। মানুষ যখন নিজের জীবন রক্ষার জন্য হালাল খাদ্য পায় না, নিরূপায় হয়ে মুরদার গোশত খেতে বাধ্য হয়, তখন তার এ কাজের তাৎক্ষনিক অনুমতি আছে বটে, কিন্তু তখনোও মানুষের লাশের পরিবর্তে অন্য কোন মরা যন্তুর গোশত খাওয়াকেই অগ্রাধিকার দিবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই কোন শরয়ী, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ না থাকলে কারোর অনুপস্থিতে তার গীবত করা জায়েয হবে না। অতএব গীবতের ন্যায় একটি কঠিন অপরাধের কাজ কোন মুসলিম ব্যক্তি করবে তা কল্পনাও করা যায় না।[৫৪৫]

এ কাজটি যে একাধারে নিজের উপর আল্লাহর এবং নিজের উপর অপর ভাইয়ের হক চরমভাবে বিনষ্টকারী, তা এ বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রসঙ্গত, একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, গীবত সম্পূর্ণ হারাম হওয়া সত্বেও যালিমের যুল্‌মের বিবরণ সাধারণ্যে প্রচার করার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

"মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ ভালবাসেন না; তবে যার উপর যুল্‌ম করা হয়েছে সে স্বতন্ত্র, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"[৫৪৬] অর্থাৎ যালিমের যুল্‌মের প্রতিবাদ করা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ নয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তা পছন্দ করেন। কেননা কোন শক্তিমান দূর্বলের উপর অত্যাচার চালাবে আর সে তা মুখ বুজে সইবে, আল্লাহ আদৌও তা পছন্দ করতে পারেন না। তাই তার প্রতিবাদ করা ব্যক্তিগতভাবেও যেমন কর্তব্য, তেমনি জাতিগতভাবেও। গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন:

« الغيبة أشد من الزنا » . قيل : وكيف؟ قال : « الرجل يزني ثم يتوب ، فيتوب الله عليه ، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه

"গীবত হল ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক? রাসূল (স.) বললেন কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর যখন তাওবা করে, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি ক্ষমা না করে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না।"[৫৪৭]

আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

নেতা যদি আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য না করে এবং তার বিধান অনুসরণ করে না চলে, তবে তার আনুগত্য করা কিছুতেই জায়েয হবে না। বরং তখন তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করাই ঈমানদার লোকদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনে ঘোষণা করেছেন:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

৫৪৫. *অন্যায় ও অসত্যের বির ্দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৫৪৬. *আল কুর'আন*, ০৪:১৪৮

৫৪৭. *আল মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানি*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৬৭৭৮

"তুমি নিজেকে তাঁদেরই সংসর্গে রাখবে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রবকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে ডাকে এবং তুমি পার্থিক জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগি করে দিয়েছি, যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।"[৫৪৮]

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

সুতরাং 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমাকে মান। আর যালিমদের আদেশ মানিও না; এরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।'[৫৪৯]

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

"আমি পর্যায়ক্রমে আপনার প্রতি কুর'আন নাযিল করেছি। সুতরাং ধৈর্যের সাথে আপনার রবের নির্দেশের প্রতীক্ষা করুন এবং পাপিষ্ঠ কাফিরদের আনুগত্য করবেন না।"[৫৫০]

অলৌকিকত্বের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

পবিত্র আল কুর'আনে আল্লাহ তা'আলার পরে তাঁর রাসূলকেও মানতে ও আনুগত্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষের উপর রাসূলের কোন অলৌকিকত্বের বিভীষিকা চাপিয়ে তাদেরকে ভীত বিহ্বল করা হয়নি। এ জন্য রাসূল (স.) সম্পর্কে স্বয়ং তাঁরই জবানীতে আল্লাহ ঘোষণা করিয়েছেন:

ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

"তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"[৫৫১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়েছেন:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

"বলুন, 'আমি তো প্রথম রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কিরূপ আচরণ করা হবে; আমি আমার প্রতি যা অহী হয় কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'[৫৫২] অর্থাৎ রাসূলকে মানতে হবে, কিন্তু তাকে কোন অলৌকিক শক্তি বা অমানবীয় মর্যাদার অধিকারী হিসাবে মেনে নিয়ে নয়। তিনি একজন মানুষ এবং তাঁর নিকট আল্লাহর ওহী নাযিল হয়, কেবল এ হিসাবেই তাঁকে মানতে হবে। তিনি দুনিয়ায় কোন অভিনব নবী-রাসূলও নন। তাঁর পূর্বেও অনেক নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন। তিনি আল্লাহর রাসূল হয়েও একজন মানুষই রয়ে গেছেন যেমন অন্যান্য কোটি কোটি মানুষ। এ কারণে তার সম্পর্কে কোন অতি মানবীয় পবিত্রতার প্রতীক মনে করাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল কুর'আনের অপর একটি আয়াতে রাসূলের শক্তি ও মর্যাদা কতখানি, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতিত আমার ভাল মন্দ করার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে আমি প্রভূত কল্যাণ পাইতাম এবং কোন অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না। আমি মু'মিনদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।"[৫৫৩] তাই আল কুর'আনে আরো বলা হয়েছে:

---

৫৪৮. *আল কুর'আন*, ১৮:২৮

৫৪৯. *আল কুর'আন*, ২৬:১৫০-১৫২

৫৫০. *আল কুর'আন*, ৭৬:২৩-২৪

৫৫১. *আল কুর'আন*, ৪১:০৬

৫৫২. *আল কুর'আন*, ৪৬:০৯

৫৫৩. *আল কুর'আন*, ০৭:১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

"বলুন, 'সত্য আপনার রবের নিকট থেকে প্রেরিত; তাই যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক বা যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক।' 'আমি যালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি, যার বেষ্টনী ওদের ঘিরে থাকবে। ওরা পানীয় চাইলে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা ওদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; কি ভীষণ সে পানীয় আর কি নিকৃষ্ট সে অগ্নিময় থাকার স্থান।"[৫৫৪]

মোটকথা, আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দ্বীনের প্রতি ঈমান গ্রহণ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার। তা জোর জবরদস্তির ব্যাপার নয় আদৌ। এ কারণে ধর্মান্তরিতকরণ বা ইসলামে দীক্ষিত করণের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ বা যুদ্ধ করার কোন বিধান আল কুর'আনে নেই। মুক্তি বিধানের জন্য শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধ করার উদাত্ত আহবান রয়েছে আল কুর'আনে। এমনকি পারিবারিক পরিবেশেও ব্যক্তির জন্য ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণের এ স্বাধীনতা স্বীকৃত। বনু সালিম ইব্ন আওফের আনসার শাখার এক ব্যক্তির দু'টি পুত্র ছিল। তারা নবী কারীম (স.) এর প্রেরিত হওয়ার পূর্বে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল। পরে ইসলামের যুগে সে পুত্রদ্বয় খ্রিষ্টানদের এক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে মদিনায় আগমন করে। তখন তাদের মুসলিম পিতা তার পুত্রদ্বয়কে পাকড়াও করেন এবং বলেন, আমি তোমাদেরকে ছাড়ব না, তোমাদের অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। পরে পুত্রদ্বয় পিতার এ জবরদস্তির বিরুদ্ধে রাসূলে কারিম (স.) এর নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। পিতা বলেন: 'হে রাসূল আপনিই বলুন, আমার সন্তান হয়ে ওরা জাহান্নামে যাবে?' ঠিক এর পরপরই ধর্মীয় স্বাধীনতা পর্যায়ের উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে তা পারিবারিক জটিলতাও সৃষ্টি করে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সবকিছু সত্ত্বেও মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

'বলুন, 'হে মানুষ! তোমাদের রবের নিকট হতে সত্য এসেছে, তাই যারা সৎপথে আসবে তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্যই আসবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।'[৫৫৫]

আল কুর'আন ঘোষিত এ ধর্মীয় স্বাধীনতা দু'টি মৌলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার একটি চিন্তার স্বাধীনতা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মত গ্রহণ ও প্রকাশের স্বাধীনতা। চিন্তার স্বাধীনতা এজন্য যে, তা আল কুর'আন নির্ধারণ করে দিয়েছে। মানুষের নিকট আল কুর'আনের দাবি হলো স্বাধীনভাবে চিন্তা। বলা হয়েছে, মানুষ বিশ্বের ঘটনাবলীর নিগূঢ় সূক্ষ্ম অধ্যয়ন চালাবে। অভিজ্ঞতা লব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য সামনে রাখবে, আল্লাহর সৃষ্টিলোক সম্পর্কে গভীর গবেষণা চালাবে, সমগ্র বিশ্বলোকের উপর আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্ব এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসন্ধান করবে, জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করবে। মানুষকে বিশ্বভুবণ পরিভ্রমণে যেতে এবং চতুর্দিকের সবকিছু অবলোকনের আহবান জানানো হয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য দলিল প্রমাণ সন্ধান ও যাচাই করতে বলা হয়েছে। এ চিন্তার ফলশ্রুতিতে মানুষ এক আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হতে পারে। আল কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

বলুন, তোমরা দেশভ্রমণ কর, পরে দেখ, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কি হয়েছিল!'[৫৫৬]

মিথ্যার বিরুদ্ধে আল কুর'আন

---

৫৫৪. *আল কুর'আন*, ১৮:২৯

৫৫৫. *আল কুর'আন*, ১০:১০৮

৫৫৬. *আল কুর'আন*, ০৬:১১; ২৭:৬৯; ৩০:৪২

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন যে ঈমানের দাওয়াত দেয় মানুষকে, সে ঈমানের ফল হচ্ছে এক পবিত্রতাময় স্বচ্ছ চরিত্র সৃষ্টি। মানুষের অন্তর আত্মমর্যাদাবোধে হবে উন্নত, অনমনীয়, কোন প্রকার নীচুতা হীনতাকে সে প্রশ্রয় দেবে না জীবনের কোন কাজে, কোন ব্যাপারে, এ হচ্ছে তার প্রতি ঈমানের দাবি। মানুষের মনে এ ঈমান সৃষ্টির মানেই হচ্ছে, মানুষের অম্লান প্রকৃতি তার সঠিকরূপে ও ভাবধারায় স্ফূর্তি ও বিকাশ লাভ করছে। সত্য বলা ও করা এবং মিথ্যা না-বলা ও না করাই হচ্ছে এ প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৫৫৭] এ প্রকৃতির সাথে সত্যের মৌলিক সামঞ্জস্য বিদ্যমান কিন্তু মিথ্যার সাথে নয়। তাই মিথ্যা বলা ও করার এবং মিথ্যা প্রচারণার তীব্র প্রতিবাদ করেছে আল কুর'আন। বস্তুত সত্য ও মিথ্যা মানুষের নৈতিকতা বিচারের ক্ষেত্রে দুটি চিরন্তন শব্দ। এ কেবল শব্দ মাত্র নয়, প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে দু'টো স্বতন্ত্র পথ, দু'টো সুস্পষ্ট আদর্শ নির্দেশক শব্দ। মানুষ যে কথা বলে তা বলে পরের জন্য। অপর ব্যক্তি সে কথা শুনবে এবং তার তাৎপর্য অনুধাবন করবে, কথা বলার এ হলো লক্ষ্য। এ কথার সাহায্যেই একজন মানুষ হয় কথার বাহন। কিন্তু সে শব্দ যদি মূল ব্যাপারের সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা হলে এ কথা বলা ও এ শব্দ উচ্চারণের কোন ফায়দাই হতে পারে না। আর ফায়দাহীন ধ্বনী উচ্চারণ তো মানুষের কাজ নয়। প্রকৃত ব্যাপারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন কোন কথা বলার মানে, যা ঘটেনি তাই ঘটেছে বলে প্রচার করা। এতে করে হয় বাকশক্তির অবাঞ্চনীয় অপচয়। আর এ কাজ শয়তানের পক্ষেই শোভা পায়।[৫৫৮] কাজেই আল কুর'আনে মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা প্রচার চালানোকে কঠিন গুনাহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা অতিশয় অসন্তোষজনক যে, তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা কর না।"[৫৫৯]

মানুষ সম্পর্কে কিছু জানার প্রধানতম উপায় হচ্ছে তার মুখের কথা, তার চরিত্র এবং তার কাজ। কিন্তু তা যদি প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা হলে তা হবে অবাঞ্চনীয় কাজ। মিথ্যা কথা ও মিথ্যা প্রচার করা আল্লাহর নবী ও রাসূলগণের আদর্শ ও চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। মিথ্যাবাদীর দিল আল্লাহর হিদায়াতের রৌশনী থেকে হয় চিরবঞ্চিত। আল কুর'আনের সূরা আয যুমারে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

"একথা নি:সন্দেহ যে, আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞকে কখনো হিদায়াত দান করেন না।"[৫৬০]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, মিথ্যা এবং কুফরী প্রকৃত পক্ষে একই জিনিস, একই মানসিক ও বাস্তব অবস্থা প্রকাশক শব্দ। দু'টো অবস্থাই আল্লাহর হিদায়াতের পরিপন্থী। নবী কারিম (স.) তাঁর নিজের ভাষায় আল্লাহর এ কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

"সত্য ন্যায়ের পথ দেখায়, আর ন্যায় মানুষকে পৌঁছায় জান্নাতে। একজন লোক সত্য কথা বলে ফলে সে হয় পূর্ণ সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ প্রাণ। পক্ষান্তরে মিথ্যা প্রচারণা মানুষকে বানিয়ে দেয় জাহান্নামি। এভাবে একজন লোক মিথ্যা বলে বলে আল্লাহর নিকট চিহ্নিত হয় চরম মিথ্যাবাদী রূপে।"[৫৬১]

মিথ্যা বলার ও মিথ্যা প্রচারণার ক্ষতি অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। স্পষ্ট কুফরি অপেক্ষাও তা ব্যাপকতর ও অধিক মারাত্মক হতে পারে। আল্লাহর রহমতের কোন সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু সে রহমত থেকে চিরবঞ্চিত থেকে যায় সে, যে লোক মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত, মিথ্যা প্রচারণা যার পেশা। ইসলামের

---

৫৫৭. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৫৫৮. প্রাগুক্ত

৫৫৯. *আল কুর'আন*, ৬১:০২-০৩

৫৬০. *আল কুর'আন*, ৩৯:০৩

৫৬১. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৫৬২৯

পরিভাষায় লা'নতের অধিকারী বলা হয়েছে তাকে। যে মিথ্যাবাদী তার উপর লা'নত হওয়ার জন্যে সকলে মিলে দু'আ করার শিক্ষা আল কুর'আনেই দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে:

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

'অত:পর আমরা শপথ করি মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।'[৫৬২]

মিথ্যাবাদী একটা অন্যায়ই করে না, তার মধ্যে ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবীরূপে জেগে ওঠে আরো অসংখ্য দোষ, অসংখ্য রকমের কদর্য তৎপরতা। একথা বোঝাবার জন্যেই কুর'আন হাদিসে মিথ্যার সাথে সাথে আরো অনেক প্রকারের দোষের উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আশ শুরায় বলা হয়েছে, 'আফফাকীন আছিম' বড় মিথ্যাবাদী, সাংঘাতিক গুনাহগার।[৫৬৩] সূরা আয যুমার-এ বলা হয়েছে, 'কাযিবুন কাফফার' মিথ্যাবাদী, বড়ই অকৃতজ্ঞ।[৫৬৪] সূরা মু'মিন-এ বলা হয়েছে, 'মুছরিফুন কাযযাব' নির্ভীক ও সীমা লংঘনকারী, অতিশয় মিথ্যাবাদী।[৫৬৫]

এ ক'খানা আয়াতখন্ড থেকে প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা বলা যার অভ্যাস সে গুনাহের অতলতলে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। ছোট কিংবা বড় কোন গুনাহ করতেই সে এক বিন্দু কুণ্ঠিত হয় না, বোধ করে না সামান্যতম দ্বিধা বা সংকোচ। তার মনস্তত্ব এ হয় যে, অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন, তা করে মিথ্যার সাহায্যেই জনসমাজে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে। তা অতি সহজ বলে সে মনে করে। মিথ্যাবাদী কখনো কারুর উপকারকেও স্বীকৃতি দিতে এক বিন্দু রাজি হয় না। যে নিজে মিথ্যুক সে অপরকেও তাই মনে করতে থাকে স্বাভাবিকভাবেই। মুখে সে কোন কথা মেনে নিলেও পরক্ষণেই সে তা অমান্য করতে শুরু করে দেয়। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি নিরস্ত্র নাগরিকদের আযাদী হরণ করে, তাদের উপর অমানুষিক নিপীড়ন চালিয়েও সে কোন অন্যায় করছে না বলে প্রচার করতে লজ্জা বোধ করে না একটুকুও। আযাদকামী জনতার দাবি অনুযায়ী স্বাধীনতা দানের ওয়াদা করেও নির্লজ্জের মত প্রচার করে 'এরা আমাদের গোলাম হয়ে থাকাকেই শ্রেয় মনে করছে।' নিজে অপরাধ করে অপরের মাথায় চাপিয়ে দেয়া, অন্যের নামে তা প্রচার করাও জঘন্যতম অপরাধ। এ অপরাধের মারাত্মক রূপ বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে, আল কুর'আনে এ মিথ্যাকে উল্লেখ করা হয়েছে শিরক ও বুতপরস্তির সঙ্গে এক সাথে। বলা হয়েছে:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

'অতএব তোমরা পরিহার কর শিরক ও বুতপরস্তির কদর্যতা, আর দূরে সরে থাক মিথ্যা বলা ও প্রচারণা থেকে।'[৫৬৬] এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, শিরক এর সাথে মিথ্যা বলা ও প্রচারণায় নিকটাত্মীয়তা বিদ্যমান থাকায় মুশরিকরা অবশ্যই মিথ্যা বলবে। কেননা তাদের মন ও মগজ মিথ্যার প্রতি অন্ধবিশ্বাসে ভরপুর। কিন্তু তাওহীদবাদীরা কখনো মিথ্যা বলতে, মিথ্যা প্রচারণা করতে পারে না। কুফরি এবং মিথ্যা যে পরস্পরের দোসর, পরস্পরের ফলশ্রুতি, তা রাসূলে কারিম (স.) এর একটি হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা যায়। হাদিসটি এই:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ النَّارِ قَالَ الْكِذْبُ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَجَرَ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَعْنِي النَّارَ

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল! জাহান্নামে যাওয়ার মত কাজ কোনটি? রাসূলে কারীম (স.) বললেন, তা হচ্ছে মিথ্যা। মানুষ যখন মিথ্যা বলে, ফলে সে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করে। আর যখন

---

৫৬২. *আল কুর'আন*, ০৩:৬১

৫৬৩. *আল কুর'আন*, ৪৫:০৭

৫৬৪. *আল কুর'আন*, ৩৯:০৩

৫৬৫. *আল কুর'আন*, ৪০:২৮

৫৬৬. *আল কুর'আন*, ২২:৩০

আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করে, তখন সে কুফরি করে। আর যখন একজন লোক কুফরি করে, তখনি সে জাহান্নাম যাওয়ার যোগ্য হয়।[৫৬৭] রাসূলে আকরাম (স.) আরো বলেন:

إِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

'তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয় মিথ্যা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। আর পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়।'[৫৬৮] বস্তুত মিথ্যা বলা আর মিথ্যা প্রচারণার বিষক্রিয়া কোন ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তা হয় মারাত্মক রকম সংক্রামক। আর তার সংক্রমণে এক একটি সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এ কারণে মিথ্যার সাথে, মিথ্যা প্রচারণার সাথে ইসলামের চিরন্তন বিরোধ।

ভ্রান্ত ও মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

আল কুর'আন সকল মানুষের জন্য আকীদা বিশ্বাস গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছে। আল কুর'আনের সূরা আল বাক্বারায় বলা হয়েছে:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যে 'তাগুৎ' কে অস্বীকার করবে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, জ্ঞানময়।"[৫৬৯] এ প্রেক্ষিতে রাসূলের কাজ হচ্ছে:

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করো না, নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা।"[৫৭০] লোকদেরকে বলা, বোঝানো ও পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা এবং নবীর দাওয়াত গ্রহণ করলে পরকালে জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ-ই হচ্ছে নবী-রাসূলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সাবধান ও সর্তক করা সত্ত্বেও যদি কেউ নবীর প্রদর্শিত পথ গ্রহণ না করে, কুফরের দিকেই দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে থাকে তাহলে সে জন্য নবীর কোন জবাবদিহি নেই। আর তার খারাপ পরিণতির জন্য দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়াও নবীর কর্তব্য নয়। তাই আল কুর'আনের সূরা আল মায়েদায় বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"হে রাসূল! যারা মুখে বলে, বিশ্বাস করেছি, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওরা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি ওরা তাদের জন্য কান পেতে থাকে। শব্দগুলির ব্যাখ্যা বিন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে, 'এ প্রকার বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ কর এবং এ বিকৃত না হলে বর্জন কর।' এরা ঐ সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করতে চান না, তাদের জন্য আছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি।"[৫৭১] লোকদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে খুব

---

৫৬৭. *মুসনাদু আহমদ*, বাবু মুসনাদি আব্দিলণ্ডাহ ইব্ন আমর, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৬৩৫২

৫৬৮. প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৩৪৫৬

৫৬৯. *আল কুর'আন*, ০২:২৫৬

৫৭০. *আল কুর'আন*, ১১:০৪

৫৭১. *আল কুর'আন*, ০৫:৪১

বেশী আগ্রহী হয়ে চেষ্টা সাধনায় নিজেকে খুব বেশী কষ্ট দেয়া , নিজেকে তিল তিল করে ধ্বংস করা নবীর কাজ নয়। নবী তা করলে তাতে আল্লাহ কিছুমাত্র সন্তুষ্ট নন। আল কুর'আনের বাণী:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

"তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবত আপনি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।"[৫৭২] আল্লাহর এ কথাটির তাৎপর্য হলো, ওরা ঈমান না আনলে আপনার দুঃখ ভারাক্রান্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট হওয়ার কোনই কারণ নেই। কেননা ওদেরকে ঈমানদার বানাতেই হবে, এমন কোন দায়িত্ব আপনার মাথার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। আপনার কাজ লোকদেরকে শুধু বলা, বোঝানো- তারা তা শুনলে তাদের জন্য কল্যাণ না শুনলে তাদের জন্যই ধ্বংস। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।"[৫৭৩]

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"আমি তো ঈমানদার লোকদেরকে সাবধানকারী ও সুসংবাদ দাতা মাত্র।"[৫৭৪]

নবী রাসূলগণেরই যদি কোন অলৌকিকত্ব না থাকে তাহলে কি অলী-দরবেশ, পীর, বুযুর্গ, ওঝা-ফকীর বা শাসক-প্রশাসক পর্যায়ের আর কোন ব্যক্তির একবিন্দু আলৌকিকত্ব মেনে নেয়া যেতে পারে এবং তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার নিকট আত্মসমর্পণ করা যেতে পারে? যদি কারোর সম্পর্কে সেরূপ কোন অলৌকিকত্বের বিভীষিকা সৃষ্টি করে মানুষকে ভীত বিহবল ও সম্মোহিত করতে চেষ্টা করা হয়, তা হলে তাতে মৌলিক মানবাধিকারই হরণ করা হবে, তাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। এরূপ অলৌকিকত্বের মোহজাল ছিন্নভিন্ন করে মানুষকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে সর্বতোভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর দাস বানানো, আল্লাহ দাস হয়ে জীবন যাপন করার সুযোগ সৃষ্টি করাই হচ্ছে ঈমানদার লোকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।[৫৭৫] দুনিয়ার সমস্ত মানুষ অভিন্ন বংশজাত। মানুষের মধ্যে কোন প্রকারের ভেদাভেদ থাকতে পারে না। তাই মানুষ হতে পারে না মানুষের প্রভু সার্বভৌম বা আইন রচনাকারী।[৫৭৬]

ভাষা ও বর্ণের পার্থক্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

ভাষা ও বর্ণের দিক দিয়ে দুনিয়ার মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তা বাস্তব সত্য। কিন্তু এ পার্থক্যও নিতান্তই বাহ্যিক, এ পার্থক্য মানুষে মানুষে কোন মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে না। কুর'আনে এ পার্থক্যকে আল্লাহর কুদরত এবং তার অস্তিত্বের বাস্তব নিদর্শন হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমিনের সৃষ্টি আর তোমাদের ভাষাসমূহ ও তোমাদের গোত্র বর্ণের পার্থক্যও। বস্তুত এ ব্যাপারে জ্ঞানবান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"[৫৭৭] আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য হচ্ছে, সমস্ত মানুষের বাক-শক্তি একই রূপ, মুখ ও জিহবার গঠন-প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নেই। মগজের মাত্রা ও গঠনেও নেই কোন পার্থক্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ভাষা এক নয়, বিভিন্ন। একই ভাষাভাষী অঞ্চলের শহর, গ্রাম ও বস্তির বুলিও এক নয়। উপরন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বলার ভঙ্গি উচ্চারণ ও বাকরীতি পরস্পর থেকে ভিন্ন ভিন্ন। তা সত্ত্বেও মানুষের মৌলিক একত্বে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে মানুষের সৃষ্টির

---

৫৭২. *আল কুর'আন*, ১৮:০৬

৫৭৩. *আল কুর'আন*, ৩৬:১৭

৫৭৪. *আল কুর'আন*, ১৮:১৮৮

৫৭৫. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৫৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৫৭৭. *আল কুরআন*, ৩০:২২

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান, সৃষ্টি প্রক্রিয়া এবং তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক হওয়া সত্ত্বেও সব মানুষের বর্ণ এতই বিভিন্ন যে, জাতিতে জাতিতে তো দূরের কথা, একই পিতা-মাতার দুই পুত্রের বর্ণও সব দিক দিয়ে একই রকমের নয়। মূলত একই স্রষ্টার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য বিরাজমান। মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, উদ্ভিদ অন্যান্য জিনিসের যে কোন প্রজাতির মধ্যে মৌলিক ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য দিক দিয়ে বিরোধ ও পার্থক্য রয়েছে। কুর'আন এ রুঢ় বাস্তবতাকে অকপটে স্বীকার করেও বলেছে, এ পার্থক্য যতদিক দিয়েই হোক না কেন, তা মৌলিক নয়, একান্তই বাহ্যিক। তাই মৌলিক অভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে বাহ্যিক বৈচিত্র্যকে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে মর্যাদা ও অধিকারে পার্থক্য সৃষ্টি করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। অতএব ভাষা ও বর্ণ নিয়ে গৌরব করা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে, বিভিন্ন গোত্র বর্ণ ধারকদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদের সৃষ্টি করা, এক ভাষাভাষীদের বিরুদ্ধে অন্য ভাষাভাষীদের, এক বর্ণের লোকদের পক্ষে অন্য বর্ণের লোকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করা, তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা চরম অমানুষিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীন ধর্মমত হোক কিংবা হোক এ কালের মানব রচিত মতাদর্শ, কোনটাই এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ-নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। এদিক দিয়েও বিশ্ব মানবতার প্রতি কুর'আনের অবদান দৃষ্টান্তহীন। ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা এ দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। [৫৭৮]

দুনিয়ার সব মানুষ আদি পিতা এক আদমের সন্তান। সব মানুষের দেহে এক অভিন্ন পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার রক্ত প্রবহমান। অতএব সব মানুষ অভিন্ন বংশজাত। মানুষের মধ্যে বংশ-রক্ত-বর্ণ স্থান ও ভাষার দিক দিয়ে যত পার্থক্য থাক না কেন তার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে মৌলিক অভিন্নতাই মানুষের সব বৈষম্যের ও ভেদাভেদের প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। মানুষের পরস্পরে যেমন নীচ ও অভিজাতের কোন পার্থক্য থাকতে পারে না, তেমনি থাকতে পারে না ধনী-গরীব বা মালিক-শ্রমিকের মধ্যে মান-মর্যাদা বা কৌলিণ্যের দিক দিয়ে এক বিন্দু ভেদাভেদ। চলতে পারে না কোনরূপ শ্রেণীগত পার্থক্য বা শ্রেণীসংগ্রাম। আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানব! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। ও তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন। আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা পরস্পর অধিকার দাবি কর, জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৫৭৯]

আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আল কুর'আন

কুর'আন বিশ্ব শান্তির সংবিধান। বিশ্বে শান্তি স্থাপনই আল কুর'আনের লক্ষ্য। কিন্তু কুর'আনের শান্তির বাণী কোন অমূলক, অবাস্তব বা হাওয়াই কথা নয়, নয় কোন বৈরাগ্যবাদী দার্শনিক মতবাদ। বাস্তবভাবে মানুষের জীবনে শান্তির সুশীতল পরিবেশ সৃষ্টির কার্যকর পন্থাই গ্রহণ করেছে আল কুর'আন এবং দুনিয়ার মানুষকে আহবান জানিয়েছে সে পন্থা গ্রহণ করে সর্বত্র, ঘরে ও পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে, আইনে ও শাসনে, বিচার-মীমাংসা ও দেশ রক্ষার সর্ব ব্যাপারে শান্তি স্থাপন করতে।

আল কুর'আন প্রদর্শিত ইসলামে আক্রমণকারীর কোন সমর্থন নেই। যথাসম্ভব আক্রমণ এড়িয়ে চলাই ইসলামের আদর্শ। এ জন্যে ইসলামি জনতা এবং রাষ্ট্রও আক্রমণ বিরোধী নীতিতেই আস্থাবান। কিন্তু যখন ইসলামি রাষ্ট্র ও জনগণের উপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়, শত্রু যখন আগেভাগেই আক্রমণ করে, তাদের উপর রীতিমত ও প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিংবা অতর্কিতে, বিনা ঘোষণায় রাতে

---

৫৭৮. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪

৫৭৯. *আল কুর'আন*, ০৪:০১

Dhaka University Institutional Repository

হঠাৎ চড়াও হয়ে আসে ডাকাতের মত, তখন সে যুদ্ধকে জিহাদ হিসাবে গ্রহণ করতেই হবে এবং সে চাপানো যুদ্ধকে প্রতিহত করতে হবে প্রবল শক্তিতে। প্রতি আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর আক্রমণাত্মক ভূমিকা ও প্রকৃতিকে করতে হবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত।[৫৮০]গড়ে তুলতে হবে সর্বাত্মক প্রতিরোধ। এ সম্পর্কে কুর'আনের নির্দেশ হলো:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।"[৫৮১]

সাধারণত শত্রু পক্ষই প্রথমে আক্রমণ চালায় ইসলামি রাষ্ট্র ও জনতার উপর। কাজেই এ আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা, আক্রমণকারীর কূটিল বিষাক্ত থাবা থেকে দেশ ও অগণিত নিরপরাধ জনগণকে রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আক্রমণকারী যখন সকল ন্যায়নীতি ও চিরন্তনী ঐতিহ্যের উপর পদাঘাত করে শান্তি প্রিয় জনতার উপর অকারণ হামলা চালাতে পারে, তখন ইসলামি রাষ্ট্র ও জনতা নিষ্ক্রিয় নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে না কিছুতেই এটা কা-পুরুষতা। বরং প্রবল বিক্রমে তাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুর উপর, শত্রুর বিপুল সৈন্যবাহিনী আর বিরাট স্তুপীকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামের উপর। এবং এসব কিছুই ধ্বংস করে দিতে হবে প্রচন্ড আক্রমণে, প্রতি আক্রমণে কেননা শত্রুই প্রথম আক্রমণকারী। আর আক্রমণকারীর মোকাবিলায় ইস্পাত কঠিন হয়ে যুদ্ধ শুরু না করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। এরূপ অবস্থায় প্রতি-আক্রমণ না করাকে আল কুর'আনে সুস্পষ্ট ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয়েছে।[৫৮২] প্রশ্ন তোলা হয়েছে:

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা কি সে দলের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলের বহিস্করণের জন্য সংকল্প করেছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের সঠিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ। যদি তোমরা মু'মিন হও।"[৫৮৩]

অন্য কথায়, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্রতি- আক্রমণ চালানো হলো ইসলামের নীতি ও নির্দেশ। এ প্রতি-আক্রমণ না করার কারণ হতে পারে শত্রুকে ভয় করা। অথচ ঈমানদার লোকেরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করতে পারে না। বস্তুত আক্রমণকারী যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, সে জন্যে কিছুমাত্র পরোয়া করা চলবে না। আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতেই হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহর আরো স্পষ্ট নির্দেশ হলো:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

"যুদ্ধ কর ওদের সাথে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দিবেন, ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।"[৫৮৪]

মুসলিম জনতা ও ইসলামি রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালানো এমন একটা অপরাধ, যার দরুন আক্রমণকারীর উপর নেমে আসে আল্লাহর রোষ ও অসন্তোষ। আল্লাহ তাদের অপরাধের শাস্তিদান অবশ্যই করবেন এবং করবেন তাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত। কিন্তু আল্লাহর নীতি হলো তার এ কাজ তিনি সম্পাদন করাবেন ইসলামি জনতার হাতে। অতএব আক্রমণকারীর মোকাবিলায় আক্রান্ত মু'মিনদের কর্তব্য হচ্ছে প্রতি-আক্রমণের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কার্যত আক্রমণ চালানো।

---

৫৮০. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৫৮১. *আল কুর'আন*, ০২:১৯০

৫৮২. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৫৮৩. *আল কুর'আন*, ০৯:১৩

৫৮৪. *আল কুর'আন*, ০৯:১৪

Dhaka University Institutional Repository

অন্যথায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাতিল হতে পারবে না। এ জন্যেই আক্রমণকারীর উপর প্রতি-আক্রমণ চালাবার নির্দেশ রয়েছে আল্লাহর। আর এ আক্রমণ যেহেতু আল্লাহর নির্দেশক্রমেই হবে, সে জন্যে মুসলিমগণ পাবে আল্লাহর অসীম সাহায্য। আর আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে যারা, তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। তাদের পরাজিত করা কারোর পক্ষেই সম্ভব হবে না। আক্রমণকারীর উপর প্রতি-আক্রমণ চালাবার জন্যে আল্লাহ এ নির্দেশ দিলেন কেন? এর জবাব পাওয়া যায় পবিত্র আল কুর'আনে। বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

"আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক কোন অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না।"[৫৮৫] এ আয়াতসমূহে বলা স্পষ্ট কথাসমুহের অনিবার্য দাবি হচ্ছে মানুষকে এ পৃথিবীতে এক সক্রিয় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কোন নির্বোধ অবিবেচক সত্তা হিসাবে কতগুলি অর্থহীন নিশ্চিত অনিবার্যতার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থাকা তার জন্য কিছুমাত্র বাঞ্চনীয় নয়। মানুষ এ সবের নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে, তা মানুষ সম্পর্কে অকল্পনীয়। বস্তুত পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশাবলী মানুষের কাজ ও তৎপরতার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ মানুষের কাজকেই উপায় ও মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সূরা আর রা'আদ এ বলা হয়েছে:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

"মানুষের রক্ষাবেক্ষণের জন্য আল্লাহর আদেশে তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে। আল্লাহ অবশ্যই কোন কওমের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন কওমের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তা রদ করার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতিত ওদের কোন অভিভাবক নেই।"[৫৮৬]

অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। দুনিয়ার মানুষ যাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে, নিজেদের সুমহান মানবীয় মর্যাদা রক্ষা করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্যে একান্ত প্রয়োজন ছিল সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক এক জীবন আদর্শের। মানুষের সৃষ্টিকর্তা লালন পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা তাই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে নাযিল করলেন জীবনবিধান ও কর্মসূচী। আল্লাহর বিধান পূর্ণতা লাভ করেছে সর্বশেষ নবী এবং রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স.)-র মাধ্যমে। তাই দ্বীন ইসলাম যেমন পূর্ণাঙ্গ, তেমনি পূর্ণ পরিণতও হয়েছে। আল্লাহর বিধান সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ। চিরকাল মানুষকে সর্বদা ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে তার লক্ষ্য। তাই অন্যায় ও অসত্যের সাথে তার চির দুশমনী চির শত্রুতা। কুর'আন পেশ করেছে ন্যায় ও সত্যের বিধান, বিশ্ব মানবতাকে দেখিয়েছে ন্যায় ও সত্যের আলোকমন্ডিত এক রাজপথ। তেমনি অসত্যের বিরুদ্ধে চালিয়েছে ক্ষমাহীন সংগ্রাম। অসত্যকে নির্মূল করে কিংবা তার উদ্যত মাথাকে গুড়িয়ে দিয়ে প্রকৃত সত্যকে মানুষের সামনে চির উদ্ভাসিত করে সমগ্র দুনিয়ার বুকে ন্যায় ও সত্যের পতাকাকে চির উন্নত করে ধরাই হচ্ছে আল কুর'আনের চিরন্তন সাধনা। আল্লাহর বিধানের বাহক ও প্রচারক নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

---

৫৮৫. *আল কুর'আন*, ২২:৩৮

৫৮৬. *আল কুর'আন*, ১৩:১১

Dhaka University Institutional Repository

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদর সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে তারা মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এ এজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[৫৮৭]

পবিত্র কুর'আন আল্লাহর বিধান, প্রকৃত সত্য ও অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে নেই কোন অলীক, আজগুবী কথা বা কোন কুসংস্কারের স্থান। আল্লাহর নাযিল করা কিতাব সত্য ও ন্যায় বিধানের মূলনীতি এবং জরুরী আইনের ধারায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা কেবল একখানি কিতাব নাযিল করেই ক্ষান্ত হননি। সে সাথে তিনি দিয়েছেন আল-মিযান। যার সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় সকল মানুষের সুস্থ ও সহজবুদ্ধি এবং যা সত্যিকারভাবেই মিথ্যা ও অন্যায় নীতি এবং ভুল মতবাদের সম্পূর্ণভাবে পরিপন্থী। আর এ সব নাযিল করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণ ইনসাফ অনুযায়ী যেন মানুষ এ দুনিয়ায় পূর্ণ মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকতে পারে, তাদের স্পর্শ করতে না পারে কোন অন্যায় ও অসত্য। এ উদ্দেশ্যে যে পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে এবং নবী রাসূলগণ যে সত্য ও ন্যায়ের বিধান নিয়ে এসেছেন তাকে চিরসত্য বলে মেনে নিতে হবে। তারা যে কাজের আদেশ এবং নিষেধ করেছেন, সে সে কাজ তাকে অবশ্য সত্য বলে বিশ্বাস করে, অবশ্য পালনীয় মনে করে, যথাযথ কার্যকর করে তুলতে হবে। কেননা নবীগণ যে আদর্শ প্রচার করেছেন, তা-ই হচ্ছে একমাত্র সত্য এবং তার বিপরীত দিকে থাকতে পারে না সত্যের কোন অস্তিত্ব। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'তোমার আল্লাহর বাণী ও বিধান সত্যতা এবং ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে পূর্ণত্ব লাভ করেছে। আর তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী।'[৫৮৮]

আর এ সত্যতার পূর্ণ বিধান নিয়েই এসেছেন নবী ও রাসূলগণ। তাই তারা পেশ করেছেন দুনিয়ার মানুষের কাছে। আল্লাহর নবী-রাসূলগণ হচ্ছেন সত্যের বাহক। তাদের প্রচারিত আদর্শ বিশ্ব মানবের জীবনে প্রবাহিত করেছে ন্যায় ও সত্যের স্রোত। এ আদর্শের বিপরীত যে সব মত ও পথ মানুষকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে, তা অসত্যেরই প্রতীক। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স.) এ সত্য-আদর্শের সর্বশেষ বাহক ও প্রচারক। আল কুর'আনের কয়েক জায়গায় একথা বলা হয়েছে। সে মহান আল্লাহই তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন জীবন যাপনের পূর্ণাঙ্গ বিধান এবং সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ সহকারে। উদ্দেশ্যে হচ্ছে সত্যের এ বিধানকে তিনি দুনিয়ার অন্যান্য সব বিধান ও ব্যবস্থার উপর সর্বাত্মকভাবে জয়ী করে তুলবেন, যদিও মুশরিকরা দ্বীন ইসলামের এ বিজয়কে পছন্দ করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ সকল ধর্মের উপর একে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"[৫৮৯]

সর্বপ্রকার অসত্যের পরাজয় সাধন এবং তদস্থলে ন্যায় ও সত্যকে বিজয়ী ও কার্যত প্রতিষ্ঠিত করার জীবনব্যাপী সাধনাই ছিল শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-র জিন্দেগীর মূল উদ্দেশ্য। রাসূলে কারিম (স.) তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একদিকে যেমন অভিযান চালিয়েছেন অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, তেমনি ইতিবাচকভাবে সংগ্রাম করেছেন ন্যায় ও সত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। শেষ নবীর এ সাধনা দু'ধারী তলোয়ারের সঙ্গেই তুলনীয়। তাই কুর'আন যেমন অন্যায় ও অসত্যের বিরোধী, তেমনি ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাকারী। ফলে তার তীব্র আঘাত পড়েছে আবহমান

---

৫৮৭. *আল কুর'আন*, ৫৭:২৫

৫৮৮. *আল কুর'আন*, ০৬:১১৫

৫৮৯. *আল কুর'আন*, ৬১:০৯

কাল থেকে চলে আসা পুঞ্জিভূত সব মিথ্যে ও অসত্য ধারণা, সব অমূলক আকীদা-বিশ্বাস, আর সব রকমের কুসংস্কারের উপর। কায়েমি স্বার্থবাদীরা এ কারণেই কুর'আনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, সৃষ্টি করে পবর্ত সমান বাধা ও প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু আল্লাহর বিধানের গতিরোধ করা সম্ভব হয়নি কোনদিন কারো পক্ষেই। আল কুর'আনুল কারিমের অসত্য-অন্যায় বিরোধী এ ভূমিকা একান্তই গঠনমূলক, নিয়মতান্ত্রিক। সুষ্ঠূ নিয়মেই চলে তার সংশোধনী প্রচেষ্টা। নতুন কিছু গড়তে হলে প্রথমে প্রাচীনকে ভাঙ্গতে হবে। আর এ ভাঙ্গা ও গড়ার নীতিবাক্য প্রচার করাই যথেষ্ট হতে পারে না কখনও। তা থেকে পাওয়া যেতে পারে না কোন স্থায়ী ফল এবং গতিবান কালের প্রতিটি স্তরের জন্যে নির্ভরযোগ্য কোন কার্যকারিতা। এ কারণে শুরু থেকেই ইসলামের লক্ষ্য ছিল অন্যায় ও অসত্যের বিরোধী এবং ন্যায় ও সত্যের ধারক-বাহক এক নবতর জাতি সৃষ্টির দিকে। শেষ নবীর আদর্শ নেতৃত্বেই এ জাতি গড়ে উঠেছিল।[৫৯০] এ জাতির লোকদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানব জাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজ করা থেকে নিষেধ কর, আর আল্লাহতে বিশ্বাস কর।"[৫৯১] এ ছাড়া অপর কিছু আয়াতে মুসলিম সমাজ সমষ্টিকে যেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, তা থেকে নিঃসন্দেহে মনে হয় এ দায়িত্ব মুসলিমগণের মধ্য থেকেই একটি বিশেষ জনসমষ্ঠির উপর অর্পণ করা হয়েছে। যাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে, যাঁরা কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে; এ সকল লোক হবে সফলকাম।"[৫৯২]

অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির বিরুদ্ধে আল কুর'আন

Man can not live alone so he want's company. মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সংঘবদ্ধতাই মানুষের সহজাত প্রকৃতি। এ প্রকৃতির তাকিদেই মানুষ একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজবদ্ধ জীবন গঠন করে। এর মাধ্যমেই সে লাভ করে নৈতিক ও বৈষয়িক সুখ-শান্তি ও অগ্রগতি। পক্ষান্তরে ঐক্য বিনষ্ট হলেই সমাজে দেখা দেয় অশান্তি ও বিশৃংখলা, জীবনে নেমে আসে দুর্যোগের ঘোর অমানিশা। জাতি হিসাবে মুসলিমগণের বেলায় কথাটি আরো নির্মমভাবে প্রযোজ্য। দুনিয়ায় ইসলামের আগমন ঘটেছে ঐক্যের পয়গাম নিয়ে। কার্যত প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধি একান্তভাবে নির্ভর করে মানব সমাজের ঐক্যবদ্ধতা ও অভেদনীতির কার্যকারিতার উপর।

যে সমাজের লোক ঐক্যবদ্ধ ও পারস্পারিক ভেদ-বৈষম্যহীন, সে সমাজ যেমন হয় শান্তির আকর, তেমনি হয় ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নতি আর স্বাচ্ছন্দের বাহন। পক্ষান্তরে সমাজের লোক যদি হয় পরস্পর হিংসুক, বিদ্বেষী, পরশ্রীকাতর এবং অধিকার দান ও জীবিকার বণ্টনে যদি সেখানে দেখা দেয় বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব ও বিভেদ, তা হলে তা যেমন মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় ব্যক্তির জীবনে তেমনি সমাজ ও সমষ্টির পক্ষেও তা নিয়ে আসে সাংঘাতিক পরিণাম। আল কুর'আনের আলোকে ঐক্যবদ্ধতা ও ভেদ বৈষম্যহীনতার প্রয়োজন অপরিসীম। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজকে একান্ত ও অভেদনীতি বজায় রাখার জন্যে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। কুর'আনের ঘোষণা হল:

---

৫৯০. *অন্যায় ও অসত্যের বির"দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৫৯১. *আল কুর'আন*, ০৩:১১০

৫৯২. *আল কুর'আন*, ০৩:১০৪

Dhaka University Institutional Repository

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"তোমরা আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরাতো পরস্পর শত্রু ছিলে তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, তিনি তা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ পাও।"[৫৯৩]

কুরআন আগমন পূর্ববর্তী অবস্থা হচ্ছে আরববাসীদের পারস্পরিক কঠিন ও মারাত্মক শত্রুতায় নিমজ্জিত হওয়া। তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তাদের মাঝে ঐক্যের কোন ভিত্তিই বর্তমান ছিল না। কুর'আন নাযিল হওয়া এবং শেষ নবীর আগমনে সে ভিত্তি তাদের সামনে উপস্থিত হয় এবং তারা তাকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেই ঐক্যবদ্ধ হয়, ভুলে যায় বংশানুক্রমে চলে আসা চিরন্তনের দুশমনী। আল্লাহ তাদের পরস্পরের অন্তরকে সৌহার্দ্য ও বন্ধুতাসূত্রে গেঁথে দেন এবং তারা পরস্পরের ভাই হয়ে যায়। তাদের ঐক্যের মূল ভাবধারা ছিল মনের ও অন্তরের মিল। এমন মিল ছিল, যা হয় সহোদর ভাইদের মাঝে স্বাভাবিকভাবে। মন এবং অন্তরের মিলন হয় চিন্তা-বিশ্বাস ও আদর্শের ঐক্যের কারণে। এ ঐক্য অনুপস্থিত হলে চারদিক দিয়ে দেখা দেয় হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদ ও বৈষম্য এবং সর্বাত্মক ভাঙ্গন ও বিপর্যয়। আর কুর'আন মানুষের এ মিলন ও ঐক্যের জীবনদায়ক পয়গাম নিয়েই এসেছে। ভেদ ও বৈষম্য, মানুষে মানুষে অনৈক্য পার্থক্যের সর্বপ্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে সব মানুষকে একতার বন্ধনে বেঁধে দেয়া এবং কার্যত এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ ও জাতি গড়ে তোলাই হচ্ছে আল কুর'আনের অন্যতম লক্ষ্য। যেখানে ভেদ ও বৈষম্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, আল কুর'আনের ঐক্যের বাণী সেখানে উপস্থিত হয় কল্যাণের বাহক হয়ে। ভেদ ও বৈষম্যের পাহাড় চূর্ণ করেই অগ্রসর হয় মানব ঐক্যের অভিযান। কুর'আনের ভাষায় ভেদ-বৈষম্য আর পারস্পারিক অনৈক্যজনক অবস্থাকে বলা হয়েছে: 'শাফা হুফরাতীম মিনাননার' জাহান্নাম গহবরের তীরভূমি এবং তার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের অতল গহবরে পড়ে যাওয়া। আর তা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতীক কুর'আন ও রাসূল বিশ্বাসের ভিত্তিতে জনগণের অন্তরে মিলন ও ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে তোলা। অন্যথায় এ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। মানুষের পরস্পরের মাঝে ভেদ বৈষম্য এবং অনৈক্যের সব আবর্জনা বিদূরিত করে দিয়ে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধন সৃষ্টির একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর এ কুর'আন আকড়ে ধরা।[৫৯৪]

এই মূল কথাটি কুর'আন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে নানা জায়াগায় নানা প্রসঙ্গে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"এবং নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। তাই এর অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদের বিচ্ছিন্ন করবে তাঁর পথ হতে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও।"[৫৯৫]

অনৈক্যের কুফল ও 'রি-হুন' শব্দের ব্যাখ্যা

---

৫৯৩. *আল কুর'আন*, ০৩:১০৩

৫৯৪. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৫৯৫. *আল কুর'আন*, ০৬:১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেছেন: **وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ** "সাবধান! তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি বিবাদে লিপ্ত হও তবে তোমরা কা-পুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের হাওয়া (প্রভাব) চলে যাবে।"[৫৯৬]

আলোচ্য আয়াতখানাতে অনৈক্যের কুফল বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, এতে তোমাদের 'রিহুন' তথা হাওয়া বা বাতাস চলে যাবে।[৫৯৭] এর মানে কি? এর মানে মুসলিম হওয়ার কারণে মুসলিমগণের গৌরবোজ্জল যে ইতিহাস রয়েছে, মুসলিম বিশজন হলে দুইশত কাফিরের মুকাবেলায় বিজয় লাভ করবে, মুসলিম মানেই এরা আল্লাহর সৈনিক, এরা মৃত্যুকে পরোয়া করেনা। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভেবে চিন্তে করা উচিৎ। কাফিরদের মনে মুসলিমগণের সম্পর্কে যে একটা ভীতি তা আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যার কারণে দেখা যায় যুগে যুগে এরা সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমগণের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। শুধু বদরের যুদ্ধের কথাই যদি উল্লেখ করা হয়, যে যুদ্ধে এক হাজার মুশরিক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিরস্ত্র মুসলিমগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর মাত্র তিনশত তেরজন মুসলিম তা প্রতিরোধ করলেন। এতেই মুশরিকদের নেতৃবৃন্দসহ ৭০ জন নিহত হলো ও ৭০ জন বন্দী হলো। এটাই হচ্ছে 'রি-হুন' তথা মুসলিমগণের প্রভাব। কিন্তু সে মুসলিমই আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রচন্ড মার খাচ্ছে তাদের প্রভাব চলে যাওয়ার কারণে।

এছাড়াও 'রি-হুন' শব্দের বর্তমানে সহজ ব্যাখ্যা করা যায় বিভিন্ন যানবাহন যেগুলো স্থলভাগে চলাচল করে এদের চাকায় যে হাওয়া থাকে তার সাথে। চাকায় যদি হাওয়া না থাকে তাহলে যানটি দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইঞ্জিন ইত্যাদি ঠিক থাকা সত্ত্বেও তা চলবে না বরং বসে যাবে। সুতরাং মুসলিম তারা যদি নিজেরা ঝগড়া বিবাদেই লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের হাওয়াও চলে যাবে। এতে অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগী যতই চমৎকার হোক না কেন ঐক্য ব্যতিত সে হাওয়া (প্রভাব) ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। অতএব যে কোন মূল্যে মুসলিম ঐক্য আজকে সময়ের দাবি। আর এরই নাম হাওয়া এরই নাম প্রভাব। বিশ্ব নবীর প্রদর্শিত পথ ঐক্য ও মিলনের পথ। এ পথে চলেই মানুষ আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে পারে। পারে ইহকাল ও পরকালের পরম কল্যাণের অধিকারী হতে। এ পথ সুদৃঢ় সোজা। এ পথের পথিকের পক্ষে যেমন পথভ্রষ্ট হওয়ার ভয় নেই, তেমনি বিভেদ বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হওয়ারও নেই আশংকা। বস্তুত বিভেদ ও অনৈক্যের দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে দেশ জাতি ও জনগণকে রক্ষা করার এ হচ্ছে একমাত্র উপায়। খুঁটিনাটি ব্যাপারেও মতভেদ হওয়ার কথা নয়। আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং নিজেরা বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব আপনার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনি তাদের অবহিত করবেন তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।"[৫৯৮] এ পর্যায়ে রাসূলে কারিম (স.) ঘোষণা করলেন: "যে লোক সমাজ সংস্থার আনুগত্য মেনে চলতে অস্বীকার করে এবং সমাজ শৃংখলাকে চূর্ণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হলো, তার মৃত্যুটা হলো জাহিলিয়াতের মৃত্যু।"[৫৯৯] শুধু তা-ই নয়, ইসলামি মিল্লাতের ঐক্য ও শৃংখলাকে যে লোক চূর্ণ করতে চায়, সে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী। নবী কারিম (স.) বলেন: "সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত ইসলামি উম্মতের মধ্যে যে লোক বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির অভিসন্ধি করবে, মৃত্যুদন্ডই তার অপরাধের

---

৫৯৬. *আল কুর'আন*, ০৮:৪৬

৫৯৭. *তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬

৫৯৮. *আল কুর'আন*, ০৬:১৫৯

৫৯৯. *সহীহ মুসলিম*, বাবু উজুবি মুলাজিমাতি জামা'য়াতিল মুসলিমীন, আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৩৪৩৬

শাস্তি।"[৬০০] পবিত্র কুর'আন ও হাদিসের আলোকে এটা স্পষ্ট যে, অনৈক্য ও বিভেদ ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কাজেই এ ক্ষতি এড়াতে হলে এবং পারস্পারিক ঐক্য, প্রীতি ও বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করতে হলে আন্তরিকভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে কুর'আন ও সুন্নাহকে অনুসরণ করতে হবে। এমন কিছু করা বা বলা কোন বিদ্বান বা আলেমেরই উচিত নয়, যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় ও পারস্পরিক বিদ্বেষের জন্ম হয়।[৬০১] সর্বোপরি মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হয়।

অনিষ্টকারী নাফসের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

পবিত্র কুর'আনে দেহের দাবির নাম দেয়া হয়েছে 'নফস'- নফস একটি বিরাট শক্তি। তাকে ভাইটাল ফোর্স বা প্রধান জীবনী শক্তি নামে অভিহিত করা যায়। ব্যক্তির সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এ নফসকে একান্তভাবে আল্লাহর অনুগত বানানো। কেননা এ শক্তিটি আল্লাহর অনুগত না হলে এবং আল্লাহর দ্বীন পালনে প্রস্তুত না হলে কারো পক্ষেই ঈমানদার মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। আল কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

"শপথ মানুষের এবং তাকে সুঠামকারীর। তাকে যে পাপ ও পূণ্যের জ্ঞান দান করেছেন তাঁর।"[৬০২] এ আয়াতে নফসকে প্রকৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে সক্ষম বহু সংখ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে একটি পূর্ণাংগ দৈহিক সত্তা দান করেছেন, যে সবের ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের উপযোগী জীবন যাপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সেই সাথে মানুষকে একটি সুস্থ প্রকৃতিও দিয়েছেন। সে প্রকৃতিকে ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন। তিনি মানুষের অবচেতনায় এ ধারণা গচ্ছিত করে দিয়েছেন যে, ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বলে একটা কথা আছে। এ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন। তাই যা ভাল, তা করা ভাল চরিত্রের লক্ষণ এবং যা মন্দ ও অন্যায় তা করা মন্দ চরিত্রের পরিচিতি। অতএব ভাল-ন্যায়-পূণ্য গ্রহণ এবং মন্দ-অন্যায়-পাপ বর্জন মানব-প্রকৃতি নিহিত ভাবধারা। এ নফসেরই একটি রূপ হচ্ছে, তা মানুষকে মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ করতে আদেশ করে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা নফসের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আর 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, তবে যাকে আমার প্রভু দয়া করেন সে ভিন্ন। নিশ্চয় , আমার প্রভু ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[৬০৩] স্বভাবতই মানুষ মন্দ, পাপ ও অন্যায়কে খারাপ জ্ঞান করে ও তার সে মন্দ-পাপ-অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া এ নফসের তাকীদ বা প্ররোচনায়ই সম্ভবপর হয়। এ কারণে তার পাশাপাশি আরও দু'টি প্রবণতা সংরক্ষিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে 'নাফসে লাউয়্যামা' তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকারী মানসিকতা। মানুষ যখন নফসের খারাপ প্রবণতার চাপে কোন অন্যায় পাপ করে বসে, তখন সে নফসেই স্বাভাবিকভাবে জাগে তীব্র অনুতাপ। সে অনুতাপের তীব্র চাপে সে অতঃপর খারাপ কাজ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাকে প্রস্তুত করে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করার জন্য এবং নবী কারিম (স.) এর মাধ্যমে উপস্থাপিত তাঁর দ্বীন পালন করে চলতে বাধ্য করে। তখন তার সম্মুখে ভেসে উঠে আল্লাহর বাণী:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

---

৬০০. *সহীহ মুসলিম*, বাবু হুকমিন মান ফাররাকা আমরাল মুসলিমীন, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৩৪৪২

৬০১. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৬০২. *আল কুর'আন*, ৯১:০৭-০৮

৬০৩. *আল কুর'আন*, ১২:৫৩

Dhaka University Institutional Repository

"পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সম্মুখীন হওয়ার ভয় রাখত এবং নিজ প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখত। জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।"[৬০৪] আল্লাহ ভীরু প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ নফসের খারাপ বাসনা কামনা দমন করা। রাসূলে কারিম (স.) এ জিহাদেরই আহবান জানিয়েছেন এ কথা বলে:

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"তোমাদের কেউ-ই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তার মন হৃদয় অন্তর আমার নিয়ে আসা আল্লাহর দ্বীনের (বিধানের) অধীন না হবে।"[৬০৫] তাই যে ব্যক্তি সংগ্রাম করে নিজের নফসকে আল্লাহর অনুগত বানাবে সে একজন মুজাহিদ বটে। নবী কারিম (স.) আরো বলেছেন:

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

"আর যে লোক স্বীয় নফসকে আল্লাহর অনুগত বানাবার লক্ষ্যে জিহাদ করলো, সে একজন প্রকৃত মুজাহিদ।"[৬০৬] নফসকে আল্লাহর অনুগত বানানোর জন্য আল্লাহর দ্বীনের শিক্ষালাভ সর্বপ্রথম প্রয়োজন। তাই এ লক্ষ্যে যে ব্যক্তি দ্বীনি শিক্ষা লাভ করবে, সেও আল্লাহর নিকট মুজাহিদ গণ্য হবে। কেননা তার এ কাজটা জিহাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষত স্বীয় নফসকে আল্লাহর অনুগত না বানালে তার পক্ষে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। তা ছাড়া নিজের মধ্যে বিরাজমান বিদ্রোহী মনকে আল্লাহর অনুগত বানানো না হলে বাইরে অবস্থিত আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশ্নই উঠে না। অতএব নফসের বিরুদ্ধে এ জিহাদ পরিচালনা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই একান্ত কর্তব্য। নির্বিশেষে সমস্ত ঈমানদার লোকের জন্যই এই জিহাদ ফরযে আইন পর্যায়ে গণ্য। নিজের ভিতরকার নফসকে আল্লাহর অনুগত বানানোর পর প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য তার বাইরের পরিবেশকে আল্লাহর অনুগত বানানোর জন্য জিহাদ পরিচালনা করা। ব্যক্তির বাইরের পরিবেশের মধ্যে সর্বপ্রথম তার সম্মুখে আসে তার পরিবার বা পরিবারের লোকজন। নিজের নফসকে আল্লাহর অনুগত বানানোর পর পরই তার কর্তব্য তার পরিবারবর্গকে আল্লাহর অনুগত বানানো। আল্লাহর অনুগত বানিয়ে পরকালের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা। তাই আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে (জাহান্নামের) অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভার রয়েছে নির্মম, কঠোর ফিরিশতাগণের উপর, যারা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।"[৬০৭]

পরিবারের বাইরে বৃহত্তম সমাজ পরিবেশকে আল্লাহর অনুগত বানানোর জন্য চেষ্টা করাও ঈমানদার ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে ব্যক্তি ও সমাজ সমষ্টি উভয়কেই কঠিন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। ফলে এ লক্ষ্যে তাকে ও তাদের সকলকে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে হয়। এ সংগ্রামও একটি অতি বড় জিহাদ। তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ পর্যায়ের জিহাদের একটা স্পষ্ট রূপরেখা প্রকট হয়ে উঠেছে নবী কারীম (স.)-র এ বাণীতে। তিনি ঘোষণা করেছেন:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

''তোমাদের যে কেউ কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পাবে সে যেন তার হস্তশক্তি দ্বারা তা বদলে দেয়। যদি তা সে না পারে তা হলে মুখে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। আর তা-ও যদি তার

---

৬০৪. *আল কুর'আন*, ৭৯:৪০-৪১

৬০৫. *আল ইবানাতুল কুবরা লি-ইব্‌ন বাত্তাহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২৯১

৬০৬. *মুসনাদু আহমদ*, বাবু মুসনাদি ফুজালাহ ইব্‌ন 'উবায়দিল আনসারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২২৮৩৩ ও ২২৮৪২

৬০৭. *আল কুর'আন*, ৭৯:৪০-৪১

করা সম্ভব না হয়, তা হলে অন্তর দিয়ে তার বিরোধীতা করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দূর্বলতম পর্যায়।"[৬০৮] হাদিসটির সারকথা হলো প্রথমে সেই শরী'আত বিরোধী কাজটিকে অন্তর দিয়ে খারাপ জানতে হবে, তার প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করতে হবে। তার পর তার বিরুদ্ধে মুখের কথা বা লেখনীর ভাষা প্রয়োগ করতে হবে এবং তার পরে শেষ পর্যায়ে এমন শক্তি অর্জন ও প্রয়োগ করতে হবে, যার ফলে সেই অন্যায়কে উৎখাত ও নির্মূল করা সম্ভব হবে। এর কোন একটিও করা না হলে সেই ব্যক্তির মু'মিন হওয়া শুধু অর্থহীনই নয়, অগ্রহণযোগ্যও। উল্লেখ্য যে, নফস তিন প্রকার:

১. নাফসে আম্মারাহ (মন্দ কাজের আদেশদাতা আত্মা): আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

'নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, তবে যাকে আমার প্রভু দয়া করেন সে ভিন্ন। নিশ্চয়, আমার প্রভু ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[৬০৯]

এক হাদিসে রাসূলে আকরাম (স.) সাহাবায়ে কিরামগণকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, "এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কিরূপ ধারণা যাকে সম্মান ও সমাদর করলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে?" সাহাবায়ে কিরামগণ আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর চাইতে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোন কিছুই হতে পারে না।' তিনি বললেন, 'ঐ সত্তার কসম যার করায়ত্তে আমার প্রাণ তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সে-ই এ ধরনের সাথী।'[৬১০]

অন্য এক হাদিসে আছে তোমাদের প্রধান শত্রু তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদ আপদে জড়িত করে দেয়। মোট কথা উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, মানব মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে।[৬১১]

২. নাফসে লাওয়ামাহ (মন্দ কাজে ধিক্কারদাতা আত্মা): আল্লাহ তা'আলার বাণী:

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

"আমি শপথ করছি কিয়ামত দিনের, আরও শপথ করছি সে আত্মার যে ধিক্কার দেয়।"[৬১২]

৩. নাফসে মুতমা'ইন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা): আল্লাহ তা'আলার বাণী:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

"ওহে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।"[৬১৩]

মুনাফিকের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

মুনাফিক শব্দটি আরবি। এর মূল হচ্ছে 'নিফাকুন'। আর নিফাকুন বলা হয় এমন গর্তকে, যা মাটির ভিতর দিয়ে একদিক থেকে অন্য দিকে চলে গিয়েছে এবং যার দু'দিকের দু'টি মুখ খোলা রয়েছে। ইঁদুর যে গর্তে বাসা বাঁধে তার দু'টি মুখই থাকে উন্মুক্ত। একদিক দিয়ে তাড়া করলে অপর দিক দিয়ে সে অতিসহজেই পালিয়ে যেতে পারে এবং শিকারীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। এজন্য এহেন গর্তকে আরবি ভাষায় বলা হয় নাফেকাউন বা নুফাকাতুন। এ দৃষ্টিতেই দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করাকে কুর'আনের পরিভাষায় বলা হয় নিফাক বা মুনাফিকি। আর ইসলামি শরি'আতের পরিভাষায় মুনাফিক

---

৬০৮. *সহীহ মুসলিম*, বাবু বায়ানি কাউনিন নাহি 'আনিল মুনকার, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৭০

৬০৯. *আল কুর'আন*, ১২:৫৩

৬১০. *তাফসীরে কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৯

৬১১. *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২

৬১২. *আল কুর'আন*, ৭৫:০১-০২

৬১৩. *আল কুর'আন*, ৭৯:২৭-২৮

বলা হয় তাকে, যার অন্তরে নিফাক রয়েছে।[৬১৪] এ পর্যায়ে কুর'আনের ঘোষণা: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'নিশ্চয় মুনাফিকরাই হচ্ছে ফাসিক।'[৬১৫] ফাসিক মানে শরি'আতের সীমালঙ্ঘনকারী। আয়াতের অর্থ হলো: ঈমানদার হয়েও যারা শরী'আতের সীমালঙ্ঘন করে, তারাই মুনাফিক। আর যারা মুনাফিক তারাই পারে শরি'আতের সীমালঙ্ঘন করতে। অন্তরে 'কুফরি' পোষণ করে শরি'আতের বিধিনিষেধ পালন করা যে সম্ভব নয়, তা-ই হচ্ছে এ আয়াতের বক্তব্য। এ আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি যেমন ব্যক্তিগত নীতি ও আচরণে মুনাফিক হতে পারে, তেমনি একটি জাতিও মুখে ইসলামের বুলি আউড়িয়ে এবং কার্যত পদে পদে ইসলামের আইন ও আদর্শ লঙ্ঘন করে গণ্য হতে পারে মুনাফিকদের পর্যায়ে। ইসলামের ইতিহাসে মুনাফিকদের আবির্ভাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মক্কায় ইসলামি আন্দোলনকারীদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না, ছিল কুফরি শক্তির করায়ত্তে। তাই সেখানে মুনাফিক দেখা যায়নি। ইসলামি আন্দোলন ও সংগ্রামের এ অগ্নিযুগে মক্কায় কাফিরদের পক্ষে যেমন মুনাফিকি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না, তেমনি ইসলামি আন্দোলনে ছিল না তার এক বিন্দু অবকাশ। মাদানি পর্যায়ে স্থানীয় কুফরি শক্তি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরোধীতা করতে সাহসী হয়নি। তাই তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল কুটিল পথে। এ পর্যায়ে নাযিল হওয়া বহু আয়াত ও সূরায় মুনাফিকদের চরিত্র ও কর্মতৎপরতার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় নানা দিক দিয়ে। সূরা আল মুনাফিকুনে বলা হয়েছে: "হে নবী, মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। আপনি যে নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল একথা তো আল্লাহর ভালো করেই জানা আছে। কিন্তু মুনাফিকদের সম্বন্ধে আল্লাহর ঘোষণা হলো: তারা মিথ্যাবাদী।"[৬১৬] হযরত মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর প্রকৃত রাসূল, মুনাফিকদের একথাটি আদৌ মিথ্যা ছিল না। আল্লাহ তাদের মিথ্যাবাদী বলেছেন শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে মেনে নেয়ার যে কথা মুখে ঘোষণা করেছে, তা মোটেই সত্য নয়। কেননা তাদের মুখের কথার সাথে তাদের অন্তরের লুকানো বিশ্বাসের কোন মিল নাই। বস্তুত কোন প্রকার বিপ্লবী আন্দোলনেই ক্ষমতা লাভের পর্যায়ে মুনাফিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটতে পারে একথা দুনিয়ার বিপ্লব ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত হয়। আল কুর'আনের আলোচনা থেকে মুনাফিক উদ্ভব হওয়ার কয়েকটি কারণ জানা যায়:

(১) কোন লোক হয়তো অন্তরে ইসলামি আদর্শের প্রতি চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে। কিন্তু প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করার মত সৎসাহস তার নেই। তাই নীতিগতভাবেই সে মুনাফিকির আশ্রয় গ্রহণ করে, বাহ্যিক ঈমানদারীর ছদ্মবেশে ইসলামের ও ইসলামি রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করাই তার উদ্দেশ্য এবং সে নিরন্তর সে চেষ্টাতেই লেগে থাকে। ওঁৎ পেতে থাকে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

(২) এমন কিছু লোকও আছে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না কিন্তু কুফরিতেই ডুবে থাকবে, সে বিষয়ে কোন চুড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছাতে সমর্থ হয় না। ইসলাম ও কুফরির মধ্যে যে প্রবল দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তাতে জয় কার হবে তা তারা আগেভাবে ঠিক করে উঠতে পারে না। সে জন্যে প্রকাশ্যে তারা কোন এক পক্ষ অবলম্বন না করে গোপনে উভয় দিকের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতে চেষ্টা করে। উভয় দিকের জয়ের ফায়দা লাভ এবং পরাজয়ের ক্ষতি থেকে বাঁচাই এদের আন্তরিক কামনা। প্রকাশ্যভাবে কোন নীতি গ্রহণ এবং তেমনি প্রকাশ্যভাবে কোন নীতির বিরোধীতা করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন। কিন্তু এদের তা থাকে না এবং থাকে না বলেই তারা এ সুবিধাবাদের নীতি অবলম্বন করে।

(৩) এছাড়া কিছু দূর্বলচেতা লোক সমাজে থাকে, যারা ইসলামের সংঘাতময় ও সংগ্রামপূর্ণ আদর্শকে গ্রহণ করা দূরূহ কাজ বলে মনে করে, যদিও অন্তর দিয়ে ইসলামকে তারা নেহায়েত অপছন্দ করে না বরং পছন্দই করে। তথাপি কুফরি শক্তির মুকাবিলায় ইসলামের জন্যে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে কিংবা এ

---

৬১৪. *কুর'আন ও হাদিস সঞ্চয়ন*, অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া (ঢাকা: ভূঁইয়া প্রকাশনি, ফেব্রু. ২০০০), ১ম খন্ড, পৃ. ১০৭

৬১৫. *আল কুর'আন*, ০৯:৬৭

৬১৬. *আল কুর'আন*, ৬৩:০১

জিহাদে অর্থদান করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়। এক কথায় ইসলামের প্রতি প্রকৃত ঈমান না থাকা সত্ত্বেও যারা নিজেদের ঈমানদার বলে পরিচয় দেয়, ইসলামি সমাজে শামিল হয়ে বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা আদায় করে কিন্তু বাস্তব জীবনে অন্তর দিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করতে পারেনি তারাই মুনাফিক বলে অবিহিত হবে।[৬১৭] আল কুর'আন ঘোষণা করছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

"আর মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে, যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী; অথচ তারা বিশ্বাসী নয় (বরং মুনাফিক)।"[৬১৮] পবিত্র কুর'আনে মুনাফিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থেকে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তা হচ্ছে তারা কাপুরুষ। তারা অন্তর দিয়ে যা বিশ্বাস করে না, তা স্বীকার করে বলে মুখে দাবি করে। আর এ সুযোগে যাবতীয় বৈষয়িক সুবিধা লাভে তৎপর হয়। কিন্তু এতে কোন সৎসাহসের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা যায় না। এ ধরনের কাপুরুষদের সংখ্যা যে জাতির মধ্যে বিপুল বা প্রভাবশালী, সে জাতির দুরবস্থা, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার কোন অবধি থাকে না, এরা যে কোন শত্রু জাতির আক্রমণকালে সাদা পতাকা উড়াবার জন্যে থাকে উন্মুখ হয়ে। কিন্তু যে সব লোক মুসলিম ছদ্মবেশে ইসলামি সমাজে ঘোরা-ফিরা করে আর সুযোগ পেলেই ইসলামের উপর বা মুসলিমগণের উপর আঘাত হানতে চেষ্টা করে, তারা সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের মুনাফিক। তারা কোচের সাপ। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে তারা দংশন করতে পারে।[৬১৯] এমনি এক শ্রেণীর মুনাফিক সম্পর্কে আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.

"মানুষের মধ্যে যারা পার্থিব জীবনে তোমাকে কথাবার্তায় মোহিত করে এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। মুলতঃ সে ভীষণ ঝগড়াটে ব্যক্তি। আর যখন সে প্রস্থান করে তখন সে জমিনে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ অশান্তি মোটেই পছন্দ করেন না।"[৬২০]

অর্থাৎ এ পর্যায়ে মুনাফিকরা মুসলিম ছদ্মবেশ ধারণ করে সে মুসলিমগণেরই ক্ষতি সাধন করে এবং নানা উপায়ে ধ্বংসাত্মক কাজ করাই তাদের একমাত্র চরিত্র। মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করে আল কুর'আনে আরো বলা হয়েছে:

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ

"ওরা আল্লাহর নামে শপথ করে যে ওরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ওরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুতঃ ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা কাপুরুষ (মুনাফিক)।"[৬২১]

ভীত কাপুরুষ হওয়ার কারণেই তারা তাদের মনের অবিশ্বাসের কথা তোমাদের কাছে কখনো প্রকাশ করে না। তোমাদের মধ্যে শামিল থেকেই তারা চায় তোমাদের ক্ষতি করতে। মুনাফিকরা আসলে কাফির, তারা মুসলিম হওয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করে মাত্র। কিন্তু তাদের গোপন যোগসাজস থাকে কাফিরদের সাথেই। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারায় বলেন:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

"তারা ঈমানদারদের কাছে আসলে বলে আমরা ঈমান এনেছি আর নিভৃতে শয়তানের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি বস্তুত আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা করি।"[৬২২]

---

৬১৭. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৬১৮. *আল কুর'আন*, ০২:০৮

৬১৯. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

৬২০. *আল কুর'আন*, ০২:২০৪-২০৫

৬২১. *আল কুর'আন*, ০৯:৫৬

৬২২. *আল কুর'আন*, ০২:১৪

Dhaka University Institutional Repository

তারা কাফিরদের পক্ষে গোয়েন্দা হয়ে কাজ করে মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে। তাদের আসল লক্ষ্য হলো ইসলামি শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, বিপর্যস্ত করা। অতএব তারা কাফিরদের মতোই ব্যবহার পেতে পারে মুসলিমগণের কাছে। এজন্যে নবী কারিম (স.) কে লক্ষ্য করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النبي جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"হে নবী কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সমানভাবে যুদ্ধ করুন। এদের প্রতি কঠোর আচরণ করুন। আর এদের পরকালীন অবস্থা হবে এ যে, এরা হবে জাহান্নামী। আর জাহান্নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও বীভৎস জায়গা।"[৬২৩] আল্লাহ তা'আলা এদের সর্বশেষ পরিণতি সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

"নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতর স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না।"[৬২৪]

জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আল কুর'আন

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে বিবেকবান করে সৃষ্টি করেছেন। আর বিকেবানদের সকল কাজই পরিকল্পিতভাবে কোন না কোন উদ্দেশ্যে পরিচালত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্যহীন কাজ শুধু মাত্র বিবেকহীন উম্মাদের ক্ষেত্রেই শোভনীয়। বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা এ সুন্দর পৃথিবীকে বিনা পরিকল্পনায় উদ্দেশ্যহীণভাবে সৃষ্টি করেননি। তাই তাঁর সুনিপুন সৃষ্টিতে ভারসাম্যহীনতা ও অসামঞ্জস্যতার প্রমাণ মিলে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

"তিনি সে সত্ত্বা যিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন, দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার চোখ মেলে দেখ কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার চোখ মেলে দেখ কোন ত্রুটি না পেয়ে তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ এবং ক্লান্ত হয় ফিরে আসবে।"[৬২৫]

মহাবিশ্বের তুলনায় ক্ষুদ্র এ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে সৃষ্টির সেরা জীব ও বিচিত্র জ্ঞানের অধিকারী মানব জাতির বসবাস। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবার মানব সভ্যতার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্যতম। মানুষের প্রকৃতি সম্মত আদর্শ হিসেবে ইসলাম পারিবারিক বিষয়াদির উপর আগা-গোড়াই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বর্তমান পৃথিবীবাসী সহ কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানবের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্য যেহেতু আল কুর'আন নাযিল হয়েছে; সেহেতু এতে পারিবারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট খুঁটি-নাটিসকল বিষয়ের বিস্তারিত বিধানও দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে বহুল আলোচিত জনসংখ্যা সমস্যাটি এর বাইরে নয়।[৬২৬] এ সমস্যা সমাধানের জন্য একদলের বক্তব্য হল জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে এটা যাদের বক্তব্য তারা কেউ আল কুর'আনকে যথাযথভাবে বিশ্বাস করেন না। জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আল কুর'আনে গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত, ভ্রুণ হত্যা কিংবা সদ্য প্রসূত সন্তান হত্যা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর প্রয়োজন হলে অন্য কথা এবং তা নেহায়েত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এছাড়া আর কোন দিক দিয়েই এ কাজকে সমর্থন করা হয়নি। নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সর্বোপরি মানবিক সকল দিক দিয়েই একাজ শুধু অবাঞ্চিতই নয়, অত্যন্ত মারাত্মক। যে পিতামাতা নিজেরাই নিজেদের সন্তানের জানের দুশমন হয়ে দাঁড়ায়, তারা গোটা মানব জাতিরই দুশমন এবং কার্যত সে দুশমনি করতে তারা একটুও দ্বিধা করছে না। কেননা নিজ ঔরসজাত,

---

৬২৩. *আল কুর'আন*, ০৯:৭৩, ৬৬:০৯

৬২৪. *আল কুর'আন*, ০৪:১৪৫

৬২৫. *আল কুর'আন*, ৬৭:৩-৪

৬২৬. *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

নিজ গর্ভস্থ বা গর্ভজাত সন্তানকে নিজেদের হাতেই হত্যা করার জন্যে প্রথমত নিজেদের মধ্যে অমানুষিক মির্মমতা, কঠোরতা ও নিতান্ত পশুবৃত্তির উদ্ভব হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় এরকম কাজ কারোর দ্বারা সম্ভব হতে পারে না এটা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। ব্যক্তির এ নির্মমতা ও কঠোরতাই সংক্রমিত হয়ে গোটা জাতিকে গ্রাস করে, গোটা জাতির প্রতিই তা শেষ পর্যন্ত আরোপিত হয়। বস্তুত নিজেদের সন্তান নিজেরাই ধ্বংস করে এ দৃষ্টান্ত প্রাণী জগতে কোথাও পাওয়া যায় না আদৌ।

এ পর্যায়ে প্রথমত দেখা দরকার, এ কালের জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি এবং ঠিক কোন কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে লোকেরা প্রস্তুত হচ্ছে। একথা সর্বজন বিদিত যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই বর্তমান দুনিয়ার লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে, অন্তত জোর গলায় তাই প্রচার করা হয়। কখনো কখনো পারিবারিক সুখ শান্তি ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দোহাই দেয়া হয়, তাও দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে এ এক ব্যাপক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আল কুর'আনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়েছে:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

'দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করবে না নিজ সন্তানদের, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি।'[৬২৭] এ আয়াত স্পষ্টভাবে উপস্থিত দারিদ্যের কারণে সন্তান 'হত্যা' করতে কঠোরভাবে নিষেধ করছে। যারা বর্তমানে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ত, নিজেরাও খাবে আর সন্তানদেরও খাওয়াবে এমন সম্বল যাদের নেই, তারা আরো সন্তান জন্মদান করতে রীতিমত ভয় পায়। মনে করে আরো সন্তান হলে মারাত্মক দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হতে হবে, দেখা দিবে চরম খাদ্যাভাব। বোঝার উপর শাকের আটির মতো তা হবে একান্তই দুর্বহ। আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনে আরো বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"আর হত্যা করো না তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্য-ভয়ে, ওদের এবং তোমাদের আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ওদের হত্যা করা মহাপাপ।"[৬২৮]

যারা ভবিষ্যতে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকায় সন্তান জন্মদানে ভয় পায়, যারা মনে করে আরো অধিক সন্তান হলে জীবন যাত্রার বর্তমান 'মান' রক্ষা করা সম্ভব হবে না এবং এ জন্যে জন্মনিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের পন্থা গ্রহণ করে। উপরোক্ত আয়াতে তাদের সম্পর্কেই নিষেধবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।[৬২৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'জাহিলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত। যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কর্ম পদ্ধতিটি যে ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং ভয়ংকর তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এতে অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটাতো একান্ত আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। নাকি তিনি ব্যতীত এমন কেউ আছেন যিনি তোমাদেরকে রিযিক দেন ? সুতরাং যিনি তোমাদেরকে রিযিক দিচ্ছেন তিনিই তাদেরকেও রিযিক দিবেন। তোমরা কেন অন্যায় এবং অবাস্তব চিন্তায় বিভোর হয়ে নিজ সন্তান হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হচ্ছ! বরং এক্ষেত্রে রিযিক দেয়ার বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা তাদের সন্তানদের আগে রিযিকদানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, 'আমি আগে তাদেরকে রিযিক দিব ও পরে তোমাদেরকে রিযিক দিব।' আর বাস্তবতা ও এমনটিই দেখা যায় না যে, কোন সন্তান জন্ম লাভের পর রিযিকের অভাবে সে মৃত্যু বরণ করেছে।[৬৩০] কেউ কেউ

---

৬২৭. *আল কুর'আন*, ০৬:১৫১

৬২৮. *আল কুর'আন*, ১৭:৩১

৬২৯. *অন্যায় ও অসত্যের বির—দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৬৩০. *তাফসিরে মা'আরিফুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৫

বলেন, কুর'আন হাদিসে তো সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ তো নিষিদ্ধ করা হয়নি। আর জন্মনিরোধের আধুনিক প্রক্রিয়ায় গর্ভসঞ্চার হওয়ার পথই বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাতে সন্তান হত্যার কোন প্রশ্নই নেই। তাই কুর'আনের এ নিষেধবাণী একাজকে নিষিদ্ধ করেনি এবং এ প্রসঙ্গে তা প্রযোজ্যও নয়। কিন্তু একথা যে কতখানি ভ্রান্ত, দুর্বল ও অমূলক তা আয়াত দু'টি সম্পর্কে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ দু'টো আয়াত সর্বাবস্থায়ই সন্তান হত্যা নিষেধ করে দিয়েছে, প্রতিক্রিয়া তার যা-ই হোক না কেন। আর 'কতল' শব্দের অর্থও কোন জীবন্ত মানুষকে তরবারির আঘাতে হত্যা করাই কেবল নয়- আরবি অভিধান এবং তাফসির সমূহে এর বিভিন্ন অর্থ দেখা যায়। আরবি অভিধান 'আল-কামূস' এ বলা হয়েছে, 'কতল' মানে মেরে ফেলা- যে কোন উপায়েই হোক না কেন। আধুনিক আরবি বাংলা অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে, হত্যা, খুন, নিধন ও ধব্বংস।[৬৩১] তাফসিরে 'রুহুল বয়ান' এ বলা হয়েছে, 'কতল' মানে হালাক করে দেওয়া- ধ্বংস করা। তাফসিরে হাক্কিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কতল' মানে জীবন্ত দাফন করা।[৬৩২]

আল কুর'আন কেবল আরব জাহিলিয়াতের ন্যায় জীবন্ত সন্তান হত্যা করতেই নিষেধ করেনি; বরং যে কোনভাবেই হত্যা করা হোক না কেন, তাকেই নিষেধ করেছে। শুধু তা-ই নয়, শুক্র নিসিক্ত হওয়ার পর তার জন্য আসল আশ্রয়স্থল হচ্ছে স্ত্রীর জরায়ুর গর্ভাধার। সেখানে তাকে প্রবেশ করতে না দিলে কিংবা কোনভাবে তাকে বিনষ্ট, ব্যর্থ, নিস্ফল করে দিলেও তা এ নিষেধের আওতায় পড়বে এবং তা হবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট হারাম কাজ। জন্মনিরোধ বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ এ দু'টিই হারাম কাজ। কেননা এ প্রক্রিয়ায় বাহ্যত প্রাণী হত্যা হলেও প্রথমত শুক্রকে বিনষ্ট করা হয় এবং দ্বিতীয় শুক্রকীট যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীব, তাকে তার আসল আশ্রয় স্থলে প্রবেশ করতে না দিয়ে পথিমধ্যেই খতম করে দেয়া হয়। ঠিক যে কারণে জীবিত সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ, ঠিক সে কারণেই জীবিত শুক্রকীট বিনষ্ট করাও নিষিদ্ধ। কেননা এ শুক্রকীটই তো সন্তান জন্মের মৌল উপাদান। তাফসিরে 'রুহুল বয়ানে' এ কথাই বলা হয়েছে। সন্তান হত্যা করাকে হারাম করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর ফলে আল্লাহর সংস্থাপিত মানব বংশের ভিত্তিই চূর্ণ হয়ে যায়। আর আল্লাহর সংস্থাপিত এ ভিত্তিকে যারা ধ্বংস করে তারা অভিশপ্ত। কেননা, এতে করে আল্লাহর রোপিত বৃক্ষের ফল নষ্ট করা, তাকে কেটে নেয়া এবং মানুষের বংশকে শেষ করে দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, এ কাজ তারাই করতে পারে যারা আল্লাহকে রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর উপর নির্ভর করতে পারে না রিযিকের ব্যাপারে। তাফসিরে রুহুল বয়ানে বলা হয়েছে: এ কাজে রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল পরিহার করা হয়। তার ফলে আল্লাহর ওয়াদাকে অবিশ্বাস করা হয় অথচ তিনি বলেছেন:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

'পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক সরবরাহের দায়িত্ব আল্লাহর উপর অর্পিত নয়।'[৬৩৩] তাফসিরে লুবাবে উল্লেখ করা হয়েছে: সন্তানকে যদি দারিদ্র্যতার ভয়ে হত্যা করা হয়, তবে তা হবে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারনা যা খুবই নিন্দনীয়।[৬৩৪] এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা এ যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের এমন কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন যার ফলে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রিত কিংবা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়া কোন দিক দিয়েই বিন্দুমাত্র কল্যাণকর হতে পারে না। না পারিবারিক জীবনে তার ফলে কোন শান্তি ও সুখ আসতে পারে, না অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে।[৬৩৫] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আর কুর'আনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন:

---

৬৩১. *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী), পৃ. ৬৩০

৬৩২. *তাফসিরে হাক্কি* (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), খ. ৭ম, পৃ. ২০৮

৬৩৩. *আল কুর'আন*, ১১:০৬

৬৩৪. *তাফসির-ল লুবাব*, ইব্ন আদিল (মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), খ. ১০ম, পৃ. ২৮৬

৬৩৫. *অন্যায় ও অসত্যের বির-দ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَقَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

"যারা নির্বোধের মত নিজেদের সন্তান হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনার জন্য নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।"[৬৩৬]

সন্তান হত্যা আর আধুনিক পদ্ধতি জন্মনিয়ন্ত্রণ, জন্মনিরোধ কোন যুক্তি সম্মত কাজ নয়, বরং চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ। কোন অকাট্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও জ্ঞান তথ্যের উপর তা নির্ভরশীল নয়, নিছক আবেগ উচ্ছ্বাস মাত্র। এতে করে আল্লাহর দেয়া রিযিক সন্তানকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া হয়, সন্তান হতে দিতে অস্বীকার করা হয় অথবা এ সন্তানের ফলে আল্লাহ যে অতিরিক্ত রিযিক দিতেন তা থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। আর তা করা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা পোষণ করে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে যে, আরো সন্তান হলে তিনি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন না বা করবেন না (নাউযুবিল্লাহ)। তার ফলে একাজ যারা করে তারা ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ক্ষতি কেবল নৈতিক নয়, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও তা অপূরণীয়। ইহকালীন সব দিক দিয়েই তার ক্ষতি ভয়াবহ। আর এ ক্ষতির সম্মুখীন তারা হচ্ছে শুধু এ কারণে যে, আল্লাহর বিধানকে তারা মেনে চলতে অস্বীকার করছে। এ গুমরাহির পথকে তারা নিজেরা ইচ্ছে করেই গ্রহণ করেছে অথচ হিদায়াতের পথ তাদের সামনে উজ্জল উদ্ভাসিত হয়েছিল। তারা অনায়াসেই সে পথে চলে চির কল্যাণের দাবিদার হতে পারত। আর সত্যি কথা এ যে, হিদায়াতের সুস্পষ্ট পথ সামনে রেখে যারা নিজেদের ইচ্ছানুক্রমে সুস্পষ্ট গুমরাহীর পথে অগ্রসর হতে থাকে তারা যে কোন-দিনই হেদায়াতের পথে এক বিন্দু চলতে পারবে, এদিকে ফিরে আসবে, এমন কোন সম্ভাবনাই নেই। এ সব কথাই হচ্ছে উপরিউক্ত আয়াতের ভাবধারা। বস্তুত জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক প্রচেষ্টা প্রায় সবই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, এর জন্যে ব্যয় করা কোটি কোটি টাকা যা একেবারে নিস্ফল হয়ে যায় তা আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।[৬৩৭]

দ্বিতীয় এরূপ কাজের অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহর রিযিকদাতা হওয়ার কথায় কোন বিশ্বাস নেই। একাজ ষোল আনাই বেঈমানী, নিতান্ত বেঈমান লোকদের দ্বারাই সম্ভব এ ধরনের কাজ, তাতে কোনই সন্দেহ থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা, একাজ চরম নির্মমতার পরিচায়ক। মনুষ্যত্বের সুকোমল বৃত্তিসমূহ মানুষকে একাজ করতে কখনো রাজি হতে দেয় না।[৬৩৮] তাই আল কুর'আনে একাজ মুশরিকদের দ্বারাই সম্ভব বলে বলা হয়েছে:

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَقَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

"এরূপে তাদের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে তাদের ধ্বংসের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আল্লাহ চাইলে তারা এ করত না। তাই তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদের থাকতে দাও।"[৬৩৯]

সন্তান হত্যাকারী জন্মনিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ যেন একটা মন ভুলানো ও চাকচিক্যময় কাজ। এ কাজের অনিবার্য ফল একটা জাতিকে নৈতিকতার দিক দিয়ে দেউলিয়া করে দেয়া , বংশের দিক দিয়ে নির্বংশ করে, সুখ-শান্তির চরম অভাব ঘটিয়ে সর্বস্বান্ত করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ার জন্মনিয়ন্ত্রণকারী জাতি সমূহের চরম অবস্থা চিন্তা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সন্তান হত্যার যে কোন

---

৬৩৬. *আল কুর'আন*, ০৬:১৪০

৬৩৭. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

৬৩৮. প্রাগুক্ত

৬৩৯. *আল কুর'আন*, ০৬:১৩৭

ব্যবস্থাই সমাজে ব্যাপক নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়া অতীব স্বাভাবিক এবং অনিবার্য বিষয় তাতে কোন সন্দেহ নাই।[৬৪০] সুতরাং এ পথ পরিহার করে মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের কাছে ফিরে এসে আল্লাহ তা'আলাকে রিযিকদাতা হিসেবে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে মূলতঃ অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানবতার কল্যাণ। একথাটি অতি তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করা উচিৎ। নচেৎ এ পদ্ধতির মধ্য দিয়েই এজাতি ধ্বংসের অতল গহবরে হারিয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নাই।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিভ্রান্তি

বর্তমানে একদল লোক জন্ম নিয়ন্ত্রণে আযলক শরি'আত সম্মত প্রমাণ করার জন্য হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত "আমরা আযল করছিলাম ও দিকে কুর'আনও নাযিল হচ্ছিল" হাদিসখানা উল্লেখ করে থাকেন। এ বিষয়ে একজন সাহাবী বর্ণিত এ সংক্রান্ত একটি মাত্র দলীল রয়েছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় আর কারো থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা নেই।

এ সম্পর্কে সহীহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উমদাতুল কারির রচয়িতা আল্লামা বদরুদ্দিন 'আইনি লিখেছেন, এটা অসম্ভব নয় যে, প্রথম দিকে কুর'আনে কিছু আসেনি। রাসূলে আকরাম (স.) ও কোন নিষেধবাণী উচ্চারণ করেননি। কিন্তু হযরত জাবির (রা.)-র এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, এর পরে কুর'আনে আর কিছু আসেনি আর রাসূল (স.) ও তা নিষেধ করেননি। বরং চূড়ান্ত বক্তব্য হচ্ছে রাসূল (স.) আযল করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

যারা হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতেই আযল জায়েয প্রমাণ করে জন্ম নিয়ন্ত্রণকে বৈধতা দিতে চান জনগণকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে চান। তাদের জেনে রাখা উচিৎ সে জাবির (রা.) থেকেই বর্ণিত "এক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে বললেন, আমার একটি কৃতদাসী রয়েছে আমি তার সাথে আযল করি (এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?) জবাবে তনি বললেন: তা আল্লাহর সৃষ্টি ইচ্ছাকে এক বিন্দুও বন্ধ করতে পারবে না।" হযরত জাবির (রা.) অতঃপর বলেন, কিছু দিন পর সে ব্যক্তিই এসে রাসূল (স.) কে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যে, কৃতদাসীর সাথে আযল করি বলে আপনাকে অবহিত করেছিলাম সে তো গর্ভবতী হয়েছে।' তখন রাসূল সে.) বললেন, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই রাসূল।'[৬৪১]

এর অর্থ দাঁড়ায় যে, আযল দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ হয় না। নবী কারিম (স.) আল্লাহর রাসূল হিসেবে পূর্বেই তা বলে দিয়েছেন। এছাড়াও এক গবেষণায় পাওয়া যায় যে, পুরুষের এক ফোটা বীর্যের সাথে প্রায় ৬ লক্ষ ডিম্বানু থাকে যার প্রত্যেকটি থেকে একটি সন্তান জন্ম লাভ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ এত মহান ও সুপরিকল্পনাকারী যে, সেখান থেকে তিনি মাত্র একটি অথবা দু'টি বা আরো কিছু বেশি কখনো কখনো দান করেন। কিন্তু তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে প্রত্যেকটি ডিম্বানু থেকেই একটি করে সন্তান দান করতে পারেন। আর তিনি যদি তা দিতে চানই তবে কে আছে এমন তা রোধ করবে? সুতরাং মানুষের অবশ্যই হুশিয়ার হওয়া দরকার যে, যে কোন মূল্যে আল্লাহর আইন মেনে চলতে হবে। আর চূড়ান্ত কথা এটাই যে, আযল বৈধ নয় এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ হারাম।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল কুর'আন

বর্তমান পৃথিবীর এক নম্বর সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে সন্ত্রাস। আল কুর'আন সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই সন্ত্রাস প্রতিরোধে কঠোর এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত দিয়েছে। কুর'আনের পরিভাষায় সন্ত্রাসীদেরকে 'মুহারিবুন' (محاربون) বলা হয়েছে। যেসব লোক সশস্ত্র হয়ে অন্যায়ভাবে পথে-ঘাটে,

---

৬৪০. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৬৪১. *সহীহ মুসলিম*, বাবু হুকমিল আযল, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২৬০৭

ঘরে-বাড়িতে, নদীতে-মরুভূমিতে নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালায় এবং প্রকাশ্যভাবে জনগণের সম্মুখে জনগণের ধন-মাল হরণ করে নিয়ে যায় তাদেরকেই 'মুহারিবুন' বলা হয়।[৬৪২] মুহারিবুন' সম্পর্কে কুর'আনের বক্তব্য:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে চেষ্টা ও তৎপরতা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এটাতো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান। আর পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় শাস্তি।[৬৪৩]

পবিত্র কুর'আনে 'সন্ত্রাসবাদ' বলতে যা বোঝায় তা প্রকাশের জন্য 'ফিতনা' এবং 'ফাসাদ' শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তাহলো কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদাত-বন্দেগীতে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, দুর্বলের উপর অত্যাচার করা, তাদের ন্যায় অধিকার হরণ করা, তাদের ঘর-বাড়ি জবরদখল করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়া , জোর-জবরদস্তিমূলক সত্যকে দমন করা এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয়া , মানুষকে বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ধোকা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বলপ্রয়োগের চেষ্টা করা। যুগে যুগে ইসলামের অনুসারীদের উপর বাতিলপন্থীদের প্রতাপ ও জোর-যুল্‌ম, নিপীড়ন ও নির্যাতন, প্রজাসাধারণের মাঝে শ্রেণী ও বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি করা এবং স্বৈরাচারী শাসন চালানো, দুর্বলদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ লুট করা, সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবন যাপনের পরিবর্তে বিকৃত পথে জীবনকে চালিত করা, পররাজ্য গ্রাস করা, প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিবর্তে যুল্‌ম, অবিচার ও লুটতরাজের কাজে ব্যবহার করা, পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারসাধনের পর তাতে অনর্থ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা ইত্যাদি। পবিত্র কুর'আনের আয়াতসমূহে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' হিসেবে যা বুঝানো হয়েছে বর্তমান সময়ের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে নিঃসন্দেহে তার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

পবিত্র কুর'আনে 'ফিতনা' শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কুরআনে 'ফিতনা' শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয় তার কয়েকটি নমুনা নিম্নে উদ্বৃত হলোঃ

কুফর, শিরক এবং ইবাদত-বন্দেগীতে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকে 'ফিতনা' বলা হয়েছে।[৬৪৪] পবিত্র কুর'আনের ভাষ্য হলো:

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

'আর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করা এবং কুফরি, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহ তা'আলার নিকট বড় ধরনের পাপ, আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা, নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।"[৬৪৫] নিম্নে আল কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের ফিতনার বর্ণনা দেয়া হল:

---

৬৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৬৪৩. *আল কুর'আন*, ০৫:৩৩

৬৪৪. *তাফসিরে মা'আরেফুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৬৪৫. *আল কুর'আন*, ০২:২১৭

দুর্বলের উপর অত্যাচার করা, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তাদের ঘর-বাড়ি জবরদখল করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর (ফিতনায় নিমজ্জিত হয়ে) হিজরত করে অতঃপর জিহাদ করে ও ধৈর্যধারণ করে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৬৪৬]

জোর জবরদস্তিমূলক সত্যকে দমন করা এবং সত্যগ্রহণ থেকে মানুষকে বাধা দেয়া। যেমন পবিত্র কুর'আনের ভাষ্য হলো:

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ

"মূসা (আ.) এর উপর তাঁর জাতির ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া আর কেউ ঈমান আনেনি এই ভয়ে যে, ফিরাউন ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা তাদেরকে বিপদে ফেলে দিবে।[৬৪৭]

মানুষকে বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ধোকা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বলপ্রয়োগের চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا

"আমার নাযিলকৃত ওহী থেকে পদস্খলন ঘটাবার জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে যাতে তুমি সেটা ছেড়ে দিয়ে আমার সম্পর্কে অপ-প্রচারণায় লিপ্ত হও। তুমি এতে সম্মত হলে তোমাকে তারা বন্ধু করে নিতো।"[৬৪৮]

অসত্যের প্রতিষ্ঠা, অসৎ ও অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ, হত্যা ও রক্তপাত করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا

"যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদেরকে (ফিতনা) বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করতো, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করতো এবং মোটেও বিলম্ব করতো না।"[৬৪৯]

পবিত্র কুর'আনে 'ফাসাদ' শব্দের ব্যবহার

'ফাসাদ' শব্দটি পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অন্যায় শাসন ও হত্যাকান্ড, দুর্বলদের প্রতি অবিচার ও সম্পদ লুটপাট: আল কুর'আন ফিরাউনকে 'ফাসাদ' সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, কারণ সে তার প্রজাসাধারণের মাঝে শ্রেণী ও বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি করতো এবং স্বৈরাচারী শাসন চালাতো, দুর্বলদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতো এবং তাদের সম্পদ লুট করতো। পবিত্র কুর'আনের ভাষ্য হলো :

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

"ফিরাউন তার দেশে পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং কন্যা শিশুদেরকে জীবিত রাখতো। নিশ্চয় সে ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী।[৬৫০]

---

৬৪৬. *আল কুর'আন*, ১৬::১১০

৬৪৭ .*আল কুর'আন*, ১০:৮৩

৬৪৮. *আল কুর'আন*, ১৭:৭৩

৬৪৯. *আল কুর'আন*, ৩৩:১৪

৬৫০. *আল কুর'আন*, ২৮:০৪

ন্যায়ানুগ পন্থার বিপরীতে বিকৃত পথে জীবন চালানো:

আদ. সামুদ, লুত, মাদায়েনবাসীসহ বিভিন্ন জাতিকে আল কুর'আন ফাসাদকারী হিসেবে গণ্য করেছে। কারণ তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবন-যাপনের পরিবর্তে বিকৃত পথে জীবনকে চালিত করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ .

"যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল, অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।"[৬৫১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

"তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছো, রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কাজ করছো? জবাবে তাঁর সম্প্রদায় একথা বললো, আমাদের উপর আল্লাহর আজাব আনো, যদি তুমি সত্যবাদী হও। তিনি বললেন হে আমার পালনকর্তা, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।"[৬৫২]

আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়

পররাজ্য গ্রাসের ফলে যে বিপর্যয় আসে তাকেও 'ফাসাদ' বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

"সে (রানী বিলকিস) বললো, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিবর্গকে অপদস্ত করে। তারা এরূপই করবে।"[৬৫৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

"আর সে শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি (যারা সালেহ আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তারা সকলেই পরে ধ্বংস হয়েছিল) যারা দেশজুড়ে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াতো এবং সংশোধন করতো না।"[৬৫৪]

যুল্‌ম, অবিচার ও লুটতরাজের কাজে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার

যে ধরনের শাসন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিবর্তে জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজের কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে আল কুর'আন 'ফাসাদ' নামে অভিহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট ঘোষণা:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

"আর যখন সে শাসকের আসনে বসে তখন পৃথিবীতে ফাসাদ করতে সচেষ্ট হয় এবং ফসল ও প্রাণীকুল ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়, অথচ আল্লাহ তা'আলা ফাসাদ পছন্দ করেন না।"[৬৫৫]

শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা

---

৬৫১. *আল কুর'আন*, ৮৯:১১-১২

৬৫২. *আল কুর'আন*, ২৯:২৯-৩০

৬৫৩. *আল কুর'আন*, ২৭:৩৪

৬৫৪. *আল কুর'আন*, ২৭:২৬

৬৫৫. *আল কুর'আন*, ০২:২০৫

পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারসাধনের পর তাতে অনর্থ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলা ফাসাদ বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন পবিত্র কুর'আনের ভাষ্য:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।"[৬৫৬] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির হাফিয ইব্ন কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন:

ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرض وما أضره بعد الإصلاح- فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان اضر مايكون على العباد- فنهى تعالى عن ذلك.

"শান্তি স্থাপনের পর ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় ও যে সকল কর্মকান্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগস্ত করবে তা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কেননা যখন কাজ-কারবার শান্ত পরিবেশে ঠিকঠাক চলতে থাকে তখন যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তবে তা হবে বান্দাদের জন্য বেশী ক্ষতিকর। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।"[৬৫৭] ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহ 'আলাইহি বলেছেন:

إنه سبحانه تعالى نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد اصلاح .

"শান্তি কম বা বেশী যতটুকুই হোক স্থাপনের পর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বিপর্যয় কম বা বেশি যাই হোক সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন।"[৬৫৮]

সন্ত্রাস জঘণ্য অপরাধ

সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্বই মহান আল্লাহ তা'আলার কাম্য। পৃথিবীতে সন্ত্রাস বিরাজ করুক তা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

"যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ অশান্তি (সন্ত্রাস) পছন্দ করেন না।"[৬৫৯] সন্ত্রাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"ফিতনা (সন্ত্রাস) নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।"[৬৬০]

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"ফিতনা (সন্ত্রাস) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"[৬৬১] সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আখ্যায়িত করে কুর'আনে বলা হয়েছে:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[৬৬২]

---

৬৫৬. *আল কুর'আন*, ০৭:৫৬

৬৫৭. হাফিজ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাসির, *তাফসির্ল কুরআনিল আযীম* (মাকতাবাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, তা. বি.), খ. ২য়, পৃ. ২২৩

৬৫৮. আবু আব্দিলণ্ডাহ মুহাম্মাদ ইব্ন মাহমাদ আল আনসারী আল কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুর'আন ওয়া তাফসীরে কুরতুবী* (বৈর্ত: দার্ল কুতুব মাল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৭ম , পৃ. ১৪৫

৬৫৯. *আল কুর'আন*, ০২:২০৫

৬৬০. *আল কুর'আন*, ০২:২১৭

৬৬১. *আল কুর'আন*, ০২:১৯১

৬৬২. *আল কুর'আন*, ০২:২৭

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসী সকলের নিকটই ঘৃণিত। মহান আল্লাহও তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে তাদেরকে লা'নত করেছেন। আল কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পরে তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং মন্দ আবাস।"[৬৬৩] সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না।"[৬৬৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল।"[৬৬৫] পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ও পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[৬৬৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন, তার উপর লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।"[৬৬৭]

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا- يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

"যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানজনক অবস্থায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"[৬৬৮]

সৌদী আরবের উচ্চতর উলামা পরিষদের ফতোয়া

সৌদী আরবের উচ্চতর উলামা পরিষদের এক ফতোয়ায় বলা হয়েছে যে:

من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والافساد فى الأرض التى تزعزع الأمن-
بالاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامه او المساكن أو المساجد أو المدارس أو

৬৬৩. *আল কুর'আন*, ১৩:২৫

৬৬৪. *আল কুর'আন*, ১৭:৩৩

৬৬৫. *আল কুর'আন*, ০৫:৩২

৬৬৬. *আল কুর'আন*, ০৫:৩৩

৬৬৭. *আল কুর'আন*, ০৪:৯৩

৬৬৮. *আল কুর'আন*, ২৫:৬৮-৬৯

Dhaka University Institutional Repository

البترول، ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فإن عقوبته القتل-

"শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে যদি প্রমাণিত হয় যে, কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং ব্যক্তিগত বা সরকারী সম্পত্তি, বাসস্থান, মসজিদ, মাদরাসা, মেডিক্যাল, কারখানা, ব্রিজ, কালভার্ট, অস্ত্রাগার, পানি সংরক্ষণাগার, বাইতুল মালের আয়ের উৎস যেমন পেট্রোলের পাইপ, বিমান বিধ্বংস করা বা ছিনতাই করা ইত্যাকার নাশকতামূলক ও শান্তি বিঘ্নকারী সন্ত্রাসমূলক কোন কাজ করেছে, তবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা।"[৬৬৯]

ইসলাম মানুষকে দ্বীন, জীবন, সম্মান, বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদ এ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছে এবং এসব মৌলিক অধিকার বিনষ্ট করাকে হারাম করেছে।[৬৭০]

হাদিসের বাণী

রাসূল আকরাম (স.) তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে এ সম্পর্কে বলেছেন:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য তোমাদের অন্য ভাইয়ের রক্ত, ধন-সম্পদ আজকের দিনের মতো, এ মাসের মতো এবং এ শহরের মতোই হারাম।"[৬৭১] তিনি আরো বলেন:

كل المسلم على المسلم حرام : دمه، وماله، وعرضه-

"প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম।"[৬৭২] ইসলাম অনর্থক রক্ত ঝরানোকে অনুমোদন করে না। এজন্য রাসূল (স.) যুদ্ধে যাওয়ার সময় সেনাপতিদেরকে এ বলে উপদেশ দিতেন:

لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولاطفلا ، ولا صغيرا ، ولا امرأة

"তোমরা বৃদ্ধ, শিশু এবং নারীদেরকে হত্যা না করে।"[৬৭৩]

কোন এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে রাসূল (স.) রণাঙ্গনে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন।"[৬৭৪] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

من حمل علينا السلاح فليس منا

"যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের দলভূক্ত নয়।"[৬৭৫]

তিনি বলেন, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া ফাসেকি এবং হত্যা করা কুফরি।"[৬৭৬] উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসের আলোকে বলা যায়, ইসলাম সন্ত্রাবাদকে কখনো সমর্থন করে না। এর পরিণতি জাহান্নাম। কিছু চরমপন্থী ব্যক্তি জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজে অশান্তি ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। তাদের এধরনের চরমপন্থী কর্মকান্ডকে

---

৬৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন হোসাইন ইব্ন সাঈদ আল সুফরান আল-কাহতানী সংকলিত ও ড. সালেহ ইব্ন ফাওযানুল ফাওযান সম্পাদিত, *ফাতওয়াল মাইন্নাহ ফিল নাওয়া যিল আল-মুদলাহাম্মাদ* (মাকতাবাতু রিয়াদ, ১৪২৪ হি.), পৃ. ১৪ উদ্ধৃত, *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, পৃ. ৩০-৩১

৬৭০. প্রাগুক্ত, *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, পৃ. ৩১

৬৭১. *সহীহ বুখারী*, বাবু আল খুতবাতি আইয়ামি মিনা (মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ১৬২৩, ১৬২৫, ১৬২৬; *সহীহ মুসলিম*, বাবু হুজ্জাতুন নাবিয়্যি (স.) (মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ২১৩৭

৬৭২. *সহীহ মুসলিম*, (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৪৬৫০

৬৭৩. *মা'আরিফাতুস সুনানি ওয়াল আসারি লিল বাইহাকি*, বাবু মা-যা-আ ফি কাতলিন (মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৫৬৪৩

৬৭৪. *মুসান্নাফ ইব্ন আবি শাইবাহ* (মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), খ. ৭ম, হাদিস নং. ১৪

৬৭৫. *সহীহ বুখারী*, (মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৬৩৬৬, ৬৫৪৩ ও ৬৫৪৪

৬৭৬. *সহীহ বুখারী*, (মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৪৬, ৫৫৮৪ ও ৬৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। রাসুল (স.) বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মূসা আশ'আরী ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) কে ইয়ামানে প্রেরণকালে নিম্মোক্ত উপদেশ দেন:

بَشرُوا وَلَا تُنَفرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسرُوا

"মানুষকে সুসংবাদ দিবে, হতাশাগ্রস্ত করবে না আর সহজপন্থা অবলম্বন করবে, চরমপন্থা অবলম্বন করবে না।"[৬৭৭] অতএব চরমপন্থা অবলম্বন করে ইসলামের নামে বোমাবাজি করে জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা ইসলামে স্বীকৃত নয়। চরমপন্থীদের এ ধরনের কর্মকান্ড সম্পর্কে শায়খ আবদুল মুহসিন আল-আব্বাদ যথার্থই বলেছেন:

وبأى عقل ودين يكون جهادا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الأمنيين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المبانى على من فيها؟!

"সাধারণ মানুষ, মুসলমান ও জিম্মীদেরকে হত্যা করা, নিরাপদ লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা, মহিলাদেরকে বিধবা করা, শিশুদেরকে ইয়াতিম করা এবং স্থাপনা ধ্বংস করা কোন জ্ঞান ও দ্বীনের আলোকে জিহাদ।! "[৬৭৮] সৌদী আরবের উচ্চতর উলামা পরিষদের আরেক ফতোয়ায় বলা হয়েছে:

إن الإسلام برئ من هذا المعتقد الخاطئ- وأن مايجرى فى بعض البلدان من سفك للدماء البريئة، وتفجير للمساكن والمركبات، والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي، والإسلام، برئ منه.

"ইসলামের সাথে এহেন ভ্রান্ত আকীদার কোনই সম্পর্ক নেই। বরং কতক মুসলিম দেশে যা কিছু ঘটছে, নিরপরাধীদের রক্তপাত, বাসস্থান ও গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো, স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করা ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকান্ড। আর ইসলাম এ থেকে মুক্ত।"[৬৭৯]

জিহাদ ও কিতাল

ইসলামের অন্যতম ইবাদাত 'জিহাদ'। জিহাদ শব্দটি আরবি جهد শব্দ হতে উদ্ভূত। যার আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করা বা চরম প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদী।[৬৮০] পারিভাষিক অর্থ হল: আল্লাহর বিধান সংরক্ষণ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা। তার জন্য মরণপণ লড়াইয়ে নিয়োজিত হওয়া এবং এতদুদ্দেশ্যে নিজের যাবতীয় শক্তিকে নিয়োজিত করা।[৬৮১] মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকা থেকে শুরু করে ইসলামি আন্দোলনের সব পর্যায়ে যা কিছু করা হয়, তা সবই জিহাদের শামিল। এমনকি এক পর্যায়ে অস্ত্র নিয়ে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করারও দরকার হতে পারে। সাধারণত এ লড়াইকেই চূড়ান্ত জিহাদ মনে করা হয়। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। এ লড়াই অবশ্য জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জিহাদ বললে শুধু এ লড়াই বুঝায় না। লড়াই-এর জন্য আল কুর'আনে আরেকটি পরিভাষা রয়েছে-তা হল 'কিতাল'। কিতাল মানে মুখোমুখি লড়াই করে একে অপরকে মারা বা কতল করার চেষ্টা করা। পারিভাষিক কিতাল হল শত্রুরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ। মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রু সাধারণত 'কাফির' বা 'অমুসলিম' হয়। পারিভাষিক কিতাল 'ধর্মযুদ্ধ' বা 'পবিত্র যুদ্ধ' নয় বরং এর অর্থ 'রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ'।[৬৮২] পারিভাষিক কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য ইসলামে চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

---

৬৭৭. *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফিল আমরি বিত্তায়াস্সিরি, পাণ্ডক্ত, হাদিস নং. ৩২৬২

৬৭৮. আবদুল মুহসিন আল-আব্বাদ, *বিআইয়ি আকলিন ও দ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীর ওয়াত তাদমীর জিহাদান*, (রিয়াদ: দারুল মুগনী, ১৪২৪ হি.), পৃ. ১৬; উদ্ধৃত, *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, পৃ. ৩৩

৬৭৯. ফাতাওয়াল মাইম্মাহ ফিন নাওয়াযিল মাল-মুদলাহাম্মাহ, পৃ. ১৩৮; উদ্ধৃত, *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, পৃ.৩৩

৬৮০. *কুর'আন ও হাদীস সঞ্চয়ন*, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ৮৫

৬৮১. ড. খোন্দকার আব্দুলণ্ঢাহ জাহাঙ্গীর, *খুৎবাতুল ইসলাম* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০৮), পৃ. ৩৩৫

৬৮২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম শর্ত: ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

দ্বিতীয় শর্ত: আক্রান্ত বা অত্যাচারিত হওয়া। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইসলাম জিহাদের অনুমতি প্রদান করেনি। রাসূলে আকরাম (স.) সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এভাবে এক পর্যায়ে মদিনার অধিকাংশ জনগণ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলে আকরাম (স.) কে তারা তাদের রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশেষে সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অত্যাচারি কাফিররা এ শিশু রাষ্ট্রটিকে গলাটিপে হত্যা করার জন্য চারিদিক থেকে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়; তখন আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে আয়াত নাযিল করলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

''যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।''[৬৮৩] এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্র বা তার নাগরিকগণ অন্য কোন রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে জিহাদ বৈধ।

তৃতীয় শর্ত: রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ও নেতৃত্ব। কোন অবস্থাতেই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি জিহাদের ঘোষণা বা অনুমতি প্রদান করতে পারে না। রাসূলে আকরাম (স.) বলেন:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ

"রাষ্ট্র প্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[৬৮৪]

চতুর্থ শর্ত: শুধু সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাথেই যুদ্ধ করতে হবে।[৬৮৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। সীমালঙ্ঘন করবে না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"[৬৮৬] এ নির্দেশের মাধ্যমে আল কুর'আন যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ বস্তুতে আঘাত করা, বেসামরিক মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বা গোষ্ঠীয় সকল সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। এমনকি যোদ্ধা টার্গেটের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে শত্রুপক্ষ সন্ধির প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলে আকরাম (স.) বলেন: "যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নিবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, কোন মানুষ বা প্রাণির মৃত দেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোন শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোন মহিলাকে হত্যা করবে না, কোন সন্নাসী বা ধর্মজাযককে হত্যা করবে না, কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোন অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোন জনপদ ধবংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোন প্রাণি বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোন গাছ কাটবে না।"[৬৮৭] তবে হক ও বাতিলের লড়াই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাই সত্যের পথের সৈনিকরা কিয়ামত পর্যন্ত তাগুত তথা আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখবে। রাসূলে আকরাম (স.) বলেছেন:

الجهاد ماض إلى يوم القيامة

---

৬৮৩. *আল কুর'আন*, ২২:৩৯

৬৮৪. সহীহ বুখারী, বাবু ইউকাতিল মিন ওয়ারা-ইল ইমামি (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ২৭৩৭

৬৮৫. *খুতবাতুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

৬৮৬. *আল কুর'আন*, ০২:১৯০

৬৮৭. *আস্‌সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি* (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), খ. ০৯, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

"জিহাদ অতিতেও ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।"[৬৮৮]

জিহাদ ও সন্ত্রাসের আদর্শগত পার্থক্য

সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্য হলো পার্থিব সম্পদ অর্জন, ক্ষমতা দখল ও ভোগ, স্বজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, ভিন্ন জাতিকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রাখা এবং নিজ দেশের পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা ইত্যাদি। লক্ষ্যের দিক দিয়ে এসব কখনো মহৎ হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য হলো মানবতার মুক্তি, যুল্‌মের অবসান, সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং ইনসাফ কায়েম করা। পারস্যের সেনাপ্রধান রুস্তম যখন মুসলিম সেনাপতি রিবয়ী ইব্‌ন আমেরকে মুসলিমগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল তখন তিনি তার জবাবে বলেছিলেন:

نحن قوم أخرجنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الأحد ومن جور الأديان الى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة۔

"আমরা এমন এক জাতি, আমাদেরকে আল্লাহ এজন্য প্রেরণ করেছেন যে, যেন আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বাধীন করে দেই। ধর্মের শোষণ থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের সুশাসন দান করি। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে পরকালের বিশালতার দিকে নিয়ে যেতে পারি।"[৬৮৯] বলাবাহুল্য এটাই ইসলামের জিহাদ।

জিহাদ ও সন্ত্রাসের প্রক্রিয়াগত পার্থক্য

সন্ত্রাসবাদীরা যখন কোন দেশ জয় করে তখন সেখানে হিংস্রতার তান্ডব চলে। শহরের মূল্যবান স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করে দেয়া হয়, ধন-সম্পদ লুটে নেয়া হয়। অধিবাসীদের গোলামে পরিণত করা হয়। মহিলাদের ইয্‌যত-আব্রু হরণ করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে জিহাদের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি-স্বস্তি ও শৃংখলা। বলবৎ হয় আইনের শাসন। মক্কা বিজয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মক্কা ছিল মহানবী (স.) এর জন্মস্থান। জীবনের অর্ধেকেরও বেশি প্রায় ৫৩ বছর পর্যন্ত তিনি এখানেই কালাতিপাত করেছেন। সে মক্কা থেকে রাসূলে কারিম (স.) কে বহিস্কৃত হয়ে মদীনায় নির্বাসিত জীবন-যাপন করতে হয়েছিল। তিনি মক্কা জয় করলেন, লাভ করলেন তার উপর নিজের কর্তৃত্ব। তখন তিনি অপরাধীদের উপর যে কোন প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কোথাও বাধা দেয়ার মতো কেউ ছিল না। তিনি মক্কার লোকদের জিজ্ঞেস করলেন: ما تظنون انى فاعل بكم۔ "আমি তোমাদের প্রতি কী ব্যবহার করবো বলে তোমরা মনে করো?" তারা লজ্জাবনত কণ্ঠে বললো, আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই, সম্মানিত ভাইয়ের পুত্রও! তখন নবী কারিম (স.) ঘোষণা করলেন, আমি আজ তোমাদের সে কথাই বলবো, যা হীন ষড়যন্ত্রকারী ভাইদের উপর বিজয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন:

لاتثريب عليكم اليوم، يغفر الله لى ولكم وهو أرحم الرحمين۔ اذهبوا فأنتم الطلقاء۔

"আজ তোমাদের উপর আমার কোন আক্রোশ বা প্রতিশোধস্পৃহা নেই। আল্লাহ আমাকে এবং তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাধিক দয়াবান। যাও, তোমরা আজ সম্পূর্ণ মুক্ত ও আযাদ।"[৬৯০]

---

৬৮৮. *তাফসির ফি যিলালিল কুর'আন* (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৪৪০

৬৮৯. حقيقة التوحيد. د. يوسف القرضاوى. مكتبة وهبة. القاهرة ; উদ্ধৃত, *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৬৯০. *আর রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য চরম লাঞ্ছনাকর

সাধারণ যুদ্ধে নারী-শিশু, বৃদ্ধ-সন্ন্যাসীসহ সামরিক-বেসামারিক অসংখ্য বনি আদমকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। জনপদ ধ্বংস করে দেয়া হয়, ক্ষেত-খামার ও গাছপালা লন্ডভন্ড করে দেয়া হয়। কিন্তু জিহাদের প্রক্রিয়া ভিন্ন। তা মহৎ এবং সভ্য। মানবতার লাঞ্ছনা সেখানে নেই। ইসলাম মানুষের যুদ্ধ করার স্বভাবজাত প্রবৃত্তিকে সংস্কার ও সংশোধন করেছে। সশস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণে মহানবী (স.) বলেছেন:

১. انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله ঃ "আল্লাহর নাম নিয়ে, রাসূল (স.) এর আদর্শ ধারণ করে যাত্রা করো।"

২. لاتقتلوا شيخا فانيا ঃ "বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করো না।"

৩. ولا طفلا صغيرا ঃ "ছোট শিশুকে হত্যা করো না।"

৪. **ولا امرأة** ঃ "কোন মহিলাকে হত্যা করো না।"

৫. **ولا تغلوا** ঃ "মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করো না।"

৬. **ولا تغرروا** ঃ "গাদ্দারী করো না।"

৭. **ولا تمثلوا** ঃ "লাশ বিকৃত করো না।"

৮. واحسنوا إن الله يحب المحسنين ঃ "সদ্ব্যবহার করো, আল্লাহ সদয় আচরণকারিদের পছন্দ করেন।"

৯. ولا تقتلوا المكفوفين ঃ "অন্ধদেরকে হত্যা করো না।"

১০. **المنازل** ولا تهدموا ঃ "ঘর-বাড়ি ধ্বংস করো না।"

১১. **ولا أصحاب الصوامع** ঃ "উপাসনালয়ের কোন মানুষকে হত্যা করো না।"

১২. **ولا تقطعوا الأشجار** ঃ "গাছপালা কেটে ফেলো না।"

১৩. **استوصوا بالأسرى** خيرا ঃ "কয়েদিদের প্রতি সদয় হও"।

আমিরুল মু'মিনিন হযরত আবু বকর (রা.) আরো উপদেশ দিয়ে বলেছেন:

১৪. ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ঃ "খেজুর গাছ কাটবে না, জ্বালাবে না এবং ফল গাছও কাটবে না।"

১৫. **ولا تذبحوا شاة** ولا بقرة ولابعيرا إلا لماكله ঃ "খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া ছাগল, গরু ও উট বধ করবে না।" এ হলো ইসলামি জিহাদের আদর্শিক ও মানবতাবাদী রূপ।[৬৯১]

ইসলামী জিহাদ ন্যায়নীতিতে পরিপূর্ণ

হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত এ জিহাদ কাফির বা সত্য-প্রত্যাখানকারীদের দূরে ঠেলে দেয়নি, বরং কাছে টেনে নিয়েছে। উহুদের যুদ্ধে যে হিন্দা নামের মহিলা রাসূল (স.) এর প্রিয় চাচা হামযা (রা.) নিহত হওয়ার পর তাঁর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল তাকে রাসূল (স.) ক্ষমা করতে দ্বিধা করেননি। হামযার হত্যাকারী ওয়াহশীকেও তিনি ক্ষমা করেছিলেন। ইসলামের যুদ্ধনীতি সর্বোচ্চ মানবিকতাবোধসম্পন্ন। ইসলাম যেসব ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করে সেসব ক্ষেত্রেও যুদ্ধকে সর্বোচ্চ নৈতিক আচরণ দ্বারা বিধিবদ্ধ করে দেয়। রাসূল (স.) যখন কোন সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠাতেন তখন তিনি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে প্রথমে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন- "আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে অভিযান শুরু করো। আল্লাহর প্রতি যারা কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু যুদ্ধে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদ ভঙ্গ করো না, গনীমাতের মাল আত্মসাৎ করো না,

৬৯১. *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

লাশ বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না।[৬৯২] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: استوصوا بالأسارى خيرا "তোমরা যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদাচার করবে।"[৬৯৩]

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) যখন সিরিয়ায় সৈন্য পাঠান তখন তাদেরকে দশটি নির্দেশ দিয়ে দেন। সকল ঐতিহাসিক ও হাদিস বিশারদগণ সে নির্দেশগুলো উদ্ধৃত করেছেন। সে নির্দেশ ছিল নিম্নরূপ:

১. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে কেউ যেন হত্যা না করে।
২. লাশ যেন বিকৃত করা না হয়।
৩. সন্ন্যাসী ও তপস্বীদের যেন কষ্ট দেয়া না হয় এবং কোন উপাসনালয় যেন ভাঙ্গা না হয়।
৪. ফলবান বৃক্ষ যেন কেউ না কাটে এবং ফসলের ক্ষেত যেন পোড়ানো না হয়।
৫. জনবসতিগুলোকে (সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে) যেন জনশূন্য না করা হয়।
৬. পশুদের যেন হত্যা করা না হয়।
৭. প্রতিশ্রুতি যেন ভঙ্গ না করা হয়।
৮. যারা আনুগত্য স্বীকার করবে তাদের জান-মালকে মুসলমানদের জান-মালের মতো নিরাপত্তা দিতে হবে।
৯. গণিমতের সম্পত্তি যেন আত্মসাৎ করা না হয় এবং
১০. যুদ্ধে যেন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা না হয়।

উক্ত নির্দেশাবলী অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, ইসলাম যুদ্ধকে সকল হিংসাত্মক কর্মকান্ড থেকে পবিত্র করে দিয়েছিল। অথচ সে সময়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছিল যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একথা অত্যন্ত পরিস্কার যে, ইসলামে যুদ্ধের নির্দেশ সন্ত্রাসের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য, ফিতনা-ফাসাদকে উসকে দেয়ার জন্য নয়। জিহাদ সংক্রান্ত কুর'আনের নির্দেশগুলো প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের, আগ্রাসী যুদ্ধের নয়। কুর'আনে কখনোই বলা হয়নি আগে আক্রমণ করো।[৬৯৪]

সন্ত্রাস প্রতিরোধ

মহানবী (স.)-র আবির্ভাবের পূর্বে আরবসহ গোটা বিশ্বের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। সর্ব প্রকার অন্যায় এবং সন্ত্রাসই তৎকালিন বিশ্বে বিরাজমান ছিল। সন্ত্রাস নির্মূলের মহান লক্ষ্যেই আল কুর'আন নাযিল শুরু হয়। মহানবী (স.) ছিলেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপোসহীন। তিনি সারা জীবন কঠোর সংগ্রাম করেছেন বিশ্ব থেকে সকল প্রকার সন্ত্রাস নির্মূল করতে।[৬৯৫] কাফিরদের অত্যাচারে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সেখানে বসবাসকারী সকল ধর্মাবলম্বীদের সাথে তিনি এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে Charter of Madina নামে খ্যাত। সাতচল্লিশটি ধারা সম্বলিত এ সনদ সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের এক অনন্য দলিল। যেমন এর একটি শর্তে বলা হয়েছে: "তাকওয়া অবলম্বনকারী ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীদের হাত সমবেতভাবে ঐসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হবে, যারা বিদ্রোহী হবে অথবা বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যায়, পাপাচার, সীমালঙ্ঘন, বিদ্বেষ অথবা দুর্নীতি ও ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে তৎপর হবে। তারা সকলে সমভাবে তার

৬৯২. *আস্‌সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*, প্রাগুক্ত

৬৯৩. প্রাগুক্ত

৬৯৪. *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

৬৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে যদিও সে তাদেরই কারো আপন পুত্রও হয়ে থাকে।"[৬৯৬] এ সনদে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য নিম্নবর্ণিত ধারাসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল। যথা:

১. মদিনায় রক্তক্ষয় এবং অন্যায় নিষিদ্ধ করা হলো।

২. চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ই বাইরের কোন শত্রুর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

৩. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৪. মুসলিম ও অমুসলিম বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারোর ব্যক্তিগত ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ইত্যাদি। এভাবে শুরু হয় মদিনার জীবনে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে ইসলাম প্রয়োজন মাফিক কার্যকরি ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার নমুনা স্বরূপ উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপের আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে আগে বিবেচনা করতে হবে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ কি এবং তা অপসারণ করা যায় কিভাবে। এ বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণকে বলা হয় 'প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা'। কথায় আছে 'Prevention is better than cure' অর্থাৎ রোগ সারানোর চেয়ে রোগের প্রতিরোধই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নিম্নে সন্ত্রাস দূরীকরণে প্রতিরোধমূলক কয়েকটি ব্যবস্থা উল্লেখ করা হলো: [৬৯৭]

কৌশলে বুঝানো :

সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদেরকে হিংসা করে ও হুমকি না দিয়ে তাদের উপলব্ধিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। অপরাধের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে তাদের মধ্যে অপরাধবিরোধী মানসিকতা গঠন করতে হবে। আল কুর'আনের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসীরা যে ভুল পথে আছে একথা তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে বোঝাতে হবে। তাদেরকে দমনে শুরুতেই এমন কঠোরপন্থা গ্রহণ করা অনুচিত যাতে চরমপন্থা বেড়ে যায়।

প্রথমে মতৈক্যের সুত্র ধরে আলোচনা শুরু করতে হবে :

রাসূল (স.) পাপাচারীকে চিকিৎসকের দৃষ্টিতে দেখতেন যেমন রোগীকে দেখা হয়। পুলিশের মতো তিনি অপরাধীকে দেখতেন না। অন্ধকারকে অভিশাপ দেয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত রাস্তায় বাতি লাগানোর চেষ্টা করা।

ত্বরিত ফলাফল লাভের চিন্তা কাম্য নয় :

সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের বুঝানো উচিত, আজ ফসল বুনে কালই তা কাটতে চাওয়া বোকামী। কেননা আল্লাহর সৃষ্টির রীতি অনুযায়ী এরূপ দ্রুত কোন কিছু পাওয়ার কোন অবকাশ নেই। গাছ থেকে ফল আহরণ করতে হলে এর পর্যায়ক্রমকে অতিক্রম করতে দিতে হবে। ঝাঁপ দেয়ার আগে চিন্তা করার কথা ভুলে গেলে চলবে না। সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত কৌশল সহকারে জাতীয় বিষয়াবলী সংশোধনে সচেষ্ট না হয়ে কেবল জীবন কুরবানি করলেই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না।

ইসলাম নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন জরুরি :

---

৬৯৬. *হযরত রাসূলে করিম (সা.) ঃ জীবন ও শিক্ষা*, সম্পাদনায় ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা: ই. ফা. বা. মে ১৯৯৭), পৃ. ৩১৮

৬৯৭. *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

এ প্রসঙ্গে হযরত 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) বলেছেন- "আমরা নিকৃষ্টতম জাতি ছিলাম। কিন্তু আল কুর'আনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। যদি আমরা আল কুর'আনকে বাদ দিয়ে অন্য পন্থায় মর্যাদা হাসিল করতে চাই তবে আল্লাহ আমাদের গোড়া কেটে দেবেন।"

ইনসাফ বা ন্যায় বিচার ভিত্তিক ব্যবস্থা :

কোন গোষ্ঠীর একজন বা কয়েকজন কোন দোষ করলে তা সেই গোষ্ঠীর সকলের দোষ বলে চাপানো যাবেনা যে দোষ করে কেবল সেই শাস্তি পাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

'কেউ অন্য কারো বোঝা বহন করবেনা।'[৬৯৮] ন্যায় নিষ্ঠ বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতিই মূলত: সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করা :

ইসলামের দেওয়ানী আইন সব মানুষের সাথে ন্যায়-নীতি ও হকের ভিত্তিতে আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে ধনী-গরীব, সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-প্রজার কোন ভেদাভেদ করা যাবে না। বরং আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। আল্লাহর বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়-বিচারে দৃঢ় থাকবে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে, যদিও তা নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর বন্ধু। তোমরা ন্যায়-বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা পাশ কেটে চল, তবে জেনে রেখো যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।"[৬৯৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনও সুবিচার করতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।"[৭০০]

সন্ত্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের মূলোৎপাটন

এ বিষয়গুলো সম্পর্কে শুরুতেও আলোচনা করা হয়েছে এরপরও আলোচ্য অধ্যায়ের বাস্তবতা অনুধাবন করে সংক্ষেপে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো:

ব্যভিচারের মূলোৎপাটন:

যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ এগুলো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। আর এসব থেকে হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

৬৯৮. *আল কুর'আন*, ০৬:১৬৪

৬৯৯. *আল কুর'আন*, ০৪:১৩৫

৭০০. *আল কুর'আন*, ০৫:০৮

Dhaka University Institutional Repository

"ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত খারাপ পন্থা।"[৭০১]
ব্যভিচারকে নিকৃষ্ট বলার সাথে সাথে তা প্রতিরোধের জন্য শাস্তির বিধানও বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

"ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত কর।"[৭০২] এ বিষয়ে রাসূল (স.) বলেন:

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"ব্যভিচারী অবিবাহিত নারী-পুরুষকে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে। আর বিবাহিত নারী-পুরুষকে রজম করতে হবে। তাকে প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করতে হবে।"[৭০৩]
আজকের সমাজ এবং রাষ্ট্রে যত ধরনের অন্যায় হচ্ছে এর বেশির ভাগই ব্যভিচার সংক্রান্ত। আজকের পত্রিকাগুলো খুললেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে ধর্ষণের মত জঘন্য পাপকাহিনীর সংবাদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেরও একই চিত্র। আজকে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র যেন এ অপরাধ দমনে ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন। এর থেকে উত্তরণের জন্য কোনো পথই যেন তাদের সামনে খোলা নেই। এক্ষেত্রে উত্তরণের যে একটাই পথ ও পথনির্দেশ রয়েছে, তা আজকে সকলের যথাযথ বুঝা দরকার। আর তা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের নির্দেশ মেনে সমাজ ব্যবস্থা চালু করা। রাসূল (স.) এ কুর'আনের মাধ্যমেই কিন্তু ভয়ঙ্কর আইয়ামে জাহিলিয়াতের সমস্ত অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও পাপাচার দূরিভুত করেছিলেন। সে সমাজতো আজকের এ সমাজ থেকেও বীভৎস ছিল। সেটাই যেহেতু পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে, সুতরাং আজকের এ সমাজ আরও সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব।

সুদকে হারাম ঘোষণা:

সুদ আদান ও প্রদান উভয়ই ইসলামে গর্হিত অপরাধ। সুদ আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে মানুষ অনেক সময় সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ সুদ সম্পর্কে বলেন:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

" আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[৭০৪] তিনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।"[৭০৫] রাসূল (স.) সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেছেন:

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

"সুদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তারমধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে নিজ মায়ের সাথে সংগম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ।"[৭০৬]

ঘুষকে হারাম ঘোষণা:

এটিও সুদের মতো গর্হিত কাজ। ইসলামে ঘুষ আদান-প্রদান উভয়ই নিষিদ্ধ। কারণ ঘুষ আদান-প্রদানের ফলে সমাজ থেকে ন্যায়বিচার লোপ পায়, তখন স্বভাবতঃই অবিচার ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে প্রকৃত অপরাধী অর্থ ও বাহুবলে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় এবং নিঃস্ব, অসহায়, নিরপরাধ মানুষকে সাজা

---

৭০১. *আল কুর'আন*, ১৭:৩২

৭০২. *আল কুর'আন*, ২৪:০২

৭০৩. *সহীহ মুসলিম*, বাবু হাদ্দিয্যিনা (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৩১৯৯

৭০৪. *আল কুর'আন*, ০২:২৭৫

৭০৫. *আল কুর'আন*, ০৩:১৩০

৭০৬. *ইব্ন মাজাহ*, বাবু আত-তাগলিয ফির-রিবা (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ২২৬৫

ভোগ করতে হয়। তাই বলা যায় ঘুষের অন্তরালে রয়েছে সন্ত্রাসের বীজ লুক্কায়িত।[৭০৭] এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা এবং মানুষের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা হাকিমগণের নিকট পেশ করো না।"[৭০৮]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

মহানবী (স.) বলেন: "ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের উপর অভিসম্পাত।"[৭০৯]

অত্যাচারের মূলোৎপাটন:

অত্যাচার ও সন্ত্রাস এক-ই সুতোয় গাঁথা। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারই হলো সন্ত্রাস। অত্যাচারী মানুষকে অন্য মানুষেরা ভয় পায়, যেরূপ সন্ত্রাসীকে অন্যরা ভয় করে। আল কুর'আনে অত্যাচারকে হারাম করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৭১০] নবী কারিম (স.) এ সম্পর্কে বলেন:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হে মানব মন্ডলী তোমরা অত্যাচার থেকে সাবধান থেকো। নিশ্চয় অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে।"[৭১১] তিনি আরো বলেন:

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ

"যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধ হাত জমি দখল করবে নিশ্চয় কিয়ামতের দিন অনুরুপ সাতটি জমি তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।"[৭১২] রাসূল (স.) আরো বলেন:

"নিশ্চয় নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অধিনস্ত জনগণের প্রতি অত্যাচার করে।"[৭১৩] এভাবে পবিত্র কুর'আন ও হাদিসে অত্যাচারের ভয়াবহতা সর্ম্পকে বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ অত্যাচার থেকে সন্ত্রাস জন্ম লাভ করে। পক্ষান্তরে অত্যাচার সন্ত্রাসের একটি শাখা। সুতরাং অত্যাচার সংক্রান্ত এসব বাণীই প্রমাণ করে ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই।

চুরি ও ডাকাতি বন্ধ:

---

৭০৭. *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৭০৮. *আল কুর'আন*, ০২:১৮৮

৭০৯. *ইব্ন মাজাহ* (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা. বি.), হাদিস নং. ২৩০৪

৭১০. *আল কুর'আন*, ৪২:৪২

৭১১. *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাহরীমুজ্ যুল্মি, হাদিস নং. ৪৬৭৫

৭১২. *মুসনাদু আহমাদ* (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৯২১২; মুসলিম, হাদিস নং. ৩০২০

৭১৩. *আল-মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং. ৩৬৮৮

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এগুলোর সাথেও সন্ত্রাসের সম্পৃক্ততা রয়েছে। কারণ এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সন্ত্রাসের বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। আর আল কুর'আন তার প্রাথমিক যুগ হতে এ চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আল কুর'আন এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সমাজ থেকে সন্ত্রাস-দুর্নীতি নির্মূল করার লক্ষ্যেই। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে দাও, এ তাদের কর্মফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত দন্ড, বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৭১৪] আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি হল হত্যা করা হবে বা ক্রশবিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[৭১৫] মহানবী (স.) এ সম্পর্কে বলেন:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"যিনাকারী যখন যিনা করে তখন সে মু'মিন থাকে না, মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে মু'মিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকে না, ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে মানুষ তার দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে তখন সে মু'মিন থাকে না।"[৭১৬]

হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর যুদ্ধ বিগ্রহ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল সম্পূর্ণ প্রতিরোধমূলক। সে সব যুদ্ধে সর্ব সাকুল্যে মুসলিম কাফির সব মিলে এক হাজার আঠার জন লোক নিহত হয়।[৭১৭] যে দেশে প্রতি মাসেই মারামারি করে সহস্রাধিক মানুষ গড়ে খুন হত, সেখানে মাত্র সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে তিনি বিশ্বব্যাপী চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।[৭১৮] পক্ষান্তরে শুধু বাইবেলের বর্ণনায় একেক যুদ্ধেই ৪০/৫০ হাজার থেকে কয়েক লক্ষ 'কাফির' হত্যার গৌরবময় (!) বিবরণ লেখা রয়েছে।[৭১৯] শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধেই নয় ভিন্নমতাবলম্বী খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধেও ক্রুসেড চালিয়েছেন খ্রিষ্টান ধর্মগুরু পোপগণ এবং একেক যুদ্ধে তারা নির্মমভাবে লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করেছেন।[৭২০] অনুরুপভাবে ইয়াহুদীদের ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাসও ভয়ংকর ইতিহাস। এদিকে রামায়ণ, গীতা ও মহাভারতে উল্লেখিত যুদ্ধের বিবরণও ভয়ংকর। এসব ধর্মগ্রন্থগুলোতে ভিন্নমত দলনে যত ইচ্ছা হত্যার সুযোগ দেয়া হয়েছে।[৭২১] কিন্তু এক্ষেত্রে মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের বক্তব্য হচ্ছে:

---

৭১৪. *আল কুর'আন*, ০৫:৩৮

৭১৫. *আল কুর'আন*, ০৫:৩৩

৭১৬. *সহীহ বুখারী* (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ২২৯৫, ৫১৫০, ৬২৭৪, ৬২৮৪, ৬৩১২; *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং. ৮৬, ৮৭

৭১৭. *খুৎবাতুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

৭১৮. প্রাগুক্ত

৭১৯. প্রাগুক্ত

৭২০. প্রাগুক্ত

৭২১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নাই।"[৭২২]

একটি গুরুতর অভিযোগ খন্ডন

আজকের পাশ্চাত্যের একদল অমুসলিম গবেষক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর যুদ্ধনীতির সমালোচনা করার সুযোগ খোঁজেন। অথচ তিনিই পৃথিবীর একমাত্র সমর নায়ক যিনি ঐতিহসিক মক্কা বিজয় করলেন বিনা রক্তপাতে বরং রক্তপাতকে তিনি হারাম ঘোষণা করলেন। আল্লাহ কাউকে বিনা দোষে হত্যা করাকে গোটা জাতিকে হত্যা করার মত পাপ বলে পবিত্র কুর'আনে বলেছেন।[৭২৩]

জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি

আল কুর'আনের শত্রুরা সবচেয়ে বেশি অপপ্রচার চালিয়েছে জিহাদ সম্পর্কে যার সাথে আল কুর'আনী আদর্শের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও বিকাশ নিবিড়ভাবে জড়িত। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী পন্ডিতেরা জিহাদকে একটি ধর্মযুদ্ধ বা ধর্মান্ধতা বলে থাকে। তারা জিহাদের অপব্যাখ্যা করে পৃথিবীর একমাত্র শান্তি প্রিয় জাতি মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী বলে গালি দেয়। তারা যা প্রচার করছে এবং যা বলছে তাতে মনে হয় 'বিরাট আল খেল্লা পরিহিত, লম্বা দাড়ি, টুপি ও পাগড়িওয়ালা কতগুলো বিভৎস চেহারার উন্মাদ লোক হাতে খোলা তরবারী, অস্ত্র ও বোমা নিয়ে আল্লাহর আইন চাই, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি স্লোগানসহ ইসলামের প্রচারপত্র সাথে নিয়ে চলছে আর নির্বিচারে কাফির হত্যা করছে।' আল কুর'আন ও জিহাদ সম্পর্কে এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যাচার আর কিছুই নেই। আজ আল কুর'আনের শত্রুদের হাতে রয়েছে মিডিয়ার অত্যাধুনিক অস্ত্র আর মুসলিমগণ এর নির্মম শিকার। যে কুর'আন অসংখ্য বনি আদমকে সভ্যতার আবরণ পরালো, অশিক্ষিত মূর্খদের মুখে তুলে দিল জ্ঞানের আলোকচ্ছটা, হাজার দেবতার সামনে নত শির মানুষকে করল উন্নত শির, খুন সন্ত্রাসের বিপরীতে নিয়ে এলো মানবতা ও নিরাপত্তা; সে আল কুর'আনকে ও ইসলামকে জঙ্গিবাদের অপবাদ মূলত: একটি অমানবিক অপবাদ। মাওসেতুং এর নেতৃত্বে সংগঠিত চৈনিক বিপ্লবে ১ কোটি ৫০ লাখ লোক নিহত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছিল লেলিনের নেতৃত্বে পরিচালিত রুশ বিপ্লবের সময়, এ সময় ২ কোটি ৫০ লাখ লোক নিহত হয়েছিল। অথচ ঐতিহাসিক মক্কাবিজয়ের সময় গোটা মুসলিম বাহিনীর হাতে ১০ জন লোকও নিহত হয়নি। তবুও মুসলিমদের ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে। আর কুর'আনের দুশমনদের ইতিহাস থেকে আসে ফুলের সুবাস! [৭২৪]

বর্তমান সমস্যা সঙ্কুল বিশ্ব

পরাশক্তির স্বেচ্ছাচারিতা তথা জোর যার মুল্লুক তার (Might is right)

জোর যার মুল্লুক তার বিশ্ব শক্তিগুলোর এ মানসিকতা আজকের পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এনে দাড় করিয়েছে। আজকে গোটা পৃথিবীর বিবেকবান সকল জনগোষ্ঠীর সামনে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বর্বর ইসরাঈলি ইয়াহুদী জাতি নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের উপর যেভাবে হামলা করছে এতে মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি কোন বিবেক বান শক্তি নেই যে, ইসরাঈলের এ বর্বরতাকে রুখে দিতে পারে। আজকের পরা শক্তি আমেরিকা টুইন টাওয়ারে হামলার মিথ্যা অজুহাতে উসামা ইব্ন লাদেনকে ধরার নাম করে আফগানিস্তানে হামলা শুরু করে, সে তথা কথিত উসামাকে কবেই তারা নির্মমভাবে হত্যা করল কিন্তু সে

---

৭২২. *আল কুর'আন*, ০২:২৫৬

৭২৩. *আল কুর'আন*, ০৫:৩২

৭২৪. অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *বিশ্বশান্তির রোড ম্যাপ* (চট্টগ্রাম: মদীনা একাডেমী, মে ২০০৬), পৃ. ১০৮

আফগানিস্তানে এখনো তারা হামলা চালানো বন্ধ করলো না। সে আমেরিকাই ইরাকে জিবানু অস্ত্র থাকার অজুহাতে গোটা পৃথিবীবাসীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হামলা আরম্ভ করে এক পর্যায়ে যখন প্রাচীন সভ্যতার নগরী বাগদাদসহ গোটা ইরাককে তছনছ করে দেয়া হল তখন সে বর্বর আমেরিকাই স্বীকার করলো যে, ইরাকে জীবানু অস্ত্র নেই। কিন্তু সে ইরাকে হামলা এখনো তারা থামালো না। এখনও সেখানে প্রতিদিন নিরপরাধ ইরাকবাসী তাদের বর্বর হামলার শিকার হচ্ছে। এখন আবার পায়তারা শুরু করেছে ইরানে হামলা চালানোর জন্য। এদিকে তথাকথিত গণতন্ত্রের দাবিদার ভারত দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিরস্ত্র কাশ্মিরিদের উপর বর্বর হামলা চালিয়ে আসছে এ হামলা যেন শেষ হবার নয় এবং পৃথিবীতেও যেন কেউ তা দেখার নেই। লিবিয়াসহ অসংখ্য দেশে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে গোটা বিশ্বের মুসলিমদেরকে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হচ্ছে। সর্বশেষ এ পরাশক্তি পৃথিবীবাসিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মিশরের ইতিহাসের একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্টকে উৎখাতকারি এবং স্মরণকালের ভয়াবহ গণহত্যা পরিচালনাকারী স্বৈরাচারি সেনা শাসককে নির্লজ্জভাবে সমর্থন জানিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার চরম পরিচয় দিয়েছে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতি ও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি

কিছু সংখ্যক অমুসলিম গবেষক রাসূলে আকরাম (স.)-কে যুদ্ধবাজ হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাঁর সময়কালে কত জন লোক যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে আর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জাপানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কত লক্ষ কোটি লোকের অন্যায় ভাবে প্রাণ কেড়ে নেয়া হয়েছে? এর পরিসংখ্যান উল্লেখ করলে এ কথা আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না যে, সর্বকালের সর্বসেরা মহামানব মুহাম্মাদ (স.) কতটা মানব দরদী ছিলেন এবং সকল ক্ষেত্রে সংঘাত এড়িয়ে চলেছেন। আর একমাত্র আল কুর'আনই ঐতিহাসিক গ্রন্থ যে গ্রন্থ পৃথিবীতে যাবতীয় রক্তপাত বন্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। আল কুর'আনের ঘোষণা:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"কেউ যদি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করল সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ যদি কারো জীবন রক্ষা করল সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল।"[৭২৫]

৭২৫. *আল কুর'আন*, ০৫:৩২

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল কুর'আনের কতিপয় দিক নির্দেশনা

আরবের মরুচারী বর্বর জাতি যাদের নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল হানাহানি, খুনাখুনি, রাহাজানি লুটতরাজ, হত্যা, ধর্ষণ, ব্যভিচার, অন্যায়, যুল্‌ম, নির্যাতন ও আপাদ মস্তক পাপাচারে লিপ্ত থাকা। সে আরবরা যে গ্রন্থের ছোঁয়ায় পৃথিবীর সর্বকালের সর্বসেরা সুসভ্য জাতিতে পরিণত হল তা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুর'আন। বিশ্বব্যাপী শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল কুর'আন কোন বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা হচেছ তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (বার্তাবহন) ও আখিরাত (পরকাল)।

তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা

আল্লাহ এক এবং একক। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক। তিনি ছিলেন তিনি আছেন এবং একমাত্র তিনিই থাকবেন। আর সৃষ্টি জগতের সব কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। মহাগ্রন্থ আল কুর'আনসহ পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থেই এ সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ বিশ্বাস যদি গোটা পৃথিবীবাসী যথাযথ লালন করতে পারে তাহলে পৃথিবীতে অচিরেই শান্তি নেমে আসবে। এ বিশ্বাস যদি কোন ব্যক্তি লালন করেন তবে তার দ্বারা কখনো অন্যায় কাজকে স্বীকৃতি দান কিংবা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কল্পনা করা যায় না। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসেই যে শান্তি আসে তার প্রমাণ: বিশ্বাসী অন্তর ভাল করেই জানে যে, সে যদি দুনিয়ার জীবনে ভাল কাজ করে, আল্লাহর হক ও বান্দার হকগুলো যথাযথভাবে আদায় করে তবে তার জন্য এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান। সে বিশ্বাস করে দুনিয়াতে ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে যদি তাকে কষ্টও করতে হয় এর বিনিময়ে জান্নাতে রয়েছে বিরাট পুরস্কার। কিন্তু যদি পাপাচারে লিপ্ত হয় তবে তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

"সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে আর দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে।"[৭২৬]

রিসালাতে বিশ্বাস

৭২৬. *আল কুর'আন*, ৮২:১৩-১৪

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দানের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী এবং রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহবানের সাথে সাথে এ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের প্রিয় নবী (স.) হিদায়াত (আল কুর'আন) এবং সত্য দ্বীন নিয়ে পৃথিবীতে এলেন। মানুষকে শান্তির পথের সুস্পষ্ট দিশা দিলেন। নবীর এ রিসালাতে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বাসই একজন মু'মিনকে নবী (স.) যা নিয়ে এসেছেন বা তিনি যা নির্দেশ প্রদান করেছেন তা গ্রহণ ও যার থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনে বলেছেন:

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"তোমাদের জন্য রাসূল (স.) যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর, আর যার থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।"[৭২৭] এর ফলে তার দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজই হবে অন্যায় কিংবা অশান্তির কাজ নয়।

আখিরাতে বিশ্বাস করা

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বশান্তির জন্যই মূলত ঐতিহাসিক আসমানী গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ আল কুর'আন নাযিল করেছেন। এর ত্রিশটি পারা বা অংশ রয়েছে। বিশ্বশান্তির জন্য পরকালিন বিষয়টা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ তা'আলা এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরকালিন বিষয় নিয়ে নাযিল করেছেন। সেখানে তিনি তাঁর বান্দার মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে সর্বশেষ পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ কিংবা তার আগেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। কিংবা জান্নাত জাহান্নাম কোনটাতেই প্রবেশ না করে আ'রাফ নামক স্থানে অবস্থান করা। সেখানে তাদের পরিণাম কি হবে? জান্নাতে তারা কেমন নাজ-নিয়ামাত, উপহার-উপঢৌকন লাভ করবে, কেমন সম্মান মর্যাদা তাদেরকে দান করা হবে, সেখানে তাদের মন-মানসিকতা কেমন থাকবে। অপরদিকে জাহান্নামে জাহান্নামিদেরকে কি ধরনের শাস্তি দেয়া হবে, সেখানে তাদের পরিণাম-পরিণতি কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ে স্ব-বিস্তারে বর্ণনা দিয়েছেন। এর থেকে একথা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরকালিন বিশ্বাস অন্তরে লালন করা প্রত্যেকের জন্য কতটা আবশ্যক। আর এ বিশ্বাস যদি প্রত্যেকে লালন করে তাহলে পৃথিবীতে কোন ধরনের অশান্তিই থাকবে না বরং এখানে বিরাজ করবে স্বর্গীয় শান্তি। আর আল্লাহ তা'আলা এ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ আল কুর'আন। একজন মু'মিন ব্যক্তি যখন চিন্তা করেন যে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে থরে থরে এমন পুরস্কার সাজিয়ে রেখেছেন যা কোন চক্ষু কোন দিন দেখেনি, কোন কান তার বর্ণনা শুনেনি, এমনকি কেউ অন্তর দিয়েও কল্পনা করেনি।[৭২৮] তখন সে দুনিয়ার যাবতীয় লোভ লালসা এমনিতেই ছেড়ে দেয়। আর কেউ যদি দুনিয়ার লোভ ছেড়ে দিতে পারে তাহলে তার দ্বারা পৃথিবীতে কখনো অন্যায় কিংবা অশোভন কাজ সম্ভব নয়। তার দ্বারা পৃথিবীতে কারো ক্ষতি কিংবা অধিকার হরণ হতে পারে না। বরং সে-ই পারে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে।

প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা করে দেয়া

তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গেলে সেখানকার শিশু-কিশোর ও উচ্ছৃংখল যুবকদের রাসূলে আকরাম (স.)-র পিছনে লেলিয়ে দেয়া হয়। তাদের নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে আঘাতে তাঁর পায়ের গোড়ালীতে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে যায়।[৭২৯] আল্লাহর নির্দেশে পাহাড় নিয়ন্ত্রণকারী

---

৭২৭. *আল কুর'আন*, ৫৯:০৭

৭২৮. *সহীহ বুখারী*, বাবু ফালা তা'লামু নাফসুন মা উখফিয়া লাহুম (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৪৪০৬ ও ৪৪০৭

৭২৯. মোঃ মোখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

ফিরিশতা রাসূল (স.) কে সালাম জানিয়ে বললেন, 'আপনি যদি চান তবে আমি তায়েফবাসীকে দুই পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি।' জবাবে রাসূল (স.) বললেন:

لَا أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

"না, বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।"[৭৩০] বদরের যুদ্ধে কাফিরদের ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দি হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) যুদ্ধবন্দিদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: استوصوا بهم خيرا- "ওদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।" 'আবু আযীয' নামক এক যুদ্ধবন্দী বলেন:

كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدر ، وكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم ، خصوني بالخبز ، وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا ، ما يقع في يد رجل منهم كسرة من خبز إلا أتحفني بها ، قال : فأستحي فأردها على أحدهم ، فيردها علي ما يمسها

"যখন মুসলিম সৈনিকগণ আমাকে বদর থেকে (মদিনায়) নিয়ে এলেন তখন আমি আনসারদের একটি গোত্রে অবস্থান করতাম। যখন তারা তাদের দুপুর ও রাতের খাবার গ্রহণ করতেন তখন আমাকে রুটি খেতে দিতেন, আর নিজেরা খেজুর খেতেন।[৭৩১] আমাদের ব্যাপারে রাসূল (স.) এর অসিয়তের কারণে তারা আমাদের সাথে এমন আচরণ করতেন। তাদের কেউ এক টুকরা রুটি পেলেও তা আমাকে দিয়ে দিতেন। আমার লজ্জা লাগতো তা গ্রহণ করতে, তাই আমি তা ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে দিতেন এবং নিজে তা স্পর্শও করতেন না।"[৭৩২] উল্লেখ্য, তখন মদিনায় খেজুরের চেয়ে রুটির মূল্য বেশী ছিল। বদরের যুদ্ধবন্দিদেরকে রাসূল (স.) ক্ষমা করে দেন এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তিপণ গ্রহণ করেন। যার দেয়ার মতো কিছুই ছিল না তাকে বিনা পণেই মুক্তি দেয়া হয়। এমনকি অনেককে আনসারদের ১০ জন শিশুকে শিক্ষা দেয়ার বিনিময়েও মুক্তি দেন।[৭৩৩] মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (স.) বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করলে কুরাইশদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। মহানবী (স.) বিজয়ে মদমত্ত হয়ে বিজিত শত্রুদের প্রতি কোন ধরনের দুর্ব্যবহার করেননি এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ প্রতিশোধস্পৃহাও প্রদর্শন করেননি। বরং প্রাণের দুশমনদের প্রতি ঘোষণা করেছেন ঐতিহাসিক ক্ষমা। এ সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে ঐতিহাসিক গীবন বলেছেন:

In the long history of the world there is no instance of magnanimity and forgiveness which can approach those of Muhammad when all his enemies lay at his feet and he forgave them one and all.

"মুহাম্মাদ (স.) পদানত সমস্ত শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়ে যে ঔদার্য ও ক্ষমাশীলতার আদর্শ স্থাপন করেছেন, জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই।"[৭৩৪] ইসলামের চির দুশমন আবু সুফিয়ানকে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স.) ক্ষমা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরো ঘোষণা করলেন:

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ

---

৭৩০. *সহীহ বুখারী*, জিকর ও মালাইকাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং.২৯৯২; *সহীহ মুসলিম*, বাবু মা লাক্বিয়ান্নাবিয়্যু সালণ্ঢালণ্ঢাহ 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম, প্রাগুক্ত, হাদিস. নং. ৩৩৫২

৭৩১. সে সময় খেজুরের চেয়ে যব, গম এবং আটার মূল্য বেশি ছিল।

৭৩২. *মা'আরিফাতুস সাহাবাতি লি আবি নাঈম আল ইস্পাহানি*, বাবু আবি আযিয ইব্ন 'উমাইর (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৬২৯৮

৭৩৩. আবুল হাসান আলী আল-হাসান আন-নদভী, *আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ* (জেদ্দা: দার্স্ শুর্ক, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.) পৃ. ১৯২-১৯৪

৭৩৪. রওশন আলী খোন্দকার, *সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (স.)* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৫), পৃ. ১৫

"যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে অস্ত্র নিক্ষেপ করবে (আত্মসমর্পণ করবে) সে-ও নিরাপদ এবং যে নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করবে সে নিরাপদ।"[৭৩৫] ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর সম্প্রীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে সৈয়দ আমীর আলী বলেছেন:

"But in the hour of triumph every evil suffered was forgotten, every injury inflicted was forgiven and general amnesty was insulted. Most truly it has been said that through all the annals of conquest there has been no triumphant entry like unto this one."

"বিজয় মুহূর্তে সমস্ত দুর্ভোগ হযরত ভুলে গেলেন, সমস্ত আঘাত যা পেয়েছিলেন ক্ষমা করে দিলেন এবং সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য সাধারণ ক্ষমা মঞ্জুর করলেন। কোন গৃহ লুণ্ঠিত হলো না, কোন নারীও লাঞ্ছিত হলো না। সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, বিজয়াভিযানের ইতিহাসে এ ধরনের সফলকাম প্রবেশ আর দেখা যায়নি।"[৭৩৬]

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-র খিলাফতকালীন সময়ে যখন মিশরের শাসনকর্তা হিসেবে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) দায়িত্ব পালন করছিলেন, সে সময় একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিষ্টানপল্লীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। কেউ একজন যীশুখ্রিষ্টের প্রস্তরনির্মিত মূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খ্রিষ্টানরা ধরে নিলো যে, এটা মুসলিমদের কাজ। তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। খ্রিষ্টান বিশপ অভিযোগ নিয়ে এলেন আমর ইবনুল আসের কাছে। আমর ঘটনা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি ক্ষতিপূরণ হিসেবে মূর্তিটি নতুনভাবে তৈরী করে দিতে চাইলেন।

কিন্তু খ্রিষ্টান নেতাদের প্রতিশোধস্পৃহা ছিল অন্যরকম। তারা চাইলো মুহাম্মাদ (স.) এর মূর্তি তৈরী করে অনুরূপভাবে নাক ভেঙ্গে দিতে। হযরত আমর কিছুক্ষণ নীরব থেকে খ্রিষ্টান বিশপকে বললেন: "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যেকোন প্রস্তাব করুন আমি রাজি আছি। আমাদের যে কোন একজনের নাক কেটে আমরা আপনাদের দিতে প্রস্তুত, যার নাক আপনারা চান।' খ্রিষ্টান নেতারা সকলে এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। পরদিন খ্রিষ্টান ও মুসলিমগণ বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। মিসরের শাসক সেনাপতি আমর সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বললেন "এদেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারী গ্রহণ করুন, আপনি আমার নাসিকাই ছেদন করুন।"

এ কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন তরবারি দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খ্রিষ্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব। সে নীরবতায় নিঃস্বাসের শব্দ করতেও যেন ভয় হয়। সহসা সে নীরবতা ভঙ্গ করে একজন মুসলিম সৈন্য এগিয়ে এলো। চিৎকার করে বললো 'আমিই দোষী, সেনাপতির কোন অপরাধ নেই। আমিই মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি, এ যে তা আমার হাতেই আছে। তবে মূর্তি ভাঙ্গার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। মূর্তির মাথায় বসা একটা পাখির দিকে তীর নিক্ষেপ করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।' সৈন্যটি এগিয়ে এসে বিশপের তরবারির নিচে নিজের নাসিকা পেতে দিলো। স্তম্ভিত বিশপ। নির্বাক সকলে। বিশপের অন্তরাত্মা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তরবারি ছুড়ে দিয়ে বিশপ বললেন 'ধন্য সেনাপতি, ধন্য এ বীর সৈনিক, আর ধন্য আপনাদের মুহাম্মাদ (স.) যাঁর মহান আদর্শে আপনাদের মতো মহৎ, উদার, নির্ভীক ও শক্তিমান ব্যক্তি গড়ে উঠেছে। যীশুখ্রিষ্টের প্রতিমূর্তির অসম্মান

---

৭৩৫. *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফাতহি মাক্কাহ (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৩৩৩২

৭৩৬. *The Spirit of Islam, page.* 96

করা হয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতেও অন্যায় হবে যদি আজ আমি এ সুন্দর ও জীবন্ত দেহের অঙ্গহানি করি। সে মহান কিতাব ও আদর্শ নবীকেও আমার শ্রদ্ধা জানাই।'[৭৩৭]

একদিন মসজিদে নববীতে মহানবী (স.) কতিপয় সাহাবিকে নিয়ে কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় একজন বেদুঈন এসে মসজিদের ভিতরে এক কোণে পেশাব করলো। সাহাবিগণ তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলে মহানবী (স.) তাদেরকে নিরস্ত্র করলেন। পেশাব করা শেষ হলে রাসূল (স.) তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, এটা আমাদের ইবাদতখানা পেশাবের স্থান নয়। এ বলে তিনি তাকে বিদায় করে দিয়ে সাহাবিগণকে নিয়ে মসজিদের পেশাব ধুয়ে দিলেন।[৭৩৮]

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন: তিনি রাসূল (স.) এর সাথে নজদ অভিযানে গিয়েছিলেন। রাসূল (স.) যখন ফিরে আসেন তিনিও তার সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। দুপুর বেলায় তাঁরা এমন একটি বস্তিতে গিয়ে পৌঁছালেন যেখানে বহু কন্টকময় ঝোপ ছিল। রাসূল (স.) সেখানে যাত্রা বিরতি করলেন। লোকজন বৃক্ষের ছায়ার সন্ধানে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। রাসূল (স.) একটি বাবলা গাছের নিচে অবতরণ করলেন এবং নিজ তরবারিখানা বৃক্ষে ঝুলিয়ে দিলেন। সে সময় সবেমাত্র আমাদের তন্দ্রা এসেছে। এমন সময় শুনতে পেলাম রাসূল (স.) আমাদের ডাকছেন এবং রাসূল (স.) এর সামনে একজন গেয়ো ব্যক্তি রয়েছে। রাসূল (স.) বললেন, 'আমি নিন্দ্রার কোলে ঢলে পড়েছি এমন সময় এ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার তরবারি ধারণ করে। সাথে সাথে আমিও জাগ্রত হয়ে পড়ি। দেখি আমার তরবারিখানা তার হাতে। সে বললো এখন আমার থেকে কে তোমাকে রক্ষার করবে? আমি তিনবার বললাম, 'আল্লাহ'। সাথে সাথে তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ে যায়।' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (স.) বসে পড়লেন এবং কোন প্রতিশোধ নিলেন না।[৭৩৯]

হযরত বারাহ ইব্ন রবীআ (রা.) বলেন: একদা কোন এক যুদ্ধে যোগদানের জন্য তিনি হুজুর (স.) এর সাথে মদীনা থেকে বের হন। রাসূল (স.) এবং তাঁর সাহাবিরা এক নিহত মহিলার লাশের নিকট গিয়ে থমকে দাঁড়ান এবং বলেন: ماكانت هذه لتقاتل 'এ মহিলার তো যুদ্ধ করার কথা নয়।' এ বলে মহানবী (স.) তাঁর সাথীদের চেহারার দিকে তাকালেন। তিনি জনৈক সাহাবিকে নির্দেশ দিলেন 'তুমি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের নিকট গমন করে বলো, শিশু, মজদুর এবং নারীকে যেন হত্যা না করে।'

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মহিলা ছিল। সে মহানবী (স.) এর প্রিয় পিতৃব্য শহীদ হামযা (র.) এর নাক কান কেটে ও হৃদপিন্ড বের করে সেগুলো দিয়ে মালা গেথে উহুদের ময়দানে উন্মত্ত নাচ নেচেছিল এবং তারপরে তার হৃদপিন্ড চিবিয়ে খেয়েছিল। মহানবী (স.) তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যে ওয়াহশী হামযা (রা.) কে হত্যা করেছিল, তিনি তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় প্রায় সর্বত্র বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মহানবী (স.) তায়েফে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার লোকদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ সময় যেসব লোক মহানবী (স.) কে নানাভাবে উপহাস ও অপমান করেছিল এবং তাঁর পেছনে দুরন্ত বালকদের লেলিয়ে দিয়েছিল, যারা পাথর মেরে মহানবী (স.) কে রক্তাক্ত করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল আবু আবদ। উদার নবী তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তার জন্য মসজিদ প্রাঙ্গণে তাবু টাঙ্গিয়ে দিয়ে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেন। খায়বর বিজয়ের পর যে ইয়াহুদী মহিলা হত্যার উদ্দেশ্যে মহানবী (স.) এর খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, তিনি তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

---

৭৩৭. মুহাম্মাদ তৌহিদুল আজম চৌধুরী, *ইতিহাসের আলোকে ইসলামী সমাজে অমুসলিমের অধিকার*, মাসিক অগ্রপথিক (ঢাকা: ই. ফা. বা. ১৪ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) পৃ. ৯১-৯২

৭৩৮. প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৫৫৬৬; *সহীহ মুসলিম*, বাবু উজুবি গুসলিল বাওলি, হাদিস নং. ৪২৭

৭৩৯. *সহীহ বুখারী*, বাবু গাজওয়াতি যাতির রিক্বা, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৩৮২২

মহানবী (স.) এর ক্ষমা, দয়া ও মহানুভবতার এমনি অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যার ফলে কঠিন ও নিষ্ঠুরতম মানুষও মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের উদারতার খন্ডচিত্র 'আবু আজিজ' নামে জনৈক বন্দীর জবানীর মাধ্যমে ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর তুলে ধরেছেন এভাবে:

Blessing be on the men of Medina who made us ride, while they themselves walked. They gave us wheaten bread to eat when there was little of it contenting themselves with dates.

"মদীনাবাসীদের উপর রহমত বর্ষিত হোক, তারা পদব্রজে ভ্রমণ করে আমাদের আরোহণের জন্য তাদের উষ্ট্র দিয়েছিলেন। নিজেরা খেজুর আহার করে আমাদেরকে রুটি করে দিতেন।"[৭৪০]

উহুদ যুদ্ধের হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা সকলেরই জানা। মহানবী (স.) এ যুদ্ধে আহত হন। তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়। দুশমনের আঘাতে তাঁর চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হয়। সে সময় আহত এবং ব্যথিত সাহাবায়ে কিরাম বদনসীব দুশমনের নিপাতসাধনের জন্য বদ দু'আ করার অনুরোধ করলেন। তার জবাবে মহানবী (স.) বললেন 'আমি বদ দু'আ করার জন্য প্রেরিত হইনি। আমি বিশ্বমানবের কল্যাণের উজ্জ্বল প্রদীপরূপে আগমন করেছি।' তিনি এ দুঃসময়ে করুণ কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন 'হে আমার প্রভু! আমার কাওমকে ক্ষমা করো, কারণ ওরা অজ্ঞ।'[৭৪১] হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন 'মহানবী (স.) জীবনে কখনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।' মহানবী (স.) তাঁর নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ফলে যখন মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল পবিত্র কা'বার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে উচ্চস্বরে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা ঘোষণা করলেন। তৎকালীন অমুসলিম সম্প্রদায় একে পবিত্র কা'বার গুরুতর অপমান মনে করলো। অতঃপর তারা আকস্মিকভাবে ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করে দিলো। চারদিক হতে রাসূলুল্লাহ (স.) কে আক্রমণ শুরু করলো। কিন্তু নবী (স.) এতই দয়াবান যে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, তাদের প্রতি একটু বিরক্তিও প্রকাশ করেন নি। অথচ হারিস ইবন আবু হালা মহানবী (স.) কে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। চতুর্দিক হতে আঘাতের কারণে আবু হালা শহীদ হয়ে যান।[৭৪২] মহানবী (স.) তায়েফবাসী কর্তৃক অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও হতাশ হলেন না। তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকলেন। অবশেষে তায়েফবাসিরা তাঁকে সেখান থেকে বহিস্কার করার জন্য একদল লোক লেলিয়ে দিলো। পাষন্ডরা হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো। তিনি ক্রমশঃ অবসন্ন ও অচৈতন্ন হয়ে পড়লেন এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ রক্তধারা প্রবাহিত হয়ে লাগলো।[৭৪৩] এদিকে তাঁর সাথী যায়দও ভীষণ আহত হলেন। যায়দ রাসূল (স.) কে কাঁধে করে নগরের বাইরে নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর চেতনা ফিরে আসার পর প্রথমেই অযু করে সালাত আদায় করে অত্যাচারী যালিমদের বিরুদ্ধে ধ্বংস কামনা না করে তাদের জন্য দু'আ করলেন: "হে আমার পরওয়ারদিগার! তোমাকে ডাকি, অবিশ্বাসীরা আজ না বুঝে যে গুরুতর অপরাধ করেছে তার জন্য দয়া করে তুমি তাদেরকে শাস্তি দিও না। তাদের ক্ষমা করে দাও।"[৭৪৪]

একদা মহানবী (স.) হারাম শরীফে নামাজ পড়া অবস্থায় উকবা ইবন আবু মু'ঈদ তাঁর গলায় চাদর জড়িয়ে টান দেয়াতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় আবু বকর (রা.) তাকে উকবার হাত হতে উদ্ধার করেন এবং বললেন: 'তুমি এমন একজন লোককে হত্যা করতে চাও যিনি শুধু বলেন যে,

---

৭৪০. *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

৭৪১. *সহীহ বুখারী*, বাবু গাজওয়াতি উহুদি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৩৩৪৭

৭৪২. আলণ্ঢামা শিবলী নুমানী, *সিরাতুন্নবী (স.)*, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৪১৩ হি.) পৃ. ৭১

৭৪৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬

৭৪৪. গোলাম মোস্ত্ফা, *বিশ্বনবী (স.)* (ঢাকা: আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ডিসেম্বর ২০০০), পৃ. ১১৯

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং যিনি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন! ' অথচ তিনি উকবার উপর বিন্দু পরিমাণও প্রতিশোধ নিলেন না।[৭৪৫]

একবার জনৈক মুহাজির এক আনসারকে চপেটাঘাত করে। ফলে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পারিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মহানবী (স.) সংবাদ পেয়ে উভয় দলকে একটি সমঝোতামূলক পরামর্শ দিয়ে দ্বন্দ্ব মীমাংসা করে দিলেন। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই সংবাদ পেয়ে বলে দিল 'এদের কাবু করার সহজ পন্থা হলো তোমরা এদের থেকে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নাও। এমনিতেই এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।' পবিত্র কুর'আনে উক্ত ঘটনা এভাবে প্রকাশিত হয়েছে:

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا

'এরা এ সমস্ত লোক, যারা বলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সঙ্গে যারা আছেন তাদের খরচপত্র বন্ধ করে দাও। এতে তারা কাবু হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।' এ সূরায় আরো বলা হয়েছে:

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

'এরা বলে মদীনায় ফিরে সম্মানিত (স্থানীয়) লোকেরা হীন (বিদেশী) লোকদের বের করে দেবে।'[৭৪৬]
পবিত্র কুর'আনের এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (স.) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করলেন। সে তা অস্বীকার করলো। ঘটনাস্থলে হযরত 'উমর (রা.) বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই।' মহানবী (স.) বললেন: 'তা হয় না, লোকেরা বলে বেড়াবে, মুহাম্মাদ তার সাথীদেরকেও হত্যা করে।'[৭৪৭]

হোবার ইব্ন আসওয়াদ ছিলেন দুস্কৃতকারীর অন্যতম। মক্কা বিজয়ের পর তার মৃত্যুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) এর কন্যা হযরত যয়নাব (রা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তখন সে তাকে নির্যাতন করেছিল। হযরত যয়নাব (রা.) তখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। হোবার তাকে উটের উপর থেকে ফেলে এমন আঘাত দিয়েছিল যে তা সহ্য করতে না পেরে তার গর্ভপাত ঘটে যায়। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে মুসলিমগণের উপর আরো কতিপয় মারাত্মক নির্যাতনের অভিযোগ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইরানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু হিদায়াতের আলো তাকে আকর্ষণ করে নবী কারিম (স.) এর দরবারে পৌঁছে দেয়। তিনি রাসূলে আকরাম (স.) এর খিদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন –'ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.) প্রাণ ভয়ে ইরান চলে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিছুদুর যাওয়ার পর আপনার দয়া ও ক্ষমার কথা মনে পড়ে গেলে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ফিরে এসেছি। আমার সম্পর্কে আপনার কাছে যে সমস্ত অভিযোগ আছে তা সবই সত্য। আমার মূর্খতা অকপটে স্বীকার করছি।' মহানবী (স.) হাত বাড়িয়ে তাকেও বিনা দ্বিধায় রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করলেন। কোন প্রতিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।[৭৪৮]
ইসলাম যে উদারতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছে তা মানব ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। যে মক্কানগরীতে মহানবী (স.) নিজ উম্মতদের নিয়ে অত্যাচারিত-নিপিড়িত হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সে মক্কাবাসীকে নিজ করতলে পেয়েও যে অপূর্ব ক্ষমা ঘোষণা করলেন তা ইসলামের মহান উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ মর্মে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন:

The city which had treated him so cruelly, driven him and his faithful band for refugee amongst strangers, which had sworn his life and the lives of his

৭৪৫. *সহীহ বুখারী*, বাবু কওলিন নাবিয়্যি (স.) (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ৩৪০২

৭৪৬. *আল কুর'আন*, ৬৩:০৭-০৮

৭৪৭. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৪৫২৭

৭৪৮. *সীরাতুন্নবী সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালল্লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০

devoted disciples lay at his feet his old persecutors, relentless and ruthless, who had disgraced humanity by inflicting cruel outrags upon inoffensive man and woman and even upon the lifeless dead, were now completely at this mercy. but in the hour of triumph every evil suffered was forgotten, every injury inflicted was forgiven, and a general amnesty was extended to the population of mecca.

"যে মহানগরী একদিন তাঁর প্রতি নির্মম আচরণ করেছিল, তাকে ও তাঁর বিশ্বাসী দলকে বিদেশ-বিভুঁয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, যে শহর তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তা আজ তাঁর পদতলে। তাঁর পুরাতন বিক্রমশালী ও নিষ্ঠুর যুল্মকারী যারা নির্দোষ নর-নারীর উপর এমনকি প্রাণহীন মৃতের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে মনুষ্যত্বের অপমান করেছিল তারা আজ সম্পূর্ণ তাঁর করুণার ভিখারী। কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তে সব অনিষ্ঠের ব্যথা বিস্মৃত হলেন, সব আঘাত ক্ষমা করে দিলেন, আর সব মক্কাবাসীর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন।"[৭৪৯] হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তাঁর অমুসলিম মা সাহায্যপ্রার্থী হয়ে মদিনায় তাঁর কাছে আগমন করলেন। অমুসলিম মায়ের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর শরণাপন্ন হলে তাকে নির্দেশ দেয়া হলো, মা যেই হোন না কেন, তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।[৭৫০] একবার একব্যক্তি মহানবী (স.) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলো সাহাবীগণ তাকে ধরে ফেলল। বন্দী অবস্থায় তাকে মহানবী (স.) এর খিদমতে হাজির করা হলে সে ভয়ে কাঁপতে থাকে। তিনি তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন 'ভয় পেয়ো না তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও তা করতে পারতে না' এ বলে তাকে ছেড়ে দিলেন।[৭৫১] একবার নাজরান থেকে খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল পুন্যভূমি মদীনায় প্রবেশ করে মসজিদে নববীর সামনে দাঁড়িয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এবং অ নিশ্চয় তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল তারা মসজিদে প্রবেশ করবে কি করবে না? শান্তি ও সম্প্রীতির নবী তাদেরকে মসজিদে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি করেছেন, মূর্তিপূজারীদের সাথে চুক্তি করেছেন, নাসারাদের সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের সাথে সহাস্যবদনে ও প্রফুল্লচিত্তে সাক্ষাৎ করেছেন।[৭৫২]

মহানবী (স.) এর উন্নত আচরণে মুগ্ধ হয়ে কাফিররা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতো। ইসলাম যদি সত্যিই সাম্প্রদায়িক ধর্ম হতো তাহলে লোকেরা এত ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করতো না। খাইবার যুদ্ধের পর এক পাপীষ্ঠা ইয়াহুদী রমণী নবী কারিম (স.) কে দাওয়াত করে। তবে ঐ মহিলার মতলব ভাল ছিল না। সে বিষ মিশিয়েছিল খাবারের সাথে। কিন্তু সে নবী (স.) কে হত্যা করতে সফল হতে পারেনি। দয়ার নবী তাকেও ক্ষমা করে দেন।

সর্বোপরি আল কুর'আন মেনে চলা

একথা সর্বজন বিদিত সত্য যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ পৃথিবী যে স্রষ্টার সে স্রষ্টার আইন মেনেই চলতে হবে। আর আল কুর'আন যেহেতু সে স্রষ্টার নাযিল করা সর্বশেষ আসমানী কিতাব সুতরাং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এর পূর্ণ অনুসরণ করতেই হবে তা ব্যতিত কোন বিকল্প নেই।

---

৭৪৯. *The Spirit of Islam,* page 96-96

৭৫০. *সহীহ বুখারী*, বাবু সিলাতিল ওয়ালিদিল মুশরিক, (আল মাকতাবাতুস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং. ২৯৪৬ ও ৫৫২১

৭৫১. *সীরাতুন্নবী সালণ্ডালণ্ডাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ডাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮

৭৫২. খুরশিদ আহমদ গিলানী, *উদারতার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)* (ঢাকা: মাসিক মদীনা, মে ২০০৩), পৃ. ৭৮-৮০

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপরোল্লিখিত গবেষণার শেষ পর্যায়ে এসে একথা নির্দ্বিধায় বলবো যে, আজকের পৃথিবীতে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে এর থেকে প্রতিটি সুষ্ঠু বিবেক পরিত্রাণ চায়। আজকের পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এতে পৃথিবী বাসযোগ্যহীন হয়ে পড়েছে। আজকে দূর্বলের উপর সবলের যে যুল্‌ম নির্যাতন তা অতীতের সকল বর্বতার ইতিহাসকে হার মানিয়েছে। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষগুলো শান্তির পিছনে ছুটতে ছুটতে আজ তারা ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন প্রায়। আজকে সকলের মাঝে নাবিশ্বাস তৈরী হয়ে গেছে যে, পৃথিবীতে হয়ত আর শান্তি আসবে না, শান্তি সোনার হরিণের চেয়েও মূল্যবান হয়ে পড়েছে। সোনার হরিণ তো তৈরী সম্ভব কিন্তু শান্তি অর্জন তার চেয়েও হাজার গুণ বরং লক্ষগুণ কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন এ ক্ষেত্রে কী করণীয়? তাহলে শান্তি প্রিয় মানুষগুলো কি আর কোন উপায় খুজেঁ পাবে না? পাবে না কি তারা মুক্তির কোন দিশা? হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে এমনিতেই পাঠাননি বরং তিনি সুপরিকল্পনা নিয়ে পৃথিবীতে মানব মন্ডলীকে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে মানবমন্ডলী সুন্দর এবং সুশৃংখল জীবন-যাপনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন। সে তিনিই কিয়ামাত পর্যন্ত পৃথিবীবাসী যেন শান্তি এবং সুখে থাকতে পারে, গোটা পৃথিবীতে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য নাযিল করেছেন সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য আসমানী গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কুর'আন। সুতরাং পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষের উচিৎ একথা জোড়ালোভাবে তুলে ধরা যে, শান্তির জন্য আজ থেকে কুর'আনই হবে দেশী এবং আন্তর্জাতিক সংবিধান। এ সহজ এবং যৌক্তিক কথাটিই বার বার উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই পৃথিবীর সকল বিবেকবানের প্রতি আহবান থাকবে যে, পৃথিবীতে নিশ্চিত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল কুর'আনকেই একমাত্র গাইড বুক হিসেবে তারা যেন মেনে নেন এবং এর মাধ্যমেই পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহলেই পৃথিবীময় বিরাজ করবে কাংখিত শান্তি। নিশ্চিত হবে সব মানুষের মৌলিক অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত তালিকা

আল-কুর'আন ও তাফসির

- আল-কুর'আন
- *মু'জামুল কুর'আন*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা: ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১২
- আল জাসসাস, *আহকামূল কুর'আন*, কায়রো: দারুল মা'আরিফা, ১৪০১ হিজরি
- আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছির, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৩ খ্রি.
- তরজমা ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, *আল-কুর'আনুল কারীম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২২তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯
- হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, লন্ডন: আল কোরআন একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১
- মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নূরুল কুর'আন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৮৮
- মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুর'আন*, কায়রো: তাহকীকুত তুরাস, ১৯৮৭ খ্রি.
- মুহাম্মদ ইবন্ জারীর আত-তাবারী, *জামিউল বয়ান আত-তা'বীলির আ'ইল কুর'আন*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৪৫ হি.
- রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারায়িব আল-কুরআন*, কায়রো: মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩২৪ হি.
- সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী, *তাফহীমূল কুর'আন*, অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮০
- সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসির ফি যিলালিল কোরআন*, অনুবাদ: হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, লন্ডন: আল কোরআন একাডেমী, সেপ্টেম্বর ২০১০

- হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফি' (র.), *পবিত্র কোরআনুল করীম (মূল:তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন)*, অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল-হারমাইন আশ শারিফাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.
- হাফেজ আল্লামা 'ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাসীর (র.), অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *তাফসীর ইবনে কাসীর*, ঢাকা: হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, বংশাল, জুলাই ২০১০

আল-হাদীস

- আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী আল-জুফী (র.), *আস-সহীহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩
- আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ ইব্ন মাজাহ্ আল কাযবীনী, অনুবাদকবৃন্দ মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক, *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৫
- আবূ আব্দিল্লাহ মালিক ইব্ন আনাস, *মুয়াত্তা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রু. ২০০২
- আহমদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমদ*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৪০৯ হিজরি
- আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, *সুনানে দারেমী*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৪১২ হিজরি
- আবূ জাফর আহমদ আত-তাহাবী, *শারহু মা'আনিল আসার*, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৩৯৯ হিজরি
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী, *মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (র.)*, অনুবাদ: মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা: ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৮৮
- ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), অনুবাদ: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, *সহীহ মুসলিম*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৯
- ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র.), অনুবাদ: মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, *সুনানু নাসাঈ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৮
- মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র.), অনুবাদ: মাওলানা সাঈদুল হক, *মা'আরিফুল হাদীস*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দিল্লী: কুতুবখানা রশিদীয়া, ১৩৮৭ হিজরি
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *তাজরীদুস্ সিহাহ্* (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্ হাদীস), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭
- ইব্ন আবী শায়বাহ, 'আবদুল্লাহ, *আল-মুছান্নাফ*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হিজরি.
- বায়হাকী, আবূ বাকর আহমাদ, *আস-সুনানুল কুবরা*' , মক্কা: মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪
- দারুকুতনী, 'আলী, *আস-সুনান*, বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৬৬
- ইবনুল আছীর, মাজুদ্দীন, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯

- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনবাদ: মাওলানা আব্দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ জালালাবাদী, ঢাকা: ই.ফা.বা. সেপ্টেম্বর ২০০৮
- আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, *মা'আরিফুতস সাহাবাহ*, রিয়াদ: দারুল ওয়াত্ন, ১৪১৯ হি.

সীরাত ও তা'রীখ

- শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, অনু. খাদিজা আক্তার রেজায়ী, লন্ডন: আল কুর'আন একাডেমী, আগষ্ট ২০১২
- আস সীরাতুন নববিয়্যাহ, *ইবনু হিশাম*, মাকতাবাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, তা. বি.
- মাওলানা ফজলুর রহমান ও আবুল কালাম আযাদ, *বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনী*, ঢাকা: মীনা বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০০৫
- ড. মজিদ খান, *শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)*, অনুবাদ: আবু মহাম্মদ, ঢাকা: ই.ফা.বা. প্রকাশকাল, এপ্রিল ২০০৫
- তাবারী, আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইবনু জারীর,*তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, লিডেন: ১৮৭৯
- ইব্ন হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, বৈরূত: দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী, ১৪১৫ হি.
- ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. বি.
- আল-বালাযূরী, *ফুতুহুল বুলদান*, বৈরূত: দারুল হিলাল, ১৪০৩ হি.
- গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৩ খ্রি.

বিশ্বকোষ

- সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ই. ফা. বা.

অভিধান

- ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ: আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১৩৩৬ হি.
- ইব্ন মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারুল ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৬
- ড. বা'লবাক্কী রুহী, *আল মাওরিদ (আরবী-ইংরেজী অভিধান)*, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইন, একাদশ সংস্করণ, ১৯৯৯
- ড.এ.বি. ভিন্সতেক, *আল-মু'জামুল মাফাহরিস লি-আলফাযিল হাদীসিন নাববী*, লিডেন: মাকতাবা ব্রীল, ১৯৩৬ খ্রি.
- ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত সংস্করণ, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১১ খ্রি.
- লুইয়াস মু'লুফ, বৈরুত: *আল-মুনজিদ ফিল লুগাত*, ১৯৯৪

- ড. খুরশিদ আলম, *পকেট বাংলা বানান অভিধান*, ঢাকা: মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০০১

ফিকহ

- আবুল হাসান আল-বালাযুরী, *ফতুহুল বুলদান*, বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হিলাল, ১৯৮৮ খ্রি.
- আব্দুল্লাহ যায়ল'ঈ, *নাসবুর রায়াহ*, কায়রো: দারুল হাদীস, ১৩০৫ হিজরি
- আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, *কানুযুল উম্মাল*, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রি.
- আহমাদ শারাবী, *আল-হুকমাতুল ইসলামিয়া*, কায়রো: দারুল আরব, ১৯৯১ খ্রি.
- আবূ মুহাম্মদ বদরুদ্দীন আল-আইনী, *'উমদাতুল কারী*, দিল্লী: মাকতাবাতে রশিদীয়া, ১৯৮১
- ইমাম আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, লাহোর: দারুল কুর'আন ওয়াল 'উলুমিল ইসলামিয়া, ১৯৮৬
- ড. আবদেল রহীম 'উমরান, *তানজিম আল উসরাত ফীত তিরাসিল ইসলামী*, কায়রো: জামেয়া আল-আযহার, ১৯৯৪
- ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৯ খ্রি.
- সাইয়েদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, কায়রো: দারুল ফাতহ লিল 'ইলমিল আরাবী, ১৯৯০ খ্রি.
- মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, *আসান ফেকাহ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা: আব্বাস আলী খান, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৯

বিবিধ

- হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *মনীষীদের কুরআন গবেষণা*, লন্ডন: আল কুরআন একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ২০০৫
- খোন্দকার এমদাদুল করিম, *পবিত্র কুর্আন শরীফে কোথায় কি পাবেন: প্রসঙ্গে নিদর্শন*, ঢাকা: অন্তরালোক প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৭
- সাইয়েদ কুতুব, *ইসলামের স্বর্ণ যুগে সামজিক ন্যায়-নীতি*, অনুবাদ: আকরাম ফারুক, ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, জুলাই ২০০৫
- ইমাম কুরতুবী (রহ.), *রাসূলুল্লাহ সা. এর বিচারালয়*, অনু: মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, জানুয়ারী ২০০২
- আল্লামা জামাল আল বাদাবী, *ইসলামের সামাজিক বিধান*, ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ, ড. শারমিন ইসলাম, ঢাকা: দি পাইওনিয়ার, সেপ্টেম্বর ২০০৯
- সাইয়েদ কুতুব, *কালজয়ী আদর্শ ইসলাম*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মে ২০০৩
- মাওলানা আব্দুল জলিল মাযাহেরী (র.), *তলোয়ারে নয় উদারতায়*, ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, অক্টোবর ১৯৯৬

- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০৭
- মাওলানা মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী, *পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম*, অনু: মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ, ঢাকা: ই.ফা.বা. জুন ২০০৩
- আব্দুর রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত*, অনু: এ কে এম সালেহ উদ্দিন, ঢাকা: বিআইআইটি, এপ্রিল ২০০৮
- এস এ এম মহিউদ্দিন খান, *ইসলাম এবং বিশ্ব শান্তি*, ঢাকা: খান পাবলিকেশান্স, ডিসেম্বর ২০০২
- অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *বিশ্ব শান্তির রোড ম্যাপ*, চট্টগ্রাম: মদীনা একাডেমী, মে ২০০৬
- ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *খুৎবাতুল ইসলাম*, ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০৮
- আহমেদ দিদাত, অনু: এ কে মোহাম্মদ আলী, *অলৌকিক কিতাব আল কুর'আন*, ঢাকা: রেক্স্ পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০০৮
- খন্দকার আবুল খায়ের, *বিজ্ঞানময় কুর'আন কুর'আনই বিজ্ঞানের উৎস*, ঢাকা: খন্দকার প্রকাশনী, মার্চ ২০০৮
- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আযিয, *বিশ্ব শান্তির সন্ধানে*, ঢাকা: কাঁটাবন বুক কর্ণার, আগষ্ট ২০০৯
- ড. এসরার আহমাদ, *কুর'আনের পরিচয়*, অনু: মোস্তফা ওয়াহিদুজ্জামান, ঢাকা: নাকিব পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ২০০৭
- মোঃ সাইফুর রহমান, *কুর'আন হাদীসের আলোকে সুন্দর জীবন*, ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০১২
- স্যামুয়েল পি হান্টিংটন, অনুবাদ: ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন্স এন্ড দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার*, ঢাকা: অনিন্দ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১০
- সংকলন ও সম্পাদনা, আই. ই. আর এর ফেলোবৃন্দ কর্তৃক, *পবিত্র কুরআনের আলোকে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়*, ঢাকা: ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০০৩
- মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম, *কুর'আন ও পরিবার*, ঢাকা: বর্ণালী বুক সেন্টার, ডিসেম্বর ২০০৬
- মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, *তা'লীমুল কুর'আন*, ঢাকা: জনতা পাবলিকেশন্স, আগস্ট ২০০১
- ড. মুহম্মদ ইউসুফ, *সামাজিক নিরাপত্তা ও ইসলাম*, পি এইচ. ডি. গবেষণাপত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮
- অধ্যাপক খুরশীদ আলম, *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯০
- অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য*, ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১২

- আবুল ফাদাল মুহাম্মাদ ইব্ন মানযূর, *লিসানুল আরব*, ইরান: নাশরু আদবিল হাওযা, ১৪০৫ হি.
- আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৪
- আহমাদ মুহাম্মদ আস্সাফ, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম*, বৈরূত: দারুল ইহয়া'ইল 'উলূম ১৯৮৮
- আবদুল হামীদ তাহমায, *আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ*, বৈরূত: দারুল কলম ২০০১
- আবদুর রহমান ইব্ন খালদুন, *আল-মুকাদ্দামাহ*, অনু: গোলাম সামাদানী কোরায়শী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৯
- আব্দুল মতিন, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০*, ঢাকা: মাদল প্রকাশনী ১৯৯৫
- ইমাম গাযালী, *এহইয়াউ 'উলুমিদ্দীন*, ভাষান্তর: মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, সেপ্টেম্বর ২০০৪
- এ. কে. নাজিবুল হক, *মন ও মনোবিজ্ঞানী*, ঢাকা: সৃজনী প্রকাশনী, ১৯৮৯
- এ. কে. এম. নাজির আহমেদ, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ফেব্রুয়ারী ২০০৫
- এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল ১৯৯৯ খ্রি.
- গোলাম মোস্তফা কিরন, *আজকের বিশ্ব*, ঢাকা: প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স, ৩৬ তম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮
- জাওয়াদ আলী, *আল-মুফাছ্ছাল ফী তারীখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, বৈরূত: দারুল 'ইলম, ১৯৭১
- ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনু: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী ১৯৯৫
- ড. আবদুল কারীম যায়দান, *আল-মুফাছ্ছাল ফী আহকামিল মার'আতি ওয়াল বায়তিল মুসলিমি*, বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ ১৯৯৭
- ড. আহমাদ আলী, ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, চট্রগ্রাম: পাইওনিয়ার ট্রাস্ট ২০০৫
- ড. আহমদ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক পর্দা ও সাজসজ্জা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০১০
- ড. আহমাদ আলী, *ইসলামে শাস্তি আইন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০১১
- ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, গবেষণা বিভাগ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪
- ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, *স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ইসলাম*, ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশন্স, খ্রি. ২০০৬
- মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯২

- অধ্যাপক এম. আই. চৌধুরী ও মারমাডিউক পিকথল অনুদিত, *কুর'আনের উপদেশাবলী*, ঢাকা: ফাতেমা-যাহরা পাবলিশার্স, জুন ২০০৪
- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রব, *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল-কুর'আন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০২
- ড. মরিস বুকাইলি, অনুবাদ আখ্তার-উল্-আলম, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, সপ্তম সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৬
- ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ: হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকা: আল-কাওসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯
- ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ *চক্ষু চিকিৎসার বিকাশে ইসলামের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮০
- ডাঃ ইবনে আখতার, *যুগে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানী*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০০৯
- প্রফেসর, ড. এমাজউদ্দীন আহ্মদ, *ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.
- প্রফেসর, ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামে পোষাক : প্রাথমিক সূত্র ও শর্তসমূহ*, ঢাকা: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ ২০০৩
- প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুয্ যামান, *তিব্বে নববী (স.)*, ঢাকা: হক লাইব্রেরী, বাইতুল মুকাররম, মার্চ ২০০২
- ফুয়াদ আল খতীব, *ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা*, ঢাকা: বাংলাদেশ-সৌদিআরব মৈত্রী সমিতি, জুলাই, ১৯৮০
- মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফিঈ, *আল উম্ম*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, তা. বি.
- মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ফ্রেব্রুয়ারী, ২০০৮
- মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: ই.ফা.বা. মে ২০০৭
- মুহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান ও মোঃ সাহাব উদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি*, ঢাকা: পূর্বদেশ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ খ্রি.
- মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা*, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো ২০১০
- মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, *বেহশতী জেওর*, অনু : মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, ঢাকা: তাজ কোম্পানী লিমিটেড ১৯৯৭, খ. ৫
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ*, দেওবন্দ: মাকতাবাতে রশিদীয়া ১৪১২ হি.
- এম এ সালাম, *মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে আল কুর'আন*, ঢাকা: সেরা লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ২০০৩
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, দিল্লী: কুতুবখানা রশিদীয়া ১৩৭৩ হি.

- সাইয়েদ কুতুব, *আল-ইসলাম ওয়া সালামুল আলম*, বৈরুত: দারুস সালাম ১৯৯৩ হি.
- সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০০
- এ.কে.এম. নাজির আহমদ, *ইসলামের সোনালী যুগ*, ঢাকা: বিআইসি, অক্টোবর ২০০৪
- সুকুমার সাহা, *মাদকদ্রব্য, সমাজ ও আইন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯১
- সৈয়দ আমীর আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, অনুবাদ: মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৩
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *হযরত রাসূলে করীম (স.) : জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৭
- মাওলানা মসিহুল্লাহ খান, *ইসলাম ও বিশ্বশান্তি*, অনুবাদ: মাওলানা আব্দুর রহীম ইসলামাবাদী, ঢাকা: আজিজিয়া কুতুবখানা, জুলাই ১৯৮৯
- হাফিজ ইব্ন হাযম, *আল-আহকাম*, কায়রো: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ ১৪১০ হিজরি
- *সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
- *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ-০২, সংখ্যা-০১, জানু.- জুন ২০০৮
- *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ অক্টোবর ২০১২
- *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৪ মে ১৯৯৮
- *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ জুন ১৯৯৮
- ড. আহমদ আলী, ইসলামে শাস্তি আইন, *মাসিক পৃথিবী*, মার্চ ২০১৩
- *আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ*, ২য় সংস্করণ, তা. বি. http://www.waqfeya.net/shamela (সফ্টওয়্যার)
- *মাকতাবাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ*, প্রথম সংস্করণ, তা. বি. (সফ্টওয়্যার)